শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

মণিপুরের ইতিহাস

১৩৫০

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়
মণিপুরের ইতিহাস
১৯৫৮

'ভূমিকা'

মণিপুর পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা ক্ষুদ্র একটি দেশ। ক্ষুদ্র কিন্তু শুধু আয়তনে, রূপে ও গুণে নয়। ইহা রূপে অতুলনীয় এক দেশ। এই রম্য দেশের রমনীয় দৃশ্য যাঁহাদের চোখে পড়িয়াছে তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন বৃটিশ-ভারতের বৃটিশ-রাজ-প্রতিনিধি, লর্ড আরুইন; আর, দ্বিতীয় জন হইলেন আমাদের স্বতন্ত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শ্রীনেহরু। এই স্বভাবসুন্দর ভূখণ্ডের অপূর্ব্ব দৃশ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া লর্ড আরুইন—ইহাকে অভিহিত করেন **'ভারতের সুইজরল্যাণ্ড'**; আর, শ্রীনেহরু **'পুর্ব্ব-ভারতের কাশ্মীর'**। গুণেও তাহাই। মণিপুরী পোলো আজ কে না আদর করে! মণিপুরী নৃত্য আজ কে না প্রশংসা করে! যে দেশে এই বিশ্ব-সমাদৃত ক্রীড়ার উৎপত্তি সেই দেশ কি সামান্য! ভারতের চতুরপ্রধাননৃত্যের অন্যতম যে দেশের কৃষ্টি সেই দেশ কি সাধারণ! ইহার উজ্জ্বলময় অতীতের প্রকাশ এই কৃষ্টিদ্বয়ে কি সুন্দর বিকাশ পাইতেছে!

মণিপুর বহু মানবজাতির এক মিলনক্ষেত্র। আবহমান কাল হইতে কত কি মানবজাতি এই ভূখণ্ডে আসিয়া পড়ে। উত্তরদিক হইতে আসিল কত কি মঙ্গোলজাতি; পশ্চিমদিক হইতে, কত কি হিন্দু ও অহিন্দুজাতি; আর, দক্ষিণদিক হইতে কত কি মোঙ্গমের—জাতি। উহারা সকলে এই দেশে আসিয়া

ং ক্রমশঃ মিলিত হইয়া যে জাতির সৃষ্টি হইল তাহা মৈতৈ ম পরিচিত এই জাতি। এই জাতির বর্ণসংঘীভূত বহু বহু াতির সংঘীভূত র্ণের সমষ্টি বা তদুৎপন্ন বর্ণবিশেষ। ফলতঃ, ইহার কৃষ্টি, ইহার, ঐতিহ্য, ইহার সংস্কৃতি এবং ইহার সভ্যতা তদ্রূপই। সুতরাং, মৈতৈএর জানা কিম্বা জানিতে প্রয়াস কম কষ্টসাধ্য নয়।

এই ভূখণ্ড যে দিন সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইল সেই দিন হইতে স্বতন্ত্র এক দেশ হইয়া দাঁড়ায়। ভারত এবং ব্রহ্ম-দেশের মধ্যে এক কীলক-রাজ্য হইয়া স্বতন্ত্রজীবনে কাল বাহিয়া যায়। এই স্বতন্ত্রতা খৃষ্টীয় একোনবিংশতিতম শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। সুতরাং, ইহার সমাজ, ধর্ম্ম এবং শাসনের ক্রমবিকাশ কিম্বা বিপ্লবের ইতিহাস ভারত কিম্বা ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের দ্বারা কদাচিৎ বা কথঞ্চিৎ কিয়দংশে প্রভাবিত হইলেও স্বতন্ত্রধারায় প্রবাহিত হয়; এবং তথ্য সকল নিজস্ব অক্ষরে লিখিত থাকে। সুতরাং, এই দেশের ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের প্রতি নিরতিশয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

আজ, মণিপুরের ইতিহাস, কতক লিখা হইয়াছে। কিন্তু প্রামাণিক একটাও বাহির হয় নাই। কারণ, যাঁহারা লিখিতে প্রয়াস পান তাঁহারা প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় অনভিজ্ঞ, এবং, প্রাচীন অক্ষর তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত গ্রীক। সুতরাং, তদ্‌ভিত্তি বা নিদান প্রাচীন গ্রন্থগুলি তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। ফলতঃ, তাঁহাদের লেখাগুলি অপ্রামাণিক না হইয়া

পারে না। দেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ লিখিতে প্রযত্ন পান ; কিন্তু, তাঁহারা পুরাণের দ্বারা নিরতিশয় প্রভাবিত। সুতরাং, তাঁহাদের লেখাও নামে শুধু ইতিহাস, আসলে, পুরাণের পর্য্যায় বেশীর ভাগ পড়ে। অতঃ, এই দেশে তদিতিহাসের নিতান্ত অভাব।

সম্ভবতঃ, এই অভাব পূর্ণ করিতে অধ্যাপক শ্রীজ্যোতির্ময় রায় মহাশয় বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। দুই বৎসর যাবৎ প্রযত্ন করিয়া তিনি আজ লিখিয়াছেন এই **'মণিপুরের ইতিহাস'**। ইহা অনতিবিস্তৃত এক ইতিহাস ; ইহার আদি এবং মধ্যযুগীয় ভাগে, তিনি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে নিজের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন পূর্ব্বগামী দেশীয় কিম্বা বিদেশীয় ঐতিহাসিকদের প্রদর্শিত পন্থা ধরিয়াছেন. কিন্তু, শেষভাগখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। মণিপুরের অধুনাতন ইতিহাসে এত তথ্যপূর্ণ এবং এত প্রামাণিক আর বাহির হয় নাই। তিনি নিজেই ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত ; তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়—ইতিহাস. তাঁহার অধ্যয়নের বিষয়ও ইতিহাস। তাঁহার লেখনীপ্রসূত ইতিহাস ইতিহাস না হইয়া পারে না। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁহার অশ্রান্ত অধ্যবসয়া ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিভাত। তিনি মণিপুরীদের দিয়াছেন এক অমূল্য ধন ; যাঁহারা মণিপুর এবং মণিপুরী বিষয়ক গবেষণা করিতে প্রয়াসী তাঁহাদেরও তিনি দিয়াছেন এক অমূল্য রত্ন।

আর এক কথা, কৃতবিদ্য রায় মহাশয় আমাকে জগতের

সাম্নে অতিসম্মানিত করিয়া তুলিয়াছেন, যেহেতু তিনি বন্ধুতার সমাদরে আমার প্রতি ভূমিকা লিখার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এ হেন সম্মানের জন্য আমি তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীমীনকেতনসিংহ
অধ্যাপক, ধনমঞ্জরী কলেজ,
ইম্ফাল, (মণিপুর)।

ইম্ফাল,
২৭ এপ্রিল ৫৮

লেখকের বক্তব্য

মণিপুরী নৃত্য, মণিপুরের বীর টিকেন্দ্রজিৎ, মণিপুরের তাঁত-শিল্পের কথা পূর্বেই জানাছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মণিপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান উপলক্ষে মণিপুরের উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়ে। তখন হইতেই মণিপুর ও মণিপুরীদের সম্পর্কে জানার কৌতুহল আরও বৃদ্ধি পায়। অবশেষে যখন মণিপুরে আসার সুযোগ ঘটিল—তখন ভাবিয়াছিলাম বহুকালের বাসনা বুঝি এতদিন পর চরিতার্থ হইবে। কিন্তু খোজ খবর নিয়া জানিলাম মণিপুরের ইতিহাস সম্পর্কে তখন পর্য্যন্তও উল্লেখ যোগ্য কোন গ্রন্থ লেখা হয় নাই। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক কারণ-ই এবিষয়ে অনেকাংশে দায়ী। তথাপি এমন একটা সুন্দর দেশের সুসভ্য অধিবাসীদের ইতিহাস অনেক-কাল আগেই রচিত হওয়া উচিত ছিল।

মণিপুরে আসার দুই বৎসর পর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, লোকসভার সদস্য, শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ আমাকে 'মন্দিরা'তে মণি-পুর সম্পর্কে লেখিবার জন্য আদেশ করেন; নিজের যোগ্যতা এবং বিষয় বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে মণিপুরের ইতিহাস সম্পর্কে লেখাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে ভাবিলাম। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে পরিমাণ গবেষণা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আমি তাহা করিতে পারিব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ [illegible]

সেই জন্য ইচ্ছা করিয়াই 'মণিপুরের ইতিহাস নাম না দিয়া "মণিপুর প্রসঙ্গ" নামে মণিপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখিয়া যাইতে লাগিলাম। উপাদান সংগ্রহ ব্যাপারে অধ্যাপক শ্রীনন্দবাবুসিংহ ও রাজকুমার শ্রীস্নাহলসিংহ বি, কম মহাশয়ের নিকট হইতে আমি যথেষ্ট সংযোগীতা পাইয়াছি। মন্দিরার কর্তৃপক্ষ ধৈর্য্য সহকারে মাসের পর মাস আমার লেখাগুলি ছাপাইয়া এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই জন্য আমি তাহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

মন্দিরায় ছাপা শেষ হওয়ার পর আমার এই লেখাগুলি পুস্তক আকারে বাহির করার সম্ভাবনার কথা আমি কখনও ভাবি নাই। আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মি, মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ শ্রীমীনকেতনসিংহ একদিন লেখাগুলি পড়িয়া সবগুলিকে একসঙ্গে "মণিপুরের ইতিহাস" নাম দিয়া পুস্তক আকারে বাহির করিতে বলেন। কিন্তু অর্থাভাবে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্যে হাতদিতে ইতস্তত করিতেছি দেখিয়া তিনি নিজেই আমাকে রামলাল পাল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মণিপুরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাজকুমার শ্রীশীতলজীৎ সিংহ মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। রাজকুমার আমার লেখা পড়িয়া ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন প্রেসে আমার এই বই ছাপানর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রেসের ম্যানেজার শ্রীরাসবিহারীসিংহ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে "মণিপুর ইতিহাস" আজ পাঠকের নিকট উপস্থিত করা সম্ভব হইল।

স্থানীয় প্রেসে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ কারিগরের অভাবে এবং স্থানীয় বাজারে বাংলা পুস্তকের চাহিদা কম থাকায় মণিপুরে বাংলা ভাষায় বেশী পুস্তক ছাপা হয় না এবং ছাপাইয়া লাভের সম্ভাবনাও নিতান্ত কম। এই সব জানা থাকা সত্ত্বেও ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন প্রেসের কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষায় লেখা আমার এই পুস্তক ছাপানর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই জন্য আমি রাজকুমার শ্রীশীতলজিৎসিংহ ও ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নেব কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

মণিপুরের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অতিশয় গভীর। আজকাল নানা হের ফেরে অনেকেই এ সম্পর্কে ততটা সচেতন নয়। বিশেষ করিয়া মণিপুরের বাহিরে বাঙ্গালী সমাজ এবিষয়ে নিতান্তই উদাসীন। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে এই পুস্তকের ক্রুটী বিচ্যুতি যথেষ্টই ধরা পাড়বে। তথাপি যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক সমাজের দৃষ্টি মণিপুরের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি ছাপা হওয়ার দরুণ ভুল ক্রুটী অনেক-ই চোখে পড়িবে। সেইজন্য পাঠকের নিকট মার্জনা ভিক্ষা কারতেছি।

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

২৪ শে এপ্রিল ১৯৫৮ সন।

সূচী-পত্র

মণিপুরের ইতিহাস

রূপে ও গুণে 'মণিপুর ভারতমাতার কণ্ঠের একটি মণি'। হ্রদ ও দ্বীপ-সমন্বিত, পাহাড় ও নদী-বহুল, রৌদ্রদীপ্ত উপত্যকাময় এমন সুন্দর বিহঙ্গ-কূজিত সবুজ দেশ "চিরবসন্ত বিরাজিত" "পূর্বভারতের কাশ্মীর" আর কয়টি আছে? উপত্যকাবাসী মানুষও দেশের এই সুন্দর মাটীতেই গড়া। এমন ফসলভরা মাঠ আর ফুলেভরা বাগান; পরিষ্কার বাড়ীঘর ও পরিচ্ছন্ন এবং নিরলস জীবনযাত্রা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। পরিচ্ছন্নতা এখানকার একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। মণিপুর রাষ্ট্র আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় অনেক ক্ষুদ্র জেলার চেয়ে ক্ষুদ্র হইলেও ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার দান অতুলনীয়। মণিপুর প্রতিভা-বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্র সুকুমার কলা। একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাগুরু রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া ভারতের বৃহত্তর সমাজে উহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। আজ তাহা অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সমাদর লাভ করিতেছে। ভরতনাট্যম্ এবং মণিপুরী নৃত্য জগতের সম্মুখে ভারতীয়

নৃত্যকলার মান অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। এই মণিপুরই বিখ্যাত পোলো-খেলার আদিভূমি (Ref. Encyclopaedia Britanica)। এখান হইতেই ইহা ভারতের অন্যান্য স্থানে, ইংলণ্ড ও ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে, (Ref. The Meitheis—T. C. Hodson)। মহাত্মা গান্ধী সমস্ত ভারতবর্ষে যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস যাহা আজও চেষ্টা করিয়া সফল হইতেছে না, মণিপুরবাসী পুরুষানুক্রমে তাহাই করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় পুঁজিপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রশিল্প এখানকার নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহক নহে। কৃষি এবং কুটীর-শিল্পই এখানকার প্রধান উপজীবিকা। প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই তাঁত আছে। ভাত কাপড়ের জন্য কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। মণিপুরী মেয়েদের সূচীকর্ম এবং এত বিভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর কাজ ভারতের অন্যত্র দুর্লভ। প্রায়ই এখান হইতে নানাপ্রকার কাজ করা কাপড় মণিপুরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে এমনকি আমেরিকা পর্য্যন্ত রপ্তানী হয়। এখানকার কাঠ এবং পিতলের কাজও বেশ সুন্দর। সর্বোপরি যে জিনিষ চোখে পড়ে তাহা হইতেছে এখানে সামাজিক আর্থিক অথবা রাজনৈতিক পদমর্য্যাদা দ্বারা কেহ কাহাকেও পদদলিত করিয়া রাখে নাই। অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণ বৈষম্যের বাড়াবাড়ি হইতে মণিপুরী সমাজ মুক্ত। নারীরা এখানে স্বাধীন। গৃহকর্ম ছাড়াও পরিবারের আয়ের অর্ধেকের বেশী দায়িত্ব মেয়েরাই বহন করে, অথচ চাকুরীর জন্য খুব কমসংখ্যকই অন্যের দ্বারস্থ হয়। মণিপুরীদের কারিগরী বুদ্ধি অনেকটা স্বভাবজাত।

অতি সাধারণ উপাদানের সাহায্যে এখানকার অনেকেই যে কোন নূতন যন্ত্রের নকল তৈরী করিতে পারে। শিক্ষা এবং অনুকূল অবস্থা পাইলে ইহারা জাপানীদের মতই শিল্প-নিপুণ হইতে পারিত। মণিপুরী ভাষাও বিশেষ উন্নত। পূর্বভারতে বাংলা এবং অসমীয় (Assamese) ভাষার পরই মণিপুরী ভাষার স্থান। মণিপুরী ব্রাহ্মণগণ কয়েক শতাব্দী যাবৎ ব্রহ্মদেশ এবং আসামের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দূত হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে (Ref. Kiratajana Kriti Dr. S. K. Chatterjee)।

এইরূপে আয়তন এবং লোক সংখ্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও মণিপুর ভারতবর্ষে আজ যে স্থান অধিকার করিয়াছে ইহা তাহার গৌরবেরই পরিচয়। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণে মণিপুর এতদিন পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলেও ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতি মণিপুরের প্রাণ। তথাপি সে ভারতের অন্ধ অনুকরণ করে নাই। ভারতের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে তাহাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। উপরন্তু ভারতের কাছ হইতে সে শুধু নেয় নাই, দিয়াছেও। নৃত্য এবং ক্রীড়ায় ভারত মণিপুরের কাছে ঋণী। আজ ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্র নৈতিক ঐক্য স্থাপিত হওয়ায় ভারত ও মণিপুরের মিলন সম্পূর্ণ হইয়াছে। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এই মিলন সার্থকতর হইয়া

উঠিবে। এইভাবে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও যে রাষ্ট্র তাহার প্রতিভার কিরণে ভারতবর্ষকে পর্যন্ত আলোকিত করিয়াছে তাহার সম্যক পরিচয় লাভের প্রয়োজন আছে। মণিপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভারতের ইতিহাসেরই একটি বিশেষ অধ্যায়।

মণিপুর লৈপাক্

(মণিপুর ভূমি)

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির নিকট মণিপুর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। রেনেল তাঁহার পুস্তকে (Rennel's Memoir) এবং ভারতের মানচিত্রে ইহাকে মেক্‌লে (Meckley) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অহোমরা বলিত মেখালি (Mekhali), আরও প্রাচীন আসামবাসিগণ বলিত "ম্যাগালু" (Magalu), কাছাড়ে মণিপুরের পরিচয় ছিল 'ম্যাগলি' (Magli)। 'মেখালি' 'ম্যাগালু' এবং 'ম্যাগলি' একই নামের বিকৃত রূপ। স্যাইমেস (Symes) তাঁহার বিবরণে লিখিয়াছেন শান (Shan) দেশের লোক মণিপুরকে বলিত "ক্যাসে" (Ka-se) এবং ব্রহ্মদেশের অপরাপর লোক বলিত "ক্যাথে" (Ka-the)। এই রাষ্ট্রের মণিপুর নামাকরণ অতি আধুনিক কি অতি প্রাচীন এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও নামটি যে অতি আধুনিক কালেই জনপ্রিয় হইয়াছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

(Ref. Abdul Ali—Notes on early History of Manipur, Symes—The Embassy to Ava, Yule & Bur-

nell—A glossary of Anglo Indian words P. 597. Balfour—The Cyclopaedia of India P. 530-58 T. C. Hodson—The Meitheis)

বর্তমান মণিপুর ২৪° ২৫° ৫০—অক্ষাংশ এবং ৯০° দ্রাঘিমাংশ রেখার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু মণিপুরের প্রাচীন গ্রন্থে আরও বিস্তৃত সীমার উল্লেখ দেখা যায়। পূর্বদিকে ছিল ব্রহ্ম ও চীন; ব্রহ্মদেশের কতকাংশ মণিপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত, উত্তরে হিড়িম্বারাজ্য এবং উত্তর পূর্বে মোরান (Moran) পর্যন্ত মণিপুর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। এই গিরিসঙ্কুল ভূভাগের কেন্দ্রস্থলে ডিম্বাকৃতি সমতল উপত্যকাটিই হইতেছে মণিপুরীদের প্রিয় জন্মভূমি। বর্তমান মণিপুরের আয়তন ৮,৬৩৮ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে উপত্যকাটির আয়তন হইতেছে মাত্র ৬৫০ বর্গমাইল। পাহাড় অঞ্চলে নাগা এবং কুকি সম্প্রদায়ের বাস। মণিপুরের হিন্দুগণ এই নাগা এবং কুকি সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র এক উন্নত 'মৈতাই' মানব গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। এই গ্রন্থে মণিপুরী বলিয়া যাহাদিগকে উল্লেখ করা হইবে, তাহারা উপরোক্ত হিন্দু "মৈতাই" সম্প্রদায়।

এই "মেকুলে" বা "ক্যাসে" বা মণিপুর ভূখণ্ড যেদিন সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া সূর্যকে প্রথম দর্শন করে, তাহা যে আজ হইতে ১০ লক্ষ বৎসরের বেশী পূর্বে হইবে না, এমন অনেক প্রমাণ ভূতত্ত্ববিদগণের নিকট আছে। অধুনা মণিপুর পাহাড়ে মিঃ এ, জি, কে, মেনন (A. G. K. Menon) কর্তৃক এক প্রকার [illegible]

মৎস্যের 'ফসিল' (Fossil) আবিষ্কারের পর এ সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে। ডাঃ সুন্দরলাল হোরার (Dr. S. L. Hora)† মতে এক সময়ে মণিপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা, গারো পাহাড় এবং বাংলা দেশের বিস্তৃত অঞ্চল সমুদ্রের তলদেশে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এই বিস্তৃত জলরাশির উত্তর পূর্বদিকে আসামের পাহাড়গুলি মহাচীনের প্রহরীর মত মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রাচীনতায় আসামের পাহাড়গুলি হিমালয়েরও পিতামহ। যেস্থানে এখন অগণিত দ্বীপরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর, সেখানকার বৃহৎ ভূখণ্ড যখন একদিন কোন কারণে সমুদ্র গর্ভে আত্মগোপন করে তখন অন্যদিকে সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়ায় তলদেশ হইতে আর এক বৃহৎ ভূভাগ আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে বাংলা, আসাম এবং মণিপুরের নরনারীদিগকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া নেয়। জল এবং স্থলের এই ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চিরকাল ধরিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান কালে সমুদ্র উপকূল হইতে বহুদূরে অবস্থিত তমলুক যে মাত্র দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল, তাহা ভূগর্ভে নিহিত সামুদ্রিক জাহাজের মাস্তুল আবিষ্কৃত না হইলে এবং ঐতিহাসিক যুগের পর্যটকগণের বিবরণীতে লেখা না থাকিলে কে বলিতে পারিত। মণিপুরী পুরাণেও আছে যে আদিতে সমস্তই জলময় ছিল। নয়জন 'লাইবংথৌ' (দেবতা) এবং সাতজন 'লাইলুড়া' (দেবী) একসঙ্গে কাজ করিয়া ৬৪টি মাটির ঢিপি সৃষ্টি করিলেন। তখনই হইল পৃথিবীর জন্ম। অতঃপর

একদিন শিব মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে রাস নৃত্য করিবার ইচ্ছায় মণিপুর আসিয়া নোংমাইজিং গিরির (নীলকান্ত গিরি) শৃঙ্গে অবতরণ করেন। উপত্যকাভূমি তখনও জলমগ্ন। শিব মহাদেব জল নিষ্কাশনের জন্য ত্রিশূল দ্বারা দক্ষিণ দিকে গিরি ভেদ করিয়া একটি গুহাপথের সৃষ্টি করেন। এই পথে জল অনেক বাহির হইলেও কিছু রহিয়া যায়। অবশেষে ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় মনোরম উপত্যকাটি ভাসিয়া উঠে। প্রথম যে-স্থানটি জলমুক্ত হয় তাহার নাম রাখা হয় বিষ্ণুপুর। পুরাণে বর্ণিত মণিপুরের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী হইতেও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মণিপুর এককালে জলমগ্ন ছিল।

(Ref. Mutua Jhulon Singh—Bijoy Panchalee. Atombapu Sharma—Manipur Sanatan Dharma)

মৈতাই গোষ্ঠী

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মণিপুরী সম্প্রদায় কুকি-চীন মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের জ্ঞাতিবর্গ ব্রহ্মদেশ লুসাই পাহাড়, চট্টগ্রাম পাহাড় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়াইয়া আছে। বঙ্গদেশ এবং আসামে তাহারা 'কুকি' নামে পরিচিত, ব্রহ্মদেশে পরিচিত 'চীন' নামে। এই দুই নাম যুক্ত করিয়া বলা হয় 'কুকি চীন।' মণিপুরের প্রাচীন উপাখ্যান আলোচনা করিয়া কর্ণেল ম্যাক কুলোক (Col, Mc. Colloch) বলেন, পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল হইতে খুমল, লুয়াং, মোইরাং, এবং মৈতাই প্রভৃতি উপজাতি উপত্যকা

ভূমিতে আসিয়া বসবাস করে। ক্রমে মৈতাই সম্প্রদায়ের প্রধান্য বিস্তারের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিরও স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া যায় এবং সকলেই মৈতাই বলিয়া পরিচিত হয়।

অনেকে বলেন 'মৈতাই' শব্দ 'মী' (মানুষ) এবং থাই (পৃথক) এই দুই শব্দের মিলনে উৎপন্ন। ব্রীয়ান এইচ হজ্‌সনের (Brian H. Hodgson) মতে মৈতাই শব্দ মূলতঃ শ্যামের থাই (Tai) এবং কোচীনের মোই (Moi) শব্দের মিলিত রূপ। তিনি বলেন শ্যামের বৃহৎ থাই গোষ্ঠির উপশাখা 'মোই' (Moi) সম্প্রদায়ের লোকই মণিপুর 'মৈতাই' নামে পরিচিত।

(Ref. Journal of the Asiatic Society of Bengal 1853)

কিন্তু মণিপুরের সভ্যতা এবং রাজনীতির উপর শান (Shan) দের প্রভাব এত বেশী স্পষ্ট যে 'মৈতাই'কে 'থাই' জাতির শাখা বলিয়া গ্রহণ করা কষ্টকর। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় মণিপুরী ভাষা বৃহৎ তিব্বতী-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) গোষ্ঠীর কুকি-চীন (Kuki-Chin) পরিবারভুক্ত।

মণিপুরের কোন কোন গোঁড়া হিন্দুর ধারণা মৈতাইগণ পশ্চিম হইতে আগত আর্য জাতিরই এক শাখামাত্র। ভাষা এবং নৃতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই ধারণার সমর্থনে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মৈতাইগণ কুকি-চীন গোষ্ঠির লোক হইলেও তাহাদের মধ্যে নাগা এবং আর্যরক্ত মিশ্রণের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। প্রাক্‌-বৈষ্ণব যুগে মণিপুরীদের সামাজিক এবং

পারিবারিক প্রথার সঙ্গে নাগাদের সামাজিক আচরণের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। রাজা এবং ব্রাহ্মণগণ পাইকারী ভাবে নাগাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকার দিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন, এমন অনেক প্রমাণ আছে। মাত্র একশত বৎসর পূর্বেও দেখা যায় থাঙ্গাল নাগাকে মণিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া সেনাপতিপদে উন্নীত করা হয়। বর্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা এবং মণিপুরে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পামহৈবাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নাগা বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। মণিপুরে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্যেও নাগা প্রথার যথেষ্ট ছাপ রহিয়াছে। পশ্চিম হইতেও বিভিন্ন সময়ে দলে দলে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। মণিপুরীদের মধ্যে দৈহিক গঠনে এবং বর্ণে এমন অনেকে আছে যাহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর আর্যদের নিকট জ্ঞাতি বলিয়া মনে হয়।

(Ref. T. C. Hodson—The Meitheis. Dr. S. K. Chatterjee—Kirata-Jana-Kriti. Mutua Jhulon Singh —Bejoy Punchalee. Mc. Culloch—Account of the Valley of Manipur).

মহাভারতের মণিপুর

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে মণিপুর রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন এই ধারণা মণিপুরের এবং মণিপুরের বাহিরেও অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল; ডাঃ কালীপ্রসন্ন বাগ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের এই মতই সমর্থন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধপর্বে বভ্রুবাহনের বীরত্বের বিশদ বর্ণনা আছে। অর্জুনের ঔরসে এবং মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম। কিন্তু বর্তমান মণিপুরের সঙ্গে মহাভারতের এই ঘটনাকে যুক্ত করিতে অনেক পণ্ডিতই ইতস্ততঃ করেন। তাঁহাদের মতে মহাভারতের মণিপুর বর্তমান মণিপুর হইতে ভিন্ন। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার 'বিশ্বকোষে' মহাভারতে বর্ণিত মণিপুরকে কলিঙ্গের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক গেইট্ (Gait) এর মতে প্রাচীন মণিপুর ছিল বর্তমান উড়িষ্যায়; ডাঃ আপ্তের মতে মাদুরার উত্তরে, জেনারেল ক্যানিংহ্যামের মতে রত্নপুরের উত্তরে; অযোধ্যার অনেকে বর্তমান মান্নুয়াকে নির্দেশ করেন; মাদ্রাজের অনেকে মনে করেন বর্তমান মোহনপুরই মহাভারতের মণিপুর। এই কঠোর দ্বন্দ্বের মীমাংসা দুষ্কর। মণিপুরের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীঅতোম্বাপু শর্মা বিদ্যারত্নের মতে বর্তমান মণিপুরই মহাভারতের বর্ণিত মণিপুর।

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরবর্তিব্রহ্মাবর্তবাসিভির্যাজ্ঞিকৈ বিপ্রৈর্মেধাবদ্ভিঃপুরৈব ভূবলয়োপরি যুগমাত্রোদিতাগ্নেয়তারাবলিমবলোক্য যস্যাং স্থাপিতা প্রাগ্‌বংশশালা তদুপলক্ষিতং স্থানং হি

'রম্যং মণিপুরং নাম বভ্রুবাহনপালিতং।
দ্বিতীয়মিব বৈকুণ্ঠং স্থাপিতং বিষ্ণুণা ক্ষিতৌ।'

শ্রীঅতম্বাপু শর্মা।

প্রাচীনকালে পবিত্র সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মর্ষিদেশবাসী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দিকচক্রবালের ৮৪ অঙ্গুলির

উপর অবস্থিত যে নক্ষত্র (Pleidas) দর্শন করিয়া প্রাগ্‌বংশ-শাল এবং যজ্ঞ আরম্ভ করিতেন—সেই দিকেই ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক স্থাপিত এবং বভ্রুবাহন কর্তৃক পালিত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ সদৃশ মনোরম মণিপুর নগরী।

"উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ।
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছয়ম্‌॥
তত্র বৈখানশা নাম বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ।
প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্য্যবর্ণাঃ তপস্বিনঃ॥
অয়ং সুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্য প্রকাশতে।
তস্মিংস্তেজশ্চ চক্ষুশ্চ সর্বপাপভৃতামপি॥"
"ইত্যেষং বাল্মীকিনোক্তমস্য স্থানস্য বিন্দকং
'গ্রিনিচঃ পূর্বতো বাণগ্রহে দ্রাঘিম্নি চোত্তরা।
চতুর্বিংশে নিরক্ষাশ্চ যত্র তিষ্ঠতি বৈসদা।"

শ্রীঅতম্বাপু শর্ম্মা

সূর্য উত্তর দিকে জম্বুদ্বীপ পরিক্রমণ করিয়া উদয়পর্বতের শিখরে তাঁহার যাত্রা শেষ করেন। সেখানে সূর্যের মত উজ্জ্বল বৈখানশ এবং বালখিল্য বিরাজ করিতেছেন। এই সুন্দর দ্বীপেই সূর্য প্রথম তাঁহার কিরণ বিকীরণ করেন........। পণ্ডিত শর্মার মতে বাল্মীকি বর্ণিত উক্ত স্থানই ৯৫° দ্রাঘিমাংশ এবং ২০° অক্ষাংশের অন্তর্বর্তী বর্ত্তমান মণিপুর।

"মণিপূরং সমাগম্য পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।
মধ্যাচ সমুদ্রাক্রান্তং পর্বতৈর্বহুধামিমাং।"

নিবৃত্তোঽভিমুখস্তস্মাৎ যেন বারনসাবয়ম্।
যদৃচ্ছয়া সমাপেদে পুরং রাজগৃহং তদা ॥"

মণিপুর আসিয়া পাণ্ডু-পুত্র ধনঞ্জয়ের সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী পর্যটন শেষ হইলে তিনি হস্তিনা অভিমুখে যাত্রা করিয়া অসাবধনতা বশতঃ রাজগৃহ নগরে চলিয়া আসেন। পণ্ডিত শর্মা বলেন মণিপুর যদি কলিঙ্গ, দক্ষিণভারত অথবা অযোধ্যার কোথাও অবস্থিত হইত তবে অর্জুনের পক্ষে মণিপুর হইতে হস্তিনা আসার পথে রাজগৃহ নগরে কিছুতেই পৌছা সম্ভব হইত না। মহাভারতে বর্ণিত মণিপুর কোন সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থান হইবে। প্রাচীন-কালে সমুদ্র যে মণিপুব রাষ্ট্রের আরও নিকটে ছিল তাহা মণিপুর-পুরাণ ও ভূতত্ত্ববিদ্যা উভয়ের দ্বারাই সমর্থিত হয়।

মণিপুর-পুরাণেও অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনকে মণিপুরের রাজা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বর্তমান রাজবংশের ধমনীতে বভ্রুবাহনের রক্তের স্রোতই প্রবাহিত হইতেছে।

কিন্তু এবিষয়ে মণিপুর-পুরাণের প্রামাণ্য বিচারসাপেক্ষ। কথিত আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা পামহৈবা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পর প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের সমস্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলার নির্দেশ দেন। তাহার ফলে মাত্র তিনটি গ্রন্থ ব্যতীত আর সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর স্মৃতি হইতে সেগুলি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে মণিপুর-পুরাণে উক্ত অর্জুন এবং বভ্রুবাহনের কাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া চলেনা। উপরন্তু ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন উপাখ্যানগুলি

হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢালাই করিয়া নূতন রূপ দেওয়ায় তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বর্তমান মণিপুর মহাভারতের মণিপুর হইতে অভিন্ন কিনা এবিষয়ে বিচার করিতে হইলে মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থকেই প্রামাণ্য হিসাবে ধরিতে হইবে। আব্দুল আলির মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী মণিপুরের নাগা রাজা পামহৈবাকে বলেন তিনি মহাভারতের অর্জুনের বংশধর সুতরাং পবিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। তখনই তিনি তাঁহার মৈতৈ প্রজাবর্গসমেত নিজেদিগকে হিন্দু বলিয়া ঘোষনা করেন। এই ঘটনার পশ্চাতে গূঢ় রহস্য নিহিত থাকা স্বাভাবিক। হয়ত আত্মবিস্মৃত মণিপুর হিন্দু সন্ন্যাসীর উক্তির মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল, নতুবা পশ্চিম হইতে আগত প্রচারকদের চেষ্টার ফলে বহুদিন পূর্ব হইতেই মণিপুরে হিন্দুধর্মের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিতেছিল। পামহৈবা এবং হিন্দু সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ মাত্র। নতুবা বিনা রক্তপাতে এইরূপ ধর্মবিপ্লব কিরূপে সম্ভব হইল? এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইলে পণ্ডিত অতম্বাপু শর্মার পন্থা অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থাদির আরও ব্যাপক গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

Ref.—Panditraj Atombapu Vidyaratna—Manipur Sanatan Dharma.
Abdul Ali—Notes on the Early History of Manipur.
Dr. S. K. Chatterjee—Kirata-Jana-Kriti

(দুই)
ইতিহাসের উপাদান

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মণিপুরের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আজও সফল হয় নাই। উপযুক্ত তথ্যের অপ্রাচুর্য এবং ধৈর্যবান একনিষ্ঠ কর্মীর অভাবেই কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। এক শ্রেণীর লোকের ধারণা মণিপুরের ইতিহাস রচনার চেষ্টা নিষ্ফল, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিও এবিষয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর। বস্তুতঃ তথ্যের অপ্রাচুর্যের অভিযোগও এক হিসাবে অত্যন্ত মামুলী ধরণের। ভূগর্ভে নিমজ্জিত প্রাসাদ, গৃহ ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সমূহ, শিলালিপি, অস্ত্র-শস্ত্র. হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস ও তাহাদের সঙ্গে চুক্তিপত্রাদি হইতে মণিপুরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা চলে। মণিপুরের পুরাতত্ত্বগবেষণা-ক্ষেত্রে শ্রীওয়াহেংবম য়ুমজাও সিং (Shri Waheng-bam Yumjao Singh) যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেন। তিনি প্রথমতঃ বহুদিন একক চেষ্টায়, অতঃপর ১৯৩৩ সন হইতে সরকারী সাহায্যে বিভিন্ন স্থান খনন করাইয়া অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পান। বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ সাঙ্গাইথেন অঞ্চলে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের স্থানটি খনন করার ফলে রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্ন পাওয়া না গেলেও মৃৎপাত্র এবং এই ধরণের অনেক শিল্পজাত দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। মধ্যযুগে চীনা বন্দীদের বাস-স্থান কামেং অঞ্চল খনন করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মৃৎপাত্র, বর্ষাফলক, একটি বুলেট, একপাত্র সীসা এবং আরও অন্যান্য

বহুদ্রব্য পাওয়া যায়। এইরূপ খননের দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যের মধ্যে ২য় শতাব্দীর ৪টি মুদ্রা সহ বহু মণিপুরী মুদ্রা এবং আসামের রাজা প্রমথ সিংহ কর্তৃক প্রবর্তিত ১৭৫১ খৃঃ অব্দের একটি মুদ্রাও আছে। পাহাড়ে এবং উপত্যকায় কতকগুলি শিলালিপি, তাম্রলিপি এবং হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে কতকগুলি মণিপুরী, বাকীগুলি বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয় ভাষায় এবং একটি শান ভাষায় লিখিত। অন্যান্য আবিষ্কৃত বিষয়ের মধ্যে একটি মস্তকহীন বুদ্ধের মূর্তি, একটি সারিন্দা, তিনটি কামান উল্লেখযোগ্য। কামানগুলি ১৬৭০ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী। প্রাচীনতম কামানটির গায়ে আসামের রাজা উদয়াদিত্য সিংহের নাম খোদিত আছে।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে (লেখকের নিকট চিঠি) হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে মণিপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ইত্যাদি নানা বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। রাজা পামহৈবা কর্তৃক অনেক প্রাচীন গ্রন্থ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কথা সত্য হইলেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা এবং অনুবাদ-ও করাইয়াছিলেন। বহু ধর্মপ্রাণ মণিপুরী পামহৈবার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনেক গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে "চৈথারোন কুম্বাবা" (Cheitharon Kumbaba) প্রাচীন মণিপুরী লিপিতে লিখিত রাজাদের কাহিনী, নিংথৌরেল সিংকক (Ningthoural Shing-

kak) প্রাচীন মণিপুরীতে লিখিত মণিপুর রাজ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এবং পোইরৈতোন খুন্থোকপা (Puireiton khunthokpa) প্রাচীন মণিপুরী লিপিতে লিখিত পোইরৈতোন কর্তৃক মণিপুরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীয়ুমজাও সিংহের চেষ্টার পর মণিপুরে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার কাজ এক তিলও অগ্রসর হয় নাই। উপরন্তু তাঁহার এত চেষ্টা এবং সাধনার ফল-ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় সরকারী দপ্তরে যে সমস্ত মূল্যবান দলিলপত্র ছিল, আজ সে গুলির-ও কোন সন্ধান কেহ দিতে পারেন না। এই জন্য বিগত মহাযুদ্ধ-ও অনেক পরিমাণে দায়ী। আজ মণিপুরের যোগ্য সন্তানগণ মণিপুর রাষ্ট্রের কর্ণধার। মণিপুরের একনিষ্ঠ সেবক য়ুমজাওসিং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একাকী যে মহৎ কাজ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন—আশা করি মণিপুরের বর্তমান জাতীয় সরকারের আনুকুল্যে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

সভ্যতার প্রাচীনতা

মণিপুর সভ্যতার বয়স নির্ণয় করা কঠিন হইলে-ও উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। মণিপুরে প্রাপ্ত প্রাচীনতম আটটি মুদ্রার এক পৃষ্ঠে দেবনাগরীতে লেখা আছে "চৈত্র শুধী তরাসভাদ ২য় সম্বদ ১৬৪"। অপর পৃষ্ঠের লেখা মুছিয়া গিয়াছে। মুদ্রার ভাষা সংস্কৃত না হইলে-ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পাঠোদ্ধারের

ফলে লিপিটির অর্থ হয়—"চৈত্র মাস, শুক্লপক্ষের ২য় দিন, রবিবার—১৬৪ সম্বৎ।" প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিষ গণনা দ্বারা-ও (Astronomical calculation) দেখা গিয়াছে ঐ বৎসরের ঐ দিনটি রবিবার ছিল। ক্যাপ্টেন ই এইচ্-কব্ (Capt. E. H. Cobb) কর্তৃক পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের তীরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায় ১৬৮ সম্বতের আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ৮ম দিবস শনিবার ছিল। ঐ দিবস হইতে হিসাব করিলে-ও দেখা যায় মণিপুরে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি যে তারিখের সেই দিন রবিবার ছিল। উক্ত ২টি লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত হইলে-ও ভাষায় যে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তাহা স্থানীয় প্রভাবের ফল। এই স্থানে উল্লেখ-যোগ্য যে মণিপুরে অপরাপর যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় অতি আধুনিক কালে রচিত মুদ্রা ভিন্ন অন্য সমস্ত মুদ্রারই লিপি দেবনাগরী। সুতরাং উপরোক্ত খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর মুদ্রাগুলি মণিপুরেই রচিত হইয়াছিল এবং সেই সুপ্রাচীন কালে মণিপুর আর্যাবর্তের সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল এরূপ মনে করা আদৌ অযৌক্তিক নয়। (Ref. The Archaeological Studies in Manipur—W. Yumjao Singh, মাসিক বসুমতী—ভাদ্র, ১৩৪১ সন।)

যদি মহাভারতে বর্ণিত মণিপুর এবং বর্তমান মণিপুর এক হইয়া থাকে তাহা হইলে মণিপুরের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ খৃঃ ২য় শতাব্দীর বহু পূর্বেই ঘটিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মহাভারতের রাজ-নৈতিক ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া

মানিয়া লইয়াছেন। প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদ পারজিটারের (Pargiter) হিসাব মতে খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মহাভারত রচনার কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নানা মত পোষণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হয়। মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলে-ও মহাভারত গ্রন্থের প্রাচীনতা এবং তাহার মধ্যে উল্লিখিত স্থানগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে না হইলে-ও খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে আর্যাবর্তের সঙ্গে মণিপুরের আত্মীয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহাভারত।

হার্ভে (Harvey) তাহার ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের তিনটি বাণিজ্য পথ ছিল। তন্মধ্যে ২টি ছিল ইরাবতী এবং স্যালুইন অববাহিকায় এবং তৃতীয়টি ছিল চিন্দুইন অববাহিকায়। ঐ পথে মণিপুরের মধ্য দিয়া বানিজ্য-সম্ভার তিন মাসে আফগানিস্থানে পৌঁছিত। আফগানিস্থানের বাজারে চীনের সিল্ক ইউরোপীয় স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রী হইত। ফেয়ার (Phayre)-ও বিশ্বাস করেন ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজপুরুষগণ ঐ পথেই মণিপুর এবং কাবো ভ্যালি-র (Kabo Vally) মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশে আসেন। কর্ণেল জেরিনীর (Col. Gerini) মতে খ্রীঃপূঃ ৩য় শতাব্দীতে কলিঙ্গদের একটি শাখা শ্রীহট্ট-মণিপুর এবং কাবো-ভ্যালির মধ্য দিয়া পশ্চিম ব্রহ্ম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। স্যার ইলিয়ট (Sir W. Elliot)-এর মতে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে দ্রাবিড়-

দেশীয় অন্ধ্রগণ কলিঙ্গদেব অনুগমন করিয়া নাফ ও কুলাদন নদী The Naff & the Kuladon) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। টলেমি তাঁহার ভূগোলে এই অঞ্চলেব তুগমা (Tugma), ত্রিগলিপ্তন (Triglypton) ও মররা বা মোরে (Mauria) নামক তিনটি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল জেরিনী অবশেষে বলেন দ্রাবিড়দের পতনেব পর মণিপুব কিছুদিন ব্রাহ্মণ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়। ব্রহ্মদেশেব রাজাদের কাহানী "মহারাজ বংশ" পাঠ করিয়া কর্ণেল জেরিনী আরও বলেন, খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে শাক্য-বংশীয় নৃপতি ধ্বজরাজ মণিপুরে বসতি স্থাপন করিয়া পরবর্তীকালে প্রাচীন পাগান (Old Pagan) বিজয় করেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৃহত্তর ভারতে (ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া) ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টের জন্মের বহুদিন পূর্ব হইতেই ভারতীয় বণিক এবং প্রচারক দল ঐ সমস্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিতেছিলেন। সম্রাট অশোক খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পূর্বে বৃহত্তর ভারতের নানাস্থানে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস আজ পর্যন্ত তমসাচ্ছন্ন থাকিলেও ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা পরিবেষ্টিত মণিপুর সে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এরূপ মনে করা কষ্টকর। স্যার জেমস্ জনষ্টোন (Sir James Johnstone), ক্যাপ্টেন ডান (Capt. Dunn) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মনে করেন

স্মরণাতীত কাল হইতেই মণিপুরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে আর্যজাতির নানা শাখা মণিপুরে এবং মণিপুরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আসিতেছিল। (Ref. Researches on Ptolemy's Geography—Col. Gerini, History of Burma—Harvey, History of Burma—Sir A. Phayre, Experience in Manipur and Naga Hill—James Johnstone, Abridged Gazetteer of Manipur—Capt. Dunn.)

(তিন)

পৌরাণিক যুগ

মণিপুরের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে অন্ততঃ ৮ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগকে নিছক পৌরাণিক যুগের মধ্যেই ধরা চলে। ৮ম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত যুগ ও ঘটনার অপ্রাচুর্য হেতু এবং বিজ্ঞানসম্মত বিচারের অভাবে এখনও সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক মর্যাদা পায় নায়। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের বিখ্যাত রাজা পামহৈবা (গরীব নওয়াজ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হইতে মণিপুরের ইতিহাস ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকে।

পৌরাণিক যুগের কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা যদি সফল নাও হয় তথাপি গ্রীক উপাখ্যানের (Greek Legends) ন্যায় সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে (Sociology) ইহাদের মূল্য চিরকাল স্বীকৃত হইবে। পৃথিবী-সৃষ্টি, শিবের রাস-নৃত্য পোইরৈতোনের আগমন, পাখাংবার উপাখ্যান, নোংপোকনিংথৌ ও পান্থোইবী এবং খাম্বা ও থোইবী এই দুই প্রেমিক যুগলের প্রেমের অমর কাহিনী লইয়া অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা এবং অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের ন্যায় অনেক সুন্দর কাব্য, উপন্যাস ও নাটক রচনা করা যায়। এখানে মনিপুরের কএকটি পৌরাণিক কাহিনী উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জীব সৃষ্টি

লাইথাক লাইখারোল নামক পুরাণে আছে—বহুকাল একদিন

গল্পচ্ছলে গণেশের নিকট মণিপুরের সৃষ্টীরহস্য ব্যক্ত করেন। নয়জন 'লাইবংথৌ এবং সাতজন লাইনুবা' কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টির পর অতিয়া গুরুশিদব (অতিয়া—ব্যোম, গুরু—পরমাত্মা, শিদব—অমর অর্থাৎ মহাকাশের শাশ্বত পরমাত্মা) দৈব পুরুষ কোদিন-এর উপর জন্ম মৃত্যুর বশ এমন জীব সৃষ্টির ভার দিলেন। আদেশ পাইয়া কোদিন সাতটি ব্যাঙ এবং সাতটি বানর আনিয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ইহাদের কোন হিতাহিত বোধ বা চিন্তাশক্তি না থাকায় গুরু ইহাদিগকে অনুমোদন না করিয়া পুনরায় তাহাকে তাঁহার নিজের আকৃতির অনুরূপ প্রাণী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। আদেশ অনুযায়ী প্রতিমূর্তি তৈরী করিয়া আনা হইলে গুরু তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। ইহাই হইল আদি মানব। অতঃপর ব্যাঙগুলি জলে, বানরগুলি পাহাড়ে এবং মানুষটিকে উপত্যকায় রাখা হইল। ইহারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর বশ। অবশেষে নররূপী কোজিন তুথোকপা (সূর্য) এবং অশিবা (চন্দ্র) সৃষ্টি করা হইল। এইরূপে সৃষ্টিকার্য সমাধা করিয়া গুরু অন্তর্হিত হইলেন।

অনেকদিন পর 'কুরুমচাং' পাহাড়ে বরাহদেব কর্তৃক নির্মিত একটি সুড়ঙ্গপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ওয়াংখৈ অঞ্চলে গুরু সকলকে দর্শন দেন। অতঃপর একদিন কুপট্রেং এবং সেন্ট্রেং নামক তাঁহার দুই পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাহাদের সঙ্গে আরও সাতজন দেবতা গুরুর নিকট আসিয়া পৃথিবীতে নর-জীবন লাভের প্রার্থনা জানান। গুরুর সঙ্গে যে সাতজন দেবী আসিয়াছিলেন,

ঐ সাতজন দেবতার সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হয়। ইহারাই অঙোম, নিংথৌজা, লুয়াং, খুমন, মোইরাং, চেংলাই এবং খাবা ঙাম্বা—মণিপুরের এই সাতটি বিখ্যাত বংশের স্থাপয়িতা।

গুরু একদিন তাঁহার প্রতি পুত্রদের শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ পরীক্ষা করিবার জন্য একটি মৃত গরুর রূপ ধারণ করিয়া বিজয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। সেণ্ট্রেং মৃত গরুর অস্বাভাবিক ভাবে লাঙ্গুল সঞ্চালন দেখিতে পাইয়া উহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন তাহাদের ছদ্মবেশী পিতা বলিয়া অনুমান করেন। কুপট্রেং ইহা বিশ্বাস না করিলেও সেণ্ট্রেং এর অনুরোধে তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া গরুটিকে জল হইতে টানিয়া তুলেন। গুরু তখন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সেণ্ট্রেংকে বলেন "তুমি তোমার পিতাকে চিনিতে পারিয়াছ, অতএব এখন হইতে তোমার নাম হইল 'পাখংবা' (পা—পিতা. খংবা—জানা; পাখংবা—যে পিতাকে জানে)। কুপট্রেং-এর শরৎকাঞ্চনের মত বর্ণ ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে আদর করিয়া বলিত স্নামাহি (স্না—সোনা ; মাহি—তরল)।

আরেকদিন গুরু স্নামাহি (কুপাট্রেং) এবং পাখাংবা-কে (সেণ্ট্রেং) ডাকিয়া বলেন 'তোমাদের মধ্যে যে আগে পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া আসিবে আমি তাহাকেই সিংহাসনে বসাইতে সংকল্প করিয়াছি'। এই সংকল্প শুনামাত্র জ্যেষ্ঠ স্নামাহি দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলেন। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাখংবা লাইমারেনশিদবীর পরামর্শে সাতবার গুরুর আসনের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া পিতার নিকট নিবেদন করেন যে তাঁহার পৃথিবী

পরিক্রমণ সমাপ্ত হইয়াছে। কারণ গুরুকে প্রদক্ষিণ করিলেই পৃথিবী পরিক্রমণের ফল লাভ হয়। পিতা পাখাংবার ভক্তি এবং জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন। এদিকে স্নামাহি পৃথিবী পরিক্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তাঁহার ক্রোধের মাত্রা ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। দুই ভাই-এর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া পিতা উভয়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন—দুইজনই একএকবারে ১২ বৎসর করিয়া পালাক্রমে রাজসিংহাসনে বসিবেন; উপরন্তু যখন একজন সিংহাসনে আসীন থাকিয়া রাজসম্মান ভোগ করিবেন তখন অন্য ভ্রাতা মণিপুরের প্রতি গৃহে গৃহদেবতারূপে পূজিত হইবেন। এইরূপে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর গুরু তাঁহার বাহন তাওরোইনাই (সর্পরাজ) রাখিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হন।

নোংপোক নিংথৌ ও পান্থোইবী—

ইম্ফালের পূর্বদিকে নংমাইচীং পাহাড়ের চূড়ায় নোংপোকনিংথৌ নামে একজন শিদধুম (অমর মহাপুরুষ) বাস করিতেন। তিনিই প্রাচীশ্বর মহাদেবের অবতার। মণিপুরের পশ্চিম দিকে লোইচাং শৈলরাজীতে পার্বতী পান্থোইবী নামে সেখানকার গিরিরাজের পরমা সুন্দরী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারী পান্থোইবী যখন একদিন পিতার শস্যক্ষেত্রে কাজ করিতেছিলেন তখন শিকার অন্বেষণে রত নোংপোকনিংথৌ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সেখানে

আসিয়া এই অনিন্দ্যসুন্দর কুমারীর সাক্ষাৎ পান। তখন উভয়েই উভয়ের ভুবন বিজয়ী রূপে মুগ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। কতক্ষণ এইভাবে কাটে বলা যায় না। পান্থোইবীর অন্তরের সুপ্ত প্রেম জাগরিত হইয়া তাহার সমস্ত দেহে এক শিহরণে সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রেমের এই অদ্ভুত অনুভূতিতে তাহার চোখ হইতে বিগলিত ধারায় অশ্রু বহিতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। তাহার পিতা এবং অন্যান্য পরিজন তখন সেখানে আসিয়া ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিত ত্রিশূলধারী নোংপোকনিংথৌ এর সাক্ষাৎ পান। কে এই পুরুষ? দেব না দৈত্য না শুধু দৃষ্টি ভ্রম। কিছুই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পান্থোইবী হয়ত এই অদ্ভুত দর্শন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাকে ঘরে নিয়া আসিলেন। এই প্রেমিক যুগলের অন্তর যে প্রেমের আগুনে দগ্ধ হইতেছিল সেই খবর কেহ লইলেন না। বাড়ীতে আসিয়াও পান্থোইবীর অপ্রকৃতিস্থ ভাব কাটে না। একা একা বসিয়া থাকেন আপন মনে কথা বলেন, কোন কিছুতেই আগ্রহ নাই, কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া পিতা অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক চিকিৎসা এবং পরিচর্যা করিয়াও কোন ফল হইল না। অবশেষে মেয়ের বিবাহের বয়স হইয়াছে সুতরাং বিবাহ দিলে হয়ত অসুখ সারিয়া যাইবে এই ভাবিয়া পান্থোইবীকে খাবা'র হস্তে সমর্পণ করিলেন। পতিগৃহে আসিয়াও তাহার অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। বরং কাটা ঘায়ে নুন পড়ায় অন্তরের জ্বালা আরও বাড়িয়া

গেল। প্রাণনাথ নোংপোকনিংথৌ তাহার দিবসের একমাত্র ধ্যান এবং রাত্রির একমাত্র স্বপ্ন। কায়মন তাহারই চরণে নিবেদিত। মিলন না হইলে বাঁচিয়া লাভ কি! অন্তর্যামী কি পান্থোইবীর এই আকুল আহ্বানে সাড়া দিবেন? এ জীবনে কি তাহাদের মিলন সম্ভব হইবে?

এদিকে বেচারা খাবা পড়িল মহা সমস্যায়। যাহাকে লইয়া সারাজীবন কাটাইতে হইবে সেই নববিবাহিত স্ত্রীটি, তাহার পাগল না ডাইনী? নানা সংশয় ও সমস্যায় তাহার দাম্পত্য জীবনের প্রভাতেই সন্ধ্যার যবনিকা নামিয়া আসিল।

মদন দেব পান্থোইবীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। নোংপোকনিংথৌ খাবা'র সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা পান্থোইবীর বিবাহের সংবাদ পাইয়া পাগলের মত তাঁহার অন্বেষণে ছুটিয়া বাহির হইলেন। পান্থোইবী-ও তখন তাঁহারই অন্বেষণে রত। ইম্ফালের কংলা নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। এদিকে খাবা গৃহ শূন্য দেখিয়া নানা জায়গায় পান্থোইবীর অনুসন্ধানের পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

হতভাগ্য খাবা'র জন্য পান্থোইবী এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; অতএব সে কি করিয়া স্বর্গের দেবীকে তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে বাঁধিয়া রাখিবে।

অনেক দিন পর খাবা পান্থোইবীর প্রকৃত পরি পাইয়া তাঁহার পরিত্যক্ত চিরুণী এবং মাথার চুল মন্দিরে স্থাপন করিয়া নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করেন। সে-ই হইল দেবী পান্থোইবীর প্রথম পূজারী।

সার্থক নোংপোকনিংথৌ এবং পান্থোইবীর প্রেম। ধন্য পান্থোইবীর

পিতা-মাতা যাহাদের ঘরে পার্বতী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ধন্য খাব৷ যে অল্প দিনের জন্য হইলেও এই স্বর্গের দেবীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিল। মণিপুরে আজও এই নোংপোকনিংথৌ এবং পান্থোইবী হর-পার্বতীর অবতাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন; এবং এখনও লোকে তাঁহাদের বিরহ এবং মিলনসমন্বিত প্রেমের অমর কাহিনী লইয়া কবিতা ও নাটক রচনা করে।

নুমিৎ কাপ্পা (সূর্য শিকারী)

সৃষ্টির গোড়ার দিকে দেবতাদের জননী ৫টি সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম ২টি রোগে মারা যায় —তৃতীয়টি মারা যায় জেলেদের হাতে। বাকী রইলেন শুধু নংজেংবা (সূর্য) এবং তাহার অগ্রজ তাওহুইরেংবা (সূর্য)। ইহারা পালাক্রমে উদয়াস্ত হইয়া পৃথিবীতে আলোক দান করিতেছিলেন। তাহাদের অনুচর হাওডংলা ছিল অত্যন্ত ধূর্ত এবং পরশ্রীকাতর। তাহার মনের ভাবটা এই যে প্রভুরা যখন আকাশ ভ্রমণের মত সামান্য কাজটিও দুইজনে পালাক্রমে করেন, তখন সেই-বা কোন অপরাধে প্রভুদের জন্য সর্বক্ষণ একা খাটিয়া মরিবে। একবার মনিবদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার দুর্বুদ্ধি তাহার মাথায় চাপিয়া বসে, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রী হাউনো চংকান্থু-কে তাহার পিতার নিকট হইতে একটা বাঁশ চাহিয়া আনিতে বলে। হাওডংলা-গৃহিণী পিতার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া আপন খুড়ার নিকট হইতে বাঁশ নিয়া আসে। বাঁশটি পাইয়া সে মনের মত তীর-ধনুক তৈরী

করিতে লাগিয়া যায়। অস্ত্র নির্মাণ শেষ হইলে আসে অস্ত্র-পরীক্ষার পালা। সে তখন স্ত্রীকে একটা জলপূর্ণ মাটীর কলসী মাথায় করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইতে ব'ল। কলসীটি হইল তাহার তীরের লক্ষ্য। এই সব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া চংকানু-ত একেবারে অবাক। কিছু ভয়ে এবং কিছু কৌতূহলেও বটে সে স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কলসী মাথায় দাঁড়াইল। লক্ষ্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর মুখের উপর দিয়া জল গড়াইয়া বসন সিক্ত হইয়া গেল। হাওডংলার এইছেলেমানুষীতে সে-ত হাসিয়াই কুটি-পাটি। এরপর লক্ষ্য হইল কানের দুল; এবারেও তীরটি চংকানুর দুলে ফুলের মত মৃদু স্পর্শের দোলা দিয়া তাহার ধনুর্বিদ্যার দক্ষতা প্রমাণ করিল। সে এখন ইচ্ছা করিলে বড় বড় প্রাণী শিকার করিতে পারে।

একদিন একটা বন্য বরাহ এবং সাপের পশ্চাৎ ধাওয়া করিতে করিতে হাওডংলা তরুশ্রেণীর অন্তরালে দিগন্তরেখার সংলগ্ন উদীয়মান তাওছুইরেংবা'র (সূর্য) রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শুনিতে পাইল। সূর্যের স্বর্ণমুকুট হইতে চারিদিকে সোনালি কিরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনই হাওডংলার মাথায় পৃথিবীতে সূর্য শিকারী নামে খ্যাত হওয়ার নেশা চাপিয়া বসে বরাহ শিকারের কথা ভুলিয়া সে তখন তীর-ধনুক হাতে ওৎপাতিয়া বসিয়া রহিল। তাওছুইরেংবা'র রথ যখন মধ্যগগনে তখন হাওডংলার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া রথের ঘোড়াটিকে প্রচণ্ড আঘাতে আহত করিল। সঙ্গে সঙ্গে আরোহী সহ রথ কক্ষচ্যুত হইয়া মারিং জনপদের নিকট ছিটকাইয়া পড়ে। এই ঘটনার পর তাওছুইরেংবা কোথায় চলিয়া যায় কেহ তাহার সন্ধান পায় না।

নংজেংবা অগ্রজের এই পরিণতি দেখিয়া নুমিৎ কাপ্পার ভয়ে এক গুহায় আত্মগোপন করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের অবর্তমানে পৃথিবীতে অমাবস্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়া দিবা-রাত্রির ভেদ ঘুচাইয়া দিল। পথঘাট জনহীন। মানুষের দুর্দশার অন্ত নাই। বুঝি-বা সৃষ্টির অন্তিমকাল উপস্থিত। মাতা বসুন্ধরার বুক-ফাঁটা আর্তনাদ উপরে অনন্ত আকাশের গায়ে গিয়া ঠেকিল। দশ অবতার নোংপোক, চিংঘাই, ওয়াংপুরেল, খানাচাওবা, থাংজিং, সামপুরেল, লোইয়ারাকপা, কাওবারু, কাওরুরেল ও মারজিং অনেক চেষ্টা করিয়াও সূর্যদ্বয়ের কোন সন্ধান পাইলেন না।

এই অবস্থায় অনেকদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন দুইটি মেয়ে মশাল হাতে রাস্তায় চলিতে চলিতে দূরে এক গুহার মুখ হইতে উজ্জ্বল আলোর আভা বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ হইল, হয়ত সূর্য এখানে লুকাইয়া আছেন। এ বিষয়ে তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়া দশাবতার, স্বপ্নতাত্ত্বিক এবং ভবিষ্যদ্রষ্টা—লাইরেমা থোঙাক-কে (স্ত্রীলোক) আহ্বান করিয়া সূর্যকে প্রসন্ন করার ভার দেন। থোঙাক তখন যথাবিধি পূজা-আরাধনা দ্বারা নংজেংবা-কে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রার্থনা জানায়। সূর্যের ক্ষোভ তখনও দূর হয় নাই। নংজেংবা—থোঙাক-এর নিকট তাহার ভাইয়ের মৃত্যু, নুমিৎ কাপ্পার হাতে অগ্রজ তাওহুইরেংবা'র লাঞ্ছনা ইত্যাদি তাহাদের প্রতি অবিচারের সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যান। থোঙাক তখন দশাবতারের নিকট আসিয়া তাহার ব্যর্থতার সংবাদ দেন। দশাবতার

তখন নিরুপায় হইয়া স্বর্গের রাজকন্যা পান্থোইবীর নিকট তাহাদের দুরবস্থার কথা নিবেদন করিয়া বলেন—"হে মাতঃ জগৎ জননী! একমাত্র আপনিই সূর্যকে পুনরায় গগনে উদিত হওয়ার জন্য সম্মত করাইতে সমর্থ। আমরা প্রার্থনা করি - আপনি সূর্যকে পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়া সৃষ্টি রক্ষা করুন।"

পান্থোইবী তখন অবতারগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "হে দশাবতার! আপনারা স্বর্গ হইতে মর্ত্তে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি উঁচু মঞ্চ তৈরী করুন। নগরে নগরে ঘোষনা করিয়া দেশের সমস্ত নারী-সমাজকে আমার সঙ্গে সূর্য বন্দনায় যোগ দিতে আহ্বান করুন। ভোগের জন্য বেতের চুবড়িগুলিতে পাতা বিছাইয়া উত্তম অন্ন, প্রচুর ডিম, একটি মুরগী এবং পাতায় মোড়া আদার কুঁচি ও কালো কাপড়ে বাঁধা কড়ি ডুবান অনেকগুলি মদপূর্ণভাণ্ড উপস্থিত করুন।" আয়োজন শেষ হইলে সমবেত কণ্ঠে আরম্ভ হইল সূর্যদেবের বন্দনা। প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য গুহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন উঁচু মঞ্চটিতে আসন গ্রহণ করিলেন তখন তাহার সেই দীপ্তি আর নাই। নংজেংবার দীপ্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। পাখংবার পুরোহিত এবং মোইরাং-এর অধীশ্বর থাংজিং মন্দিরের পুরোহিত এই দুইজন মিলিয়া দুর্বাদল, মোইরাং নদীর ও নোংমাইজিং পাহাড়ের নির্ঝরিণীর পবিত্র জল, ডিম ও মুরগী দ্বারা সূর্যের অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। তীর্থবারি সিঞ্চনে সূর্য পুনরায় জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিলেন। দীর্ঘদিনের অন্ধকার অপগত হইয়া রৌদ্রদীপ্ত বসুন্ধরা পুনরায় মুখরিত হইয়া

উঠিল। দেশময় বহিল আনন্দের প্লাবন। অনেকদিন ধরিয়া চলিল নরনারীর সমবেত ঐক্যতান। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য আবার চালু হওয়ায় দেশের শ্রী ফিরিয়া আসিল।

মোইরাং কাহিনী

ভগবান থাংজিং বরাহ রূপে মর্তে অবতীর্ণ হইয়া মোইরাং সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কলির আরম্ভে ইওয়াং ফাং ফাং পংলেন হানবা'র রাজত্বকালে রাজ্যের আয়তন এবং শ্রী অনেক বৃদ্ধি হয়। প্রজারা নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বাচ্ছন্দ্যেব মধ্যে পরমপিতা থাংজিংকে একেবারে ভুলিয়া গেল। চারিদিকে শুধু রাজারই জয়গান। ভগবান থাংজিং মহা ভাবনায় পড়িলেন; মানুষের এতখানি অকৃতজ্ঞতা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। অবশেষে তিনি মর্তে তাণ্ডবলীলা চালাইবার জন্য সপ্ত দেবতা ইয়াং খোংলাইকে পাঠাইলেন। তখন হইতে মোইরাং বাসীর মনের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা একেবারে লোপ পাইল। রাত্রির অন্ধকারে কাহারা যেন গা ঢাকা দিয়া রাজ্যময় তোলপাড় করিয়া বেড়ায়। প্রথমে সবাই ভাবিল ইহা নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার কাণ্ড,—কিন্তু শেষে যখন শুনা গেল অপদেবতা নয়—স্বয়ং থাংজিং তাহাদের প্রতি অপ্রসন্ন, তখন দুর্ভাবনার আর অন্ত রহিল না। রাজার লোক মাইবি (স্ত্রী পুরোহিত) গাং থং মারিমাইলা চুহেংলাং-মেই থউবা-কে ক্ষেত হইতে ডাকিয়া আনিল।

রাজা তখন সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্না মাইবিকে বলিলেন—"মাতঃ! দেবতার কোপে আমার খুবাল লাইখোং প্রাসাদ

ধূলিসাৎ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিলে ঐস্থানে পুনরায় একটি প্রাসাদ গড়িয়া উঠিতে পারে। রাজ আজ্ঞা পাইয়া মাইবি সপ্ত দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে গভীর বনে চলিলেন। তাহার ভক্তি এবং সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তাহাকে মন্ত্রশক্তিতে রাজপুরী নির্মাণের কৌশল শিখাইয়া দিলেন। মাইবি তখন থুয়া লাইখোং-এ আসিয়া দৈব-বলে বিরাট গগনস্পর্শী 'শিল্প শোভার সার' এক প্রাসাদ রচনা করিলেন। যথাকালে রাজার কাছে এই খবর চলিয়া গেল। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজ্যের সমস্ত মাইবা (পুরুষ পুরোহিত) এবং মাইবিদিগকে ভগবান থাংজিং-এর মন্দিরে যাইতে নির্দেশ দেন। সেখানে যাইয়া তাহারা গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী লোককে ভাগ করিয়া রাজ্যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তন করার প্রত্যা-দেশ শুনিতে পান। দেবতার নির্দেশে মানুষকে বর্ণাশ্রম ধর্মের ছাঁচে ঢালাই করিয়া নূতন সমাজ গঠন করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতেই এক একজন করিয়া প্রধান নিযুক্ত হইলেন। প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে মাইবারা গাইবেন দেবতার স্তুতিগান আর সেই সময় তালে তালে মাইবিরা বাজাইবেন ঘণ্টা। এখনও মণিপুরে পুরোহিত যখন মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি দেয় তখন প্রাঙ্গনে মেয়েরাই কাঁসর ঘণ্টা বাজায়।

বৃদ্ধ রাজা ইওয়াং ফাং ফাং এর স্বর্গারোহণের পর তাহার পুত্র তেলহেইবা মোইরাং-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধনুর্বিদ্যায় তাহার ছিল অব্যর্থ লক্ষ্য। নাগা ও অন্যান্য বিদ্রোহীগণ তাহার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

মোইরাঙের রাজাদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে তাংখুল এবং

খুমালগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমে ধূমায়িত হইয়া উঠে। রাজা লাইফাংচেঙে'র রাজত্বকালে খুমালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সমস্ত আক্রোশের লক্ষ্য হইল কুচক্রী কনথৌনাম্বা সাফাবা। বিদ্রোহীরা তাহাকে একদিন বন্দী করিয়া অনেক দূরে গভীর অরণ্যে এক গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া আসে। তাহার কাতর প্রার্থনায় দেবতাদের হৃদয়ে করুণার উদয় হয়; তাঁহারা তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। মুক্তির পর কনথৌনাম্বা গৃহে ফিরিয়া আসে এবং কালক্রমে তাহার একটি পুত্র লাভ হয়। পুত্রের জন্মের কয়েক বৎসর পর সে মোইরাং ত্যাগ করিয়া মৈতাইদের দেশে চলিয়া যায়।

একদিন কনথৌনামবার সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখিয়া মোইরাঙের রাজার অত্যন্ত মায়া হইল। তিনি তাহাকে প্রাসাদে রাখিয়া নিজের ছেলের মত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ভগবান থাংজিং-এর আশীর্বাদে ছেলেটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার তেজবীর্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। রাজার শুভানুধ্যায়ীগণ ইহাতে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন—পাছে এই ছেলে একদিন রাজাকে সরাইয়া দিয়া নিজেই সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং তাহাদের পরামর্শে ছেলেটিকে ৭ বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। কোথা হইতেও কোন বাধা আসিল না। বুঝিবা বিষবৃক্ষের মূল অনায়াসেই উৎপাটিত হইল।

এদিকে দিন যায়, মাস যায়, বৎসরও যায়—বৃষ্টির নামগন্ধ নাই। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা নিরুপায়। প্রভু

থাংজিং কি আবার তাহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন। কেন এই দেবতার অভিশাপ? ছেলেটি কারাগার হইতে প্রভু থাংজিং-এর প্রত্যাদেশ রাজাকে জানাইল—"নিরপরাধের উপর রাজদণ্ডের অপব্যবহারে ভগবান ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।"

রাজা তখনই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশময় শান্তিবারির মত বৃষ্টির ধারা নামিয়া আসিল। কিন্তু মোইরাঙের প্রভু তখনও অপ্রসন্ন। রাজ্যে দেখা দিল মহামারি; গ্রাম নগর উজাড় হইয়া যাইতে লাগিল। রাজা ছেলেটির নিকট তাহার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন—তাহার মৃত্যুর পর সাত বৎসরের জন্য সে-ই মোইরাঙের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবে। এইরূপ শপথ বাক্য শুনিয়া ছেলেটি পরমপিতা থাংজিং-এর নিকট রাজ্যের মঙ্গল ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রার্থনা করে। এইবার ভগবান প্রসন্ন হইলেন। রাজ্যে শ্রী ফিরিয়া আসিল। যথাকালে ছেলেটি মোইরাঙের সিংহাসনের অধিকারী হইল। তাহার রাজত্বে প্রভু থাংজিং-এর কৃপায় প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল।

ইহার পর প্রজানুরঞ্জক রাজা থাঙ্গাইপেন থাবার রাজত্ব কালে শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য থাঙ্গা পাহাড়গুলি ভাঙ্গিয়া প্রয়োজন মত খাল নালা ইত্যাদি খনন করা হয়। তিনি ছিলেন দুর্জনের হন্তা এবং দুর্বলের রক্ষক। দেশ-দেশান্তরে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। একদিন খুমাল রাজ্য হইতে দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার নিকট খুমাল রাজার অত্যাচারের কথা জানাইলে তিনি অত্যন্ত

বিচলিত হইয়া পড়েন। একদিন শিকার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে খুমাল রাজার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ামাত্র তাহার সেই সব অত্যাচারের কাহিনী মনে পড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। খুমালের প্রজারা এই আকস্মিক দুঃসংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু তখন তাহারা নিরুপায়—প্রতিশোধ নেওয়াব ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মোইরাং রাজের এই আচরণ পুরুষপরম্পরাক্রমেও তাহাদের স্মৃতি হইতে মুছিয়া গেল না। পরবর্তীকালে একদিন দেখা গেল খুমাল হইতে এক বিরাট নৌ-বাহিনী মোইবাংএ প্রবেশ করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে মোইরাঙের শক্তিশালী সেনা এই আক্রমণ শুধু প্রতিহত করে নাই—শত্রুর দেশে অভিযান চালাইয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিল।

থাঙ্গা ইপেন থাবার পরবর্তী রাজা হইলেন চিংখু তেল হৈইবা। ইহার প্রাণরক্ষক পুরেনবার পুত্রই হইতেছেন খাম্বা। এই খাম্বা এবং তাহার প্রণয়ী থোইবী'র কাহিনী মণিপুরে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়।

খাম্বা ও থোইবী

খুমালরাজ হারামহলের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহার ভাই হোরামইয়েমা খুমাল ত্যাগ করিয়া মোইরাংএ আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর পুত্রের নাম পারেন-কইবা। পারেন-কইবার পুত্র পুরেনবার সাহস ও শক্তি ছিল অসীম। একদিন মোইরাঙের রাজা চিংখু তেল হৈইবা বনে শিকার

করিতে যাইয়া পাঁচটা বাঘের দ্বারা যুগপৎ আক্রান্ত হন। সঙ্গীদের মধ্যে পুরেনবা ছাড়া আর সবাই ভয়ে পিঠটান দেয়। সেদিন পুরেনবা না থাকিলে রাজাকে এই বিপদ হইতে বাঁচায় কার সাধ্য! তীক্ষ্ণ বর্ষার আঘাতে সবকয়টা বাঘ মারিয়া তিনি রাজাকে রক্ষা করিলেন।

রাজা চিংথু তেল হেইবা ছিলেন নিঃসন্তান। নিজের কন্যা থাকিলে পুরেনবার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষককে পুরস্কৃত করিতেন। অন্য কোন উত্তম উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া পাটরাণীকেই পুরেনবার হস্তে সমর্পণ করেন।

যথাসময়ে পুরেনবার একটি মেয়ে থামন্থু এবং পরে একটি রাজপুত্রের মত অতি সুন্দর ছেলে থাম্বা জন্মিল। কিন্তু এত সুখ তাহার ভাগ্যে বেশী দিন লেখা ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নাবালক পুত্রকন্যাদিগকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার পত্নীও তাহার সঙ্গে সহমৃতা হইয়া সতী হন।

এখন সংসার চালানোর সম্পূর্ণ ভার পড়িল দিদি থামন্থুর উপর। থাম্বাকে বাড়ীতে রাখিয়া সে যায় দূরে লোকের বাড়িতে ধান ভানিতে অথবা বাজারে সওদা করিতে। রাজা চিংথু তেল হেইবার ছোট ভাই যুবরাজ, চিংথু আখুবার খোইবী নামে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। নিঃসন্তান রাজা তাহাকে আপন মেয়ের মত স্নেহ করিতেন। একদিন মোইরাঙের বাজারে থামন্থুর সঙ্গে খোইবীর পরিচয় হয়। তাহারা প্রায় সমবয়সী। পিতৃমাতৃহীন এই মেয়ে এবং তাহার ভাইয়ের পরিচয় পাইয়া খোইবীর হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া

গেল। তিনি বাজার হইতে অনেক জিনিষপত্র কিনিয়া খামন্থকে উপহার দিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইলেন। কয়েকদিন পর আবার তাহাদের দেখা হয়; এবার থোইবী খামন্থকে তাহার সঙ্গে লোকতাক হ্রদে মাছ শিকারে যাইতে অনুরোধ করেন। রাজ-কন্যার মাছ শিকারের অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া রাজা ঘোষণা করিলেন সেদিন যেন কোন পুরুষ হ্রদে না যায়। নির্দিষ্ট দিনে খামন্থ ভাইটিকে বাড়ীতে রাখিয়া হ্রদে চলিয়া গেলেন। এদিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাম্বার দুই চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন প্রভু থাংজিং তাহাকে লোকতাকে যাওয়ার জন্য প্রত্যাদেশ করিতেছেন। স্বপ্ন দেখার পরই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় আর অমনি তিনি লোকতাকের দিকে চলিয়া যান। তীরে একটি নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকা খুলিয়া দিয়া তিনি বাহিয়া চলিলেন। এমন সময় কোথা হইতে ঝড় আসিয়া নৌকাটিকে মাঝ হ্রদে একটা দ্বীপে নিয়া ঠেকাইল। খামন্থ আর থোইবী সেখানে মাছ ধরিতেছিলেন। কে এই অলোকসুন্দর যুবক আর কে এই অলোকসামান্যা কুমারী—নায়ক নায়িকার অন্তরে যুগপৎ এই একই প্রশ্ন। প্রথম দর্শনেই একে অন্যের হৃদয় কাড়িয়া লইল। রাজকন্যা খামন্থর কাছে যখন জানিতে পারিলেন যে ইনি তাহার ভাই খাম্বা, তখন ভয়ে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া খাম্বা এখানে আসিয়াছে এই সংবাদ রাজার কানে গেলে সমূহ বিপদ হইতে পারে। থোইবী তাহাকে অবিলম্বে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। খাম্বা ঘরে পৌঁছার

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজকন্যা আর খাম্বু আসিয়া হাজির। থোইবীর কাছে খাম্বার বাড়ীঘর রাজপ্রসাদের চেয়েও প্রিয় মনে হইল। তিনি গৃহ দেবতার মন্দিরে গিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভু খুমাল লাকৃপা! আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, আমি এই বাড়ীতে থাকিয়া আজীবন তোমার সেবা করিব।"

মেয়েটির এই পাগলামি দেখিয়া খাম্বু-ত হাসিয়াই অস্থির। রাজকন্যা কিন্তু তাহার সঙ্কল্পে দৃঢ়। সোনার চুড়ি জলে ডুবাইয়া শপথ করিলেন এ-জীবনে একমাত্র খাম্বাকেই ভালবসিবেন।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাম্বাও স্বর্গগত পিতার ন্যায় অমিত-শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। 'লামচেল' দৌড় এবং কুস্তি প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাজিত করিয়া তিনি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন, কিন্তু এই শক্তি এবং থোইবীর প্রতি অনুরাগই তাহার বিপদ ডাকিয়া আনিল। রাজার অন্যতম শ্রেষ্ঠবীর কোংয়াম্বার-ত তিনি দুই চক্ষের বিষ। থোইবীকে সে-ও চায়—অথচ তাহাকে পাওয়ার প্রধান অন্তরায় খাম্বা। কি করিয়া খাম্বাকে অপসারিত করা যায় এই তাহার চিন্তা।

একদিন কোংয়াম্বা খুমালের মেয়েদের কাছে শুনিতে পাইল একটা বন্য ষাঁড় ইকোপ এবং ওয়াইথৌ হ্রদের মাঝে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথায় একটা ফন্দি খেলিয়া গেল। সোজা রাজার কাছে গিয়া সে জানাইল—"মহারাজ! প্রভু থাংজিং স্বপ্নে আমাকে জানাইয়াছেন—ইকোপ এবং ওয়াইথৌ হ্রদের মাঝে যে বন্য ষাঁড়টি আসিয়াছে তাহার সুস্বাদু-মাংসের ভোগ

পাইলে তিনি অতিশয় তৃপ্ত হইবেন।" এই সঙ্গে সে আরও একটু মিথ্যা যোগ করিয়া বলিল – "খাম্বা ত এই কথা শুনিয়া এই মুহূর্তে ষাঁড়টিকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে যাইতে চায়।" তাহার ইচ্ছা রাজা খাম্বাকে এখন আদেশ করুন, আর খাম্বা অনন্যোপায় হইয়া বন্য ষাঁড়ের দ্বারা নিহত হইলে প্রধান শত্রু নিপাত হয়। কোং-য়াম্বার কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ খাম্বাকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার কথা শুনামাত্রই তিনি কোংয়াম্বার চালাকি টের পাইয়া গেলেন। কিন্তু বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া বীরের ধর্ম নয়। তিনি রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া নির্দিষ্ট দিনে ষাঁড়টিকে ধরিয়া আনিতে চলিলেন। যাওয়ার সময় খামনু তাহাকে বলিল "এই ষাঁড়টি এক সময় আমাদের পিতার গোশালায় ছিল। তুমি উহার নিকট কানে কানে আমাদের পিতার নাম উচ্চারণ করিয়া এই রেশমের রজ্জুটি দেখাইও। তাহা হইলেই সে তোমাকে চিনিতে পারিয়া বসে আসিবে।" হইল-ও তাহাই। খাম্বা ষাঁড়টির পিঠে চড়িয়া সকলের সম্মুখে বন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক পুরস্কৃত করিলেন, এবং থোইবীকে-ও তাহার নিকট সমর্পণ করার ইচ্ছা জানাইলেন। কোংয়াম্বার মুখ-ত একেবারে চুন।

নির্দিষ্ট দিনে ষাঁড়টিকে বলি দিয়া থাংজিং-এর মন্দিরে ভোগ দেওয়ার পর যুবরাজ (রাজভ্রাতা) মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া তীর ছুঁড়িতেছিলেন এবং খাম্বা আর কোয়াংম্বা সেই তীর কুড়াইয়া আনিতেছিল। হঠাৎ যুবরাজের দৃষ্টি পড়িল খাম্বার গায়ের জামার

দিকে। জামাটি যে তাহারই ; খাম্বা নিশ্চয় ইহা চুরি করিয়াছে—এই ভাবিয়া তাহার প্রতি যুবরাজের মন ঘৃণায় ভরিয়া গেল। তাহার মেয়ে থোইবী যে তাহাকে না জানাইয়া খাম্বাকে জামাটি উপহার দিয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন না। যুবরাজের এই ভাবান্তর কোংয়াম্বার দৃষ্টি এড়াইল না। সে সুযোগ পাইয়া নানাভাবে যুবরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া যুবরাজ প্রতিজ্ঞা করিলেন—কোংয়াম্বার হস্তেই তিনি তাহার মেয়েকে সমর্পণ করিবেন। খাম্বার পিতৃবন্ধু নোংথোনবা এই কথা শুনিয়া যুবরাজকে রাজার সঙ্কল্পের কথা মনে করাইয়া দেন। কিন্তু বৃথ চেষ্টা। তাহার মত পরিবর্তন করে এমন সাধ্য কাহার আছে? থোইবীকে কোংয়াম্বার সঙ্গে বিবাহ দেওয়াই স্থির।

থোইবীর'ত ইহা শুনিয়া অকূল সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার অবস্থা। কিভাবে পিতার মত পরিবর্তন করা যায় ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। একদিন খাম্বার নিকট হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট সুস্বাদু ফল আনিয়া রাখিয়া দিলেন। যুবরাজ মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহাকে সেইগুলি খাইতে দিলেন। তিনি ফলগুলি খাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া কোথা হইতে এগুলি আনা হইয়াছে—তাহা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন। থোইবী যেন পিতার প্রতিজ্ঞার কথা কিছুই শুনেন নাই এইরূপ ভাব করিয়া বলিলেন, "ফলগুলি আপনার ভাবি জামাতা খাম্বা আপনাকে উপহার পাঠাইয়াছেন।" কথা শুনিবামাত্র তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। হাতের

কাছে হুঁকাটা ছিল—তাহাই ছুঁড়িয়া মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই থোইবী অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। যুবরাজ অল্পক্ষণের মধ্যে নিজেকে সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এখন কি উপায়? কিছুতেই থোইবীর চেতনা ফিরিয়া আসে না। অবশেষে মেয়ের নিকট নিজেই গিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ওঠ মা, তোমাকে খাম্বার হস্তেই সমর্পণ করিব।" খাম্বার নাম উচ্চারণে থোইবীর সম্বিত ফিরিয়া আসিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর কোংয়াম্বার লোকেরা খাম্বাকে একা পাইয়া খুব মার দেয়; তাহার পর যুবরাজের নির্দেশে তাহাকে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় হাতির পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া হাতিকে তাড়া দেয়। এইরূপ নৃশংস অত্যাচারের ফলে খাম্বা অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সে মরিয়া গিয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া লোকে তাহাকে গভীর জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া আসিল। এদিকে পাম্থোইবী স্বপ্নে থোইবীকে খাম্বার নির্যাতন এবং আধমরা অবস্থায় জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়ার কথা সমস্তই সবিস্তারে বলিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থোইবী একটা ছুরি হস্তে পাগলের ন্যায় সেই জঙ্গলের দিকে ছুটিলেন। সেখানে খাম্বার বন্ধন মুক্ত করিয়া শুশ্রূষা দ্বারা তাহার চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন।

খাম্বার উপর এই অত্যাচারের সংবাদে তাহার হিতৈষী নোংথোনবা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন। বিচারে যুবরাজের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কিন্তু তাহার স্বভাব ইহাতে সংশোধন হওয়া দূরে থাক,—তাহার জেদ আরও বাড়িয়াই .গল। মুক্তি পাইয়াই তিনি থোইবীকে নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। বিদায়ের পূর্বে থোইবী খাম্বার সঙ্গে দেখা করিয়া অনেক মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন—"প্রিয়তম! আমাকে ভুলিয়া যাইওনা; আমার মন বলিতেছে, আমাদের প্রেমের এই শেষ অগ্নিপরীক্ষা—ইহার পর আমাদের মিলন হইবেই।"

রাজ্যময় কান্নার রোল উঠিল। সোনার প্রতিমাসদৃশ রাজ-নন্দিনী ভিখারিনীর বেশে রাজপুরি ছাড়িয়া চলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছায় বাধা দেয় কাহার এমন সাহস। নির্বাসিতা রাজকন্যা তাহার সঙ্গীর সঙ্গে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গ্রাম নগর অতি-ক্রম করিয়া চলিলেন। ক্রমে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব তারপর পরিচিত অর্ধ-পরিচিতদের মুখও পশ্চাতে মিলাইয়া গেল। চলিতে চলিতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অবসন্ন দেহে একটা গাছের নীচে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাম্বা সেখানে আসিয়া উপস্থিত; গভীর দুঃখের মধ্যেও ক্ষণিক মিলনের আবেগে প্রেমিক যুগলের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। চারিটি নয়নে বহিল অশ্রুর বন্যা। এই হয়ত শেষ দেখা। পাহাড়ে চলার সুবিধার জন্য খাম্বা তাহার হাতের যষ্ঠিটি তাহাকে দিলেন। থোইবী সেটি না নিয়া সেইখানেই পুতিয়া রাখিয়া বলিলেন —"যদি আমাদের ভালবাসা নির্মল এবং অটুট থাকে তবে এই শুষ্ক যষ্ঠিটি একদিন পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিবে।"

যুবরাজের অনুচর রাজকন্যাকে কাবোতে নিয়া তুমুরাকপার নিকট বিক্রী করিলেন। দিনের বেলায় বনে কাঠ কুড়াইয়া এবং বাজারে মাছ বিক্রী করিয়া তাহার সময় কাটিয়া যায়। রাত্রি হইলেই পুরাতন স্মৃতি আসিয়া দুঃখের বোঝাকে আরও ভারি করিয়া তোলে। পিতার কথা, স্নেহময়ী জননীর কথা এবং সর্বোপরি খাম্বার প্রতিটি কথা ও আচরণ তাহার মনে জাগিয়া তাহাকে পাগলের মত করিয়া তোলে। চক্ষু নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছে। কত অশ্রুই বা সেখানে জমা ছিল। এত বর্ষণ—কিন্তু তবুত হৃদয়ের ভার লাঘব হয় না।

পিতার মন সন্তানের কষ্টের কথা কল্পনা করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই নরম হইয়া গেল। তিনি তাহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য লোক পাঠাইলেন। কোংয়াম্বা সবার আগে তাহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া আগমন পথের অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। থোইবীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রে আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। থোইবী দেখিলেন তাহার নিকট হইতে ঘোড়াটি আদায় করার এই সুযোগ। নরম নরম কথায় তাহাকে ভুলাইয়া ফেলিলেন। তাহাকে দিয়া রাজকুমারী এখন যাহা খুশি করাইতে পারেন। ঘোড়াটি চাহিবামাত্র সে দিয়া দিল। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া প্রথমেই সটান চলিয়া আসিলেন তাহার প্রিয়তম খাম্বার সঙ্গে দেখা করতে। কোংয়াম্বা হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া রহিল।

পরদিন এক বৃদ্ধ আসিয়া রাজার নিকট খবর দিল তাহার

বাড়ীর নিকট একটা বাঘ আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রাজা ঘোষণা করিলেন যে, যে এই বাঘটিকে শিকার করিতে পারিবে তিনি নিজে তাহার হস্তে থোইবীকে সমর্পণ করিবেন।

খাম্বা আর কোংয়াম্বা দুইজনই প্রস্তুত। একসঙ্গে উভয়েই বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন। দুইটি তীর-ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বাঘটি কোংযাম্বার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার দেহ টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাঘটি যখন কোংয়াম্বাকে নিয়া ব্যস্ত সেই সুযোগে খাম্বা আর-ও একটি তীর ছুঁড়িল। এইবার বাঘ কাবু হইয়া গভীর জঙ্গলে পলায়নের চেষ্টা করিল। খাম্বা-ও নাছোড়বান্দা। ইহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছুঁড়িলেন আরও একটি তীর, এইবার সত্যই বাঘটি মারা পড়িল। তখন তিনি বাঘটিকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি লবণ কূপসহ অনেক মহার্ঘ্য দ্রব্য উপহার দিলেন। খাম্বার দারিদ্র্য ঘুচিয়া গেল। ভগ্নী খামনুকে তিনি যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিলেন।

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই জাকজমকের সহিত খাম্বা ও থোইবীর বিবাহ হইয়া গেল। থোইবী পতিগৃহে চলিয়া গেলেন। স্বামী স্ত্রী পরম সুখে দাম্পত্যজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই সুখের নীড় বেশীদিন টিকিল না। কোথা হইতে সংশয়ের কালো মেঘ খাম্বার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগিল। তিনি একদিন থোইবীর চরিত্রের নির্মলতা পরীক্ষা করার জন্য তাহাকে না জানাইয়া গভীর রাত্রে বাহির হইতে

থোইবীর দেওয়ালের ফাঁক দিয়া একটা লাঠি ঢুকাইয়া দিলেন। থোইবীর ইচ্ছা থাকিলেই এই ইঙ্গিতেই সাড়া দিয়া পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিজের বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু সে ধাতের মেয়ে তিনি নন। তাহার প্রেমপদ্ম একমাত্র খাম্বার উদ্দেশ্যেই বিকশিত হইয়াছে। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি খাম্বার বর্ষাটি পাড়িয়া লইয়া দেওয়ালের ফাঁক দিয়া দুর্বৃত্তের বুকে বসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আর্ত্তকণ্ঠে "থোইবী থোইবী" বলিয়া চীৎকার উঠিল। প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর চিনিতে দেরী হইল না।

পাগলের মত বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখেন খাম্বার প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। অবিলম্বে তিনি প্রিয়তমের বুক হইতে বর্ষাটি টানিয়া খুলিয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিলেন। সব দুঃখ এবং জ্বালার অবসান হইয়া গেল।

খাম্বা ও থোইবী হইতেছেন কল্যাণের দূত—সাধারণ সুখসম্ভোগ ইহাদের জন্য নয়। জগতে প্রেমের মহান আদর্শ প্রচারের জন্যই স্বর্গ হইতে মর্তে ইহারা নরদেহ ধারণ করিয়া জন্ম লইয়া ছিলেন।

খাম্বা ও থোইবীর এই কাহিনী আজ শুধু মোইরাঙে সীমাবদ্ধ নয়,—সমস্ত মণিপুর তাহাদের নামে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। পুরুষপরম্পরাক্রমে এমন সর্বজনপ্রিয় কাহিনী মণিপুরে আর অধিক নাই।

মোইরাঙের কাহিনীর উপসংহার—

রাজা চিংখু তেলহেইবার মৃত্যুর পর মোইরাঙের ঘটনাবলীর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইস্কালে মৈতাই গোষ্ঠির প্রাধান্যই ইহার

মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় মৈতাই রাজা ইম্ফালের নিকট মোইরাংখোম নামক স্থানে এক লড়াইয়ে মোইরাঙের রাজাকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। আজ-ও লোকে সেখানে একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে যে, এইস্থানে যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের মস্তক প্রোথিত করা হইয়াছিল। মণিপুরের বিখ্যাত মহারাজা চন্দ্রকীর্তি (১৮৫০-৮৬ খৃষ্টাব্দ) মোইরাঙের এক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর ২৭ বৎসর পর্যন্ত সেই শূন্য সিংহাসনে আর কেহ বসে নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট রামানন্দ সিংহকে মোইরাঙের নিংথৌ অর্থাৎ সর্দার রূপে নিযুক্ত করেন।

মোইরাঙের রাজনৈতিক মর্যাদা আজ লুপ্ত হইলেও মণিপুরের সভ্যতায় ইম্ফালে-যুগের পূর্বে মোইরাং-যুগের দান নগণ্য নহে। মণিপুরবাসী আজ বৈষ্ণব হইলেও মোইরাং-যুগের আদর্শ এবং ধর্ম এখনও সজীব আছে। লোকতাক হ্রদের তীরে প্রভু থাংজিং-এর মন্দিরে পূজারীর ভিড় একটুও কমে নাই। খাম্বা ও থোইবীর কাহিনী মণিপুরের অমর-গাথা।

(চার)

অষ্টম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী

মণিপুরের ইতিহাসে অষ্টম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই এক হাজার বৎসরের যথাযথ হিসাব নিকাশ এখনও হয় নাই। তাই বলিয়া তাহা আদৌ সম্ভব নয় একথা বলা যায় না। ভারতের ইতিহাসে উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে যত উপাদান আছে এবং সে সমস্ত নিয়া যত গবেষণা হইয়াছে আর কোন অঞ্চলের তত উপাদান-ও পাওয়া যায় নাই এবং সে সম্বন্ধে তত গবেষণাও হয় নাই। তথাপি কুষাণদের পতন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হইতে হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব পর্যন্ত যথাক্রমে খৃষ্টিয় ৩য় এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য বিবরণ আজ পর্যন্তও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। কামরূপের ইতিহাসেও দেখা যায় ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর হইতে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে অহোমদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পৌনে ছয় শত বৎসরের কোন হিসাব নাই। বাংলা অথবা উড়িষ্যার ইতিহাসের খসড়াও তৈরী করা হইয়াছে সবে সেদিন। নানা ত্রুটী এবং অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দিক হইতে ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ বহু কর্মীর কঠোর সাধনা এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ আমরা ভারতীয় সভ্যতায় আর্য এবং দ্রাবিড়দের দান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু

পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ভারতীয় সভ্যতায় মোঙ্গলদের দান সম্পর্কে আমরা এখন-ও অন্ধকারেই আছি। একরূপ বলিতে গেলে ঐতিহাসিকদের নিকট পূর্ব ভারত এতকাল পর্যন্ত ছিল কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলার মত। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিকের দ্বারা পথপ্রদর্শনের পর ভারতীয়দের মধ্যে-ও কেহ কেহ আসামের ইতিহাস রচনার কাজে ব্রতী হইয়াছেন। তাহাদেন চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরের ইতিহাসের এই হাজার বৎসরের বিস্মৃত বা অর্ধবিস্মৃত অধ্যায় সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে আপাততঃ তাহা লইয়াই খসড়া তৈরীর কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। কোন দেশেই একবারের চেষ্টায় নির্ভর-যোগ্য ইতিহাস রচিত হয় নাই। ক্রমশ নূতন নূতন তথ্যের সন্ধানের ফলে ভ্রম সংশোধন, শূন্যস্থান পূরণ এবং ঘটনাবলির উপর নূতন আলোকসম্পাত হইতে থাকে। মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মণিপুরে প্রচলিত কিছু কিছু মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটিকে পাখাংবার সময়ে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া ধরা হয়। পাখাংবা হইতে পামহেইবা'র রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত (১৭১৪ খৃষ্টাব্দ) প্রচলিত মুদ্রাগুলির মধ্যে পাঁচ পদ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মুদ্রাগুলি যথাক্রমে পাখাংবা, মরানবা (Maranba, 1256 A. D.) খাগেম্বা (Khagemba), পাই-

খোম্বা (Paikomba, 1666 A. D.), চরাইরোংবা (Charai-rongba, 1697 A. D.) কর্তৃক প্রচলিত বলিয়া কথিত। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে মণিপুরের রাজা কর্তৃক পরাজিত চীনাবাহিনীর যেখানে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেই কামেং (Kameng) অঞ্চল খননের ফলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যান্যস্থান-ও খনন করিয়া প্রস্তরমূর্তি, শিলালিপি এবং তাম্রশাসন সহ ২০টি ঐতিহাসিক যুগের উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপিগুলির মধ্যে একটি রাজা খাগেম্বা এবং অপরটি রাজা চরাইরোংবা (১৬৯৭, খৃঃ অব্দ) কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। তাম্র শাসনগুলি অধিকাংশই ভূদান সম্পর্কিত। রাজা খোংতেক্‌চা'র (Khongtekcha) তাম্রশাসন-টিই প্রাচীনতম। অনুমান ৮৪৯ খৃঃ অব্দে মতান্তরে সপ্তম শতাব্দীতে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা সমসাময়িক যুগের ধর্ম-বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাই। এইরূপ খননের ফলে মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা ঐ যুগের ইতিহাস রচনার প্রামাণ্য উপাদান। হস্ত-লিখিত পুরাতন গ্রন্থগুলি-ও এ বিষয়ে অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

মণিপুরের রাষ্ট্র এবং সমাজ গঠনে যে কয়টি সম্প্রদায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে খুমাল, লুয়াং, মোইরাং এবং মৈতাই প্রধান। মোইরাং-এর গৌরবরবি অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর সম্প্রদায়ের উপর মৈতাইদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে সম্প্রদায়গুলি বৃহৎ মৈতাই পরিবারে নিজেদের

স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া সকলেই একবাক্যে মৈতাই-কুলাভিজাত্যের অংশিদার হিসাবে নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে এই বৃহৎ মৈতাই পরিবারের ইতিহাসই মণিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে মৈতাই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিবরণ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং ইতিহাস পদবাচ্য নহে। এই সময়ের মধ্যে দশজন রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহারাও নির্দিষ্ট স্থান কালের হিসাব বহির্ভূত। একরূপ বলিতে গেলে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি উপকথার নায়ক মাত্র।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গরীব নেওয়াজ-এর সিংহাসন আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত (১৭১৪ খৃঃ অব্দ) মণিপুরের ইতিহাসে ৩৬ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই একহাজার বৎসরের মধ্যে ইহাদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ২৮ বৎসর করিয়া ধরা যায়। একজন রাজার ২৮ বৎসর রাজত্বকাল খুব বেশীও নয় এবং খুব কমও নয়। এইরূপ হিসাবের দ্বারা উক্ত এক হাজার বৎসরের একটা মোটামোটি সন্তোষজনক হিসাব তৈরী করা যায়।

আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজা কন্থোবা (Konthouba) মণিপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজত্বের প্রথম পাঁচ বৎসর নানা অশান্তি এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে কাটে। এই সময় পোইরৈতোন (Poireiton) নামে একজন মহাপুরুষ উত্তর পশ্চিম দিক হইতে মণিপুরে প্রবেশ করেন। মণিপুর পুরাণে এইরূপ আরও একজন পোইরৈতোন এবং তাহার অনুচরবৃন্দের আগমনের

কথা উল্লেখ আছে। কথিত আছে এই অর্ধ জলমগ্ন দেশে এই পোইরৈতোন-ই প্রথম আগুন আমদানি করেন। কালক্রমে পোইরৈতোনের অনুচরগণ অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়া যায়; এবং তাঁহাদের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা-ও স্তিমিত হইয়া আসে। বহুদিন পর দ্বিতীয় পোইরৈতোন আসিয়া নংমাইজীং (Nongmaijing) পাহাড়ের পশ্চাতে ইম্ফাল হইতে ৮ মাইল দূরে আন্দ্রো (Andro) নামক স্থানে সেই পুরাতন যজ্ঞানল পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন। ক্রমে তাহার মনে যজ্ঞশক্তিদ্বারা কংলার (Kangla) রাজসিংহাসন হস্তগত করার বাসনা উদগ্র হইয়া উঠিল। তিনি যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করার পূর্বেই কংলা'র দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু দৈব প্রতিবন্ধকহেতু তাহাকে নিরস্ত হইতে হইল। এরপর হইতে কংলার অপর নাম হইল ইন্থাফল (Inthafal)। সম্ভবতঃ এই পোইরৈতোন শব্দ পুরোহিত শব্দের বিকৃত রূপ। মণিপুর পুরাণে গুরু এবং 'পোইরৈতোন'এর আবির্ভাব সম্পর্কে একাধিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। হিন্দু পুরাণে দেখা যায় বিন্ধ্যপর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া আর্য সভ্যতার দূত অগস্ত্যমুনি দ্রাবিড় সন্তানদিগের নিকট বেদের অপৌরুষেয় বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে বেদ-মন্ত্রপূত-হোমশিখা ঊর্ধ্ব-আকাশের দিকে ধাবিত হইয়া সমগ্র দ্রাবিড় গগন ছাইয়া ফেলিল। সেইরূপ নদনদী গিরি-উপত্যকা অতিক্রম করিয়া এই দুর্গম পূর্বাচলে-ও প্রাচীনকাল হইতে প্রচারকগণ কর্তৃক বৈদিক ধর্ম, ক্রিয়াকলাপ এবং সভ্যতা প্রসারের

চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। বিভিন্ন সময়ে আগত 'পোইরৈতোন' এবং তাহাদের অনুচরদিগকে অগস্ত্যমুনির সমগোত্রীয় বলিয়াই মনে হয়।

কম্বোবা'র পর ৭৫০ খৃষ্টাব্দে নাওথিংখোং (Naothing-Khong) মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অঙোম (Angom) নামক নাগা জাতির একটি শাখার বিরুদ্ধে অভিযানই তাহার রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মণিপুরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের যতটুকু আমরা খবর রাখি তাহাতে দেখা যায়, যে সময়ে সময়ে বহু নাগা ব্যক্তিগতভাবে মণিপুরী ধর্ম এবং সভ্যতা গ্রহণ করিয়া মণিপুরী সমাজভুক্ত হইলেও সম্প্রদায়গতভাবে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই চলিয়া আসিতেছে। নাগারা কোন সময়েই স্বেচ্ছায় মণিপুরী-রাজার প্রভুত্ব মানিয়া লয় নাই। ফলে দেখা যায় সু-প্রাচীন যুগ হইতে অতি আধুনিক-কাল পর্যন্ত নাগা বিদ্রোহ মণিপুর ইতিহাসের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। নাওথিংখোং (Naothing Khong) এর সময় তাহার এক প্রধান অনুচর ইম্ফাল নদীর অপর পার হইতে কোন অঙোমে'র নিক্ষিপ্ত তীরের দ্বারা আহত হইয়া রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। সেকালে ব্যক্তিবিশেষের অপরাধের জন্য তাহার সমগ্র সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করার প্রথা ছিল। রাজা অঙোমদের এইরূপ ঔদ্ধত্যের জন্য তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রণনিপুণ মণিপুরীদের হস্তে অঙোমদের (Angom) শোচনীয় পরাজয় ঘটিল।

যুদ্ধে বহু অঙোম নিহত হয়। অনেকে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। কিন্তু তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচাব করিলে দেখা যাইবে ইহাতে আশ্চর্যেব কিছুই ছিল না। রাজদ্রোহ এখনকার মতই তখনও অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তখনকার দিনে নাগা বা মণিপুরির নিকট জীবনের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য ছিল ঢের বেশী। পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যুই ছিল কাম্য।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে পোং (Pong) রাজার * এক ভাই সামলঙ্গফা (Samlongpha) কাছাড় এবং ত্রিপুরা অভিযান সমাপ্ত কবিয়া লোকতাক হ্রদের পশ্চিম তীরে উপস্থিত হন। তিনি মোইরাং-এর সমস্ত লোককে স্থানীয় দেবতাদের যথাবিধি বাৎসরিক পূজা দিতে আদেশ করেন। মোইরাং হইতে তিনি মৈতাইদের দেশে প্রবেশ করেন। সেখানে কাহারও উপর কোনরূপ কর ধার্য না করিয়া, মৈতাইদিগকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং পান চিবানর অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন (Ref. Assam District Gazetters Vol. IX, B. C. Allen) ক্যাপ্টেন পেম্বারটনের (Capt. Pemberton) হিসাবমত সামলুঙ্গফার (Samlungpha) এই অভিযান হইয়াছিল খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। শান (Shan) রাজবংশের বিভিন্ন বিবরণে আছে মুঙ্গমান-এর (Mungman) রাজা †

* পোং (Pong)—(†) মুঙ্গমান (Mungman)— উত্তর ব্রহ্মে এবং চীনের ইউন্নান প্রদেশের পশ্চিম দিকে শান (Shan) জাতীয় লোকেরা

১২২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার ভাই সামলুঙ্গফা (Samlungpha) আরাকান, উত্তর আসাম, মণিপুর এবং এই অঞ্চলের সন্নিহিত অন্যান্য দেশের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। (Ref. History of the Shans— Ney Elias, History of Assam-Sir Edward Gait) এই শান অভিযানের তারিখ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ হইলেও অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহাই প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ব্রহ্মদেশের পোং (Pong) এবং আভা'র (Ava) অধিপতিগণ বহুবার মণিপুরের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত আক্রমণ হইয়াছিল তাহাদের সমস্ত বিবরণ এখনও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শান এবং আভা'র রাজবংশের বিবরণ, স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থ এবং সামাজিক অনেক রীতিনীতি হইতে মণিপুরে ব্রহ্মদেশের রাজাদের অভিযান সম্পর্কে যথাযথ ইতিবৃত্ত না পাইলেও অনেক আভাস পাওয়া যায়। কিছুদিন পর পর এইরূপ অনার্য আক্রমণের ফলে মণিপুরে আর্যিকরণের কাজ অনেক ব্যাহত হয়।

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। ইহাদের সবগুলিকে একসঙ্গে একনামে বুঝানর মত স্থানীয় ভাষায় কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রটিকে মণিপুরি ভাষায় বলা হইত পোং (Pong)। ক্রমে পোং নামেই সমস্ত শান রাষ্ট্রগুলি পরিচিত হয়। বৃহৎ শানজাতির 'মান' (Man) শাখার লোকেরাই ছিল উক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ শান রাষ্ট্রের অধিবাসী। তাহারা নিজদিগকে মুঙমান বলিয়া পরিচয় দিত।

রাজা নাওথিং খোং (Naothing Khong)-এর পর মণিপুরের সিংহাসনে আসীন রাজা খোংতেক্চা'র (Khongtekcha) নাম পাওয়া যায়। উক্ত নৃপতি কর্তৃক রচিত সমসাময়িক যুগের একটি তাম্রশাসন হইতে সে সময়ে সমাজে ধর্ম মতের ক্রমশ পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। অনুশাসনে রাজা হরিকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইলেও শিব এবং দুর্গা পূজার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। সর্বসাকুল্যে ৩৬৩ জন দেবতার হিসাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মণিপুরের প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থাদিতে মাত্র ৯ জন দেবতার নাম পাওয়া যায়। মণিপুরের দেবকুলে এইরূপ অভাবনীয় সংখ্যা বৃদ্ধিতে হিন্দু পুরাণের অবদান অতি স্পষ্ট। এই সময় দেখা যায় মণিপুরের দেবগণ মৎস্য, মিষ্টি, নানাবর্ণের গাভীর দুগ্ধ, নানাজাতীয় পুষ্প এবং পত্র পাইলেই সন্তুষ্ট। মোইরাংএর দেবতা থাংজিং এর ন্যায় ষাঁড়ের সুস্বাদু মাংসের জন্য তখন আর দেবতাদের রসনা দিয়া জল পড়িত না। পূজার মন্ত্র ছিল "হ, হ, হ, সহা সহা।" এই 'সহা' সম্ভবত বৈদিক শব্দ 'স্বহা'র বিকৃত রূপ। রাজা তখন ভগবানের অবতার। স্বর্গের দেবীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। দেবতারা দেবীর গর্ভে রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রাজকার্যে দেবতাদের নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া থাকেন। রাজার মাথার উপর সোনা-রূপায় তৈরী ছত্র শোভা পায়। তিনি "পুষ্প মহামাণিক" নামক রথে চড়েন। সামন্ত নৃপতিগণ তাহাকে কর দিয়া থাকে। রাজার একজন ধর্মগুরু আছে। জ্যোতিষ'রা গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয়। রাজা দেহত্যাগের পর গুরুর সঙ্গে

শিবলোক ভ্রমণ করিয়া শেষে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন। তাম্রশাসনে বর্ণিত এই সমস্ত রীতিনীতি ও ভাবধারা হিন্দুপুরাণের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। (Ref. Report on the Archaeological Studies in Manipur—W. Yumjao Singh)

মণিপুরের রাজবংশে খোংতেকচা'র পর আনুমানিক ৮৮০ খৃষ্টাব্দে কেইরেম্বা (Keiremba) এবং ৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইয়ারাবা'র (Yaraba) নাম পাওয়া যায়। ইয়ারাবা'র রাজত্বকালে খুমন'দের (Khuman) দলপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমস্ত ক্ষমতা দখল করিয়া লয়। কিছুদিন পর্যন্ত রাজার কোন প্রভুত্বই থাকে না। ময়াং ইম্ফাল নামক স্থানে বিদ্রোহীদের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। খুমানদের মধ্যে তখনও নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাত জন লালই (বীর) উপযুক্ত বলির সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে মোইরাং এর সেনাপতির একজন স্ত্রীকে হত্যা করিয়া লইয়া চলিল। সেনাপতি সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি বাড়ীতে আসিয়া ঘটনা শুনা মাত্রই দুস্কৃতকারীদের পশ্চাৎ ধাওয়া করিয়া ছয় জনকে নিহত করেন। এই ঘটনার পর হইতে খুমানদের পতন আরম্ভ হয়। রাজা ইয়ারাবার পর মণিপুরের রাজবংশের তালিকায়—যথাক্রমে অয়াংবা (Ayangba—968 A. D) নিংথৌচেং (Ningthoucheng—987 A. D), চেংলইপাম লান্থাবা (Chengloipam Lanthaba—1007 A. D), ইয়াংলউ কেইফাবা (Yanglaw Keiphaba 1027 A. D.), ইরেংবা (Irengba

—1107 A. D), লোইয়াম্বা (Loyamba—1127 A. D), লোইতংবা (Loitongba—1154—A. D.), হেমাতাউই উয়ানথাবা (Hematowi Wanthaba—1179 A. D), এই আট জন রাজার নাম পাওয়া যায়। উক্ত নৃপতিদের রাজত্ব কালের কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এখনও কোথাও পাওয়া যায় না। অতঃপর যিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহার নাম থাওয়ান থাবা। অনুমান ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাহার সময়ে লোকতাক হ্রদে খুমান বাহিনীর সঙ্গে এক নৌ-যুদ্ধ হয়। মণিপুরের নৃপতিগণ কর্তৃক বাৎসরিক হিয়াংহিরেল অর্থাৎ নৌকা-বাইচ উৎসব আজও এই ঘটনারই স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে।

রাজা থাওয়ান থাবার পর মণিপুরের রাজবংশের পঞ্জিকায় নিম্নোক্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায় :—চিংথাং-লাংথাবা (Chingthang Lanthaba—1211 A. D.) পুরাণথাবা (Puranthaba —1226), খুম্বোম্বা (Khumbomba—1236 A. D.) ইহাদের রজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। ১২২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে পঙ্গ (Pong) রাজার মণিপুর আক্রমণ সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধ আছে সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

কর্ণেল জনষ্টনের (Col. Johnstone) মতে আনুমানিক ১২৫০ খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ চীনা বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করিতে আসিয়া মণিপুরের রাজার নিকট পরাজিত হয়। পরাজিত চীনা

সৈন্যদিগকে সুসা কামেং (Susa Kameng) অঞ্চলে বসবাস করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এখনও তাহাদের বংশধরগণ মণিপুরের অনুন্নত 'লোই' সমাজভুক্ত হইয়া ইম্ফাল হইতে ৯ মাইল দূরে ডিমাপুর রোডের ধারে কামেং গ্রামে বসবাস করিতেছে। তাহারাই মণিপুরে সর্বপ্রথম সিল্কের কাপড় এবং ইট তৈরীর কাজ প্রবর্তন করে। মণিপুরে এক সময়ে খামেন চপ্পা (Kamen Choppa) নামক সিল্কের ছাপা-ধুতি এবং কামেং কলমের খুব আদর ছিল। মণিপুরী ভাষায় কামেং শব্দের ব্যবহার অতি অল্পই। সাধারণতঃ কামেং গ্রাম সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্বন্ধেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়। 'পোইরৈতোন খুনথোকপা' (Poreiton Khunthokpa) গ্রন্থে দেখা যায়, বর্তমান কামেং অঞ্চলে এক সময় লুয়াং দুর্গ অবস্থিত ছিল, অথচ কামেং শব্দের কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ওয়াহেংবম য়ুমজাও সিংহ (W. Yumjao Singh) কর্তৃক পরিচালিত মণিপুরের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের ফলে লাঙ্গোল চিঙ্গোইরোল (Langol Chingoirol) নামক স্থানে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর একটি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেই আমরা সর্ব প্রথম কামেং শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। সুতরাং এই কামেং শব্দটি যে বিদেশী এবং ঐ গ্রামের অধিবাসীরা যে বিদেশ হইতে আগত এবং চীনাদের মণিপুর আক্রমণের পর সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৯৩২ সনে কামেং অঞ্চল খননের ফলে যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে এবং কবরগুলি পরিদর্শন করিয়া যে সমস্ত তথ্যাদি

সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ চীনা বাহিনীর এই আক্রমণের কাল সম্পর্কে কর্ণেল জনষ্টনের সঙ্গে একমত নন। মিঃ হড্‌সনের (Mr. Hodson) মতে চীনারা আসিয়াছিল আনুমানিক ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে খাগেম্বার রাজত্ব কালে। মণিপুর "বিজয় পাঞ্চালি" তে (Bijoy Punchali) দেখা যায় খাবোম্বার পিতা মোংয়াম্বা (Mong-yamba) যখন সিংহাসনে আরোহণ করেণ (আনুমানিক ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ) তখন চীনের রাজা পেয়াঙ্গু (Peyangu) তাহার অনুচর ময়োদানাকে (Moyodana) মণিপুর বিজয় করিতে পাঠান। ময়োদানার উপর চীনের রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে ময়োদানার মৃত্যু হউক ইহাই ছিল চীন রাজার আন্তরিক ইচ্ছা। ছলে-বলে যে ভাবেই হউক ময়োদানা নিহত হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন, গোপনে এই সংবাদ মণিপুর রাজার নিকট পাঠাইলেন। যুদ্ধে চীনাবাহিনী পরাজিত এবং ময়োদানা নিহত হয়। ময়োদানার মৃত্যুর পর চীনের রাজা স্বয়ং বহু উপঢৌকন লইয়া—মণিপুর রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। খাগেম-পল্লী নামে এক নূতন চীনা নগরীর পত্তন করা হয়। মণিপুররাজ তাহার বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ আপন নব-জাত পুত্রের নামে রাখেন খাগেম্বা (Khagemba)। চীনা আগন্তুকগণ যেখানে বসতি স্থাপন করিল সেখানে ক্রমে কৌক্রক, চীরাং এবং নান্তা (Nanta) গ্রাম গড়িয়া উঠে। প্রথমতঃ তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, পরে মেইতাইদের ধর্ম গ্রহণ করে। মোংয়াম্বার পর 'বিজয়

পাঞ্চালি'র হিসাব অনুযায়ী খাগেম্বা ১৫৯৮ হইতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং খুনজাওবা (Khunjoba) ১৬৫২ হইতে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

'বিজয় পাঞ্চালি' এবং মিঃ হড্‌সন (Mr. Hodson) কর্তৃক প্রদত্ত চীনা বাহিনী'র আক্রমণকালের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য থাকিলেও কর্ণেল জনষ্টন (Col Johnstone) কর্তৃক নির্ণিত সময়ের সঙ্গে উহাদের ব্যবধান প্রায় ৩৫০ বৎসরেব। এসম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্নের সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। চীনা বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া মণিপুরের কোন রাজা চীনা-বিজয়ীর গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন? মিঃ হড্‌সন রাজা খাগেম্বার মস্তকে সেই বিজয়-মুকুট পরাইয়াছেন। মণিপুরী ভাষায় 'খাগী' শব্দের অর্থ চীন এবং 'ঙম্বা' অর্থ শব্দের বিজয়ী। এই 'খাগী' এবং 'ঙম্বা' শব্দের যোগে খাগেম্বা শব্দের উৎপত্তি; অতএব খাগেম্বা হইতেছেন—চীনা বিজয়ী। এই হিসাবে মিঃ হড্‌সনের মিমাংসা নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু 'বিজয় পাঞ্চালি'র প্রণেতা চীনা-বিজয়ের সম্মান খাগেম্বাকে না দিয়া দিয়াছেন তাহার পিতা মোংয়াম্বাকে। মোংয়াম্বা নিজে 'খাগেম্বা' নাম গ্রহণ না করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন 'খাগেম্বা'—ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। 'খাগেম্বা' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া 'শকারি বিক্রমাদিত্যে'র ন্যায় একটি উপাধি হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় একাধিক রাজা শকের পরিবর্তে হুন বিজয় করিয়াও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মণিপুরের কোন রাজা চীনা আক্রমণ প্রতিহত

করিয়া খাগেম্বা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার অনুকরণ করিয়া ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে একাধিক বিজয়ী নৃপতি এই গৌরবময় পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। মণিপুরের রাজাদের নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 'বিজয় পাঞ্চালি' লিখিত হইয়াছে। এই 'বিজয় পাঞ্চালি'তে স্থানকাল এবং ঘটনার অসামঞ্জস্য অত্যন্ত প্রকট। উদোর পিণ্ডি অনেক সময়েই বুধোর ঘাড়ে পড়িয়াছে। এই দিক হইতে 'বিজয় পাঞ্চালি'র লেখকগণ প্রাচীন ভারতের হিন্দু ঐতিহাসিকগণের অকৃত্রিম জ্ঞাতভাই। খাগেম্বা কর্তৃক প্রচলিত বলিয়া কথিত একরূপ কাঁসার গোল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইতি-পূর্বে মণিপুরে চতুষ্কোণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

খাগেম্বার পর মারাংবা (Marangba) (আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) অপেক্ষাকৃত ছোট এবং পরিষ্কার অক্ষরযুক্ত নূতন গোল মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত রাজাদের নামের তালিকায় থাংবি লাংথাবা (Thangbi Langthaba), কোংয়াম্বা (Kongyamba), তেলহৈবা (Telheiba), তাবুংবা Tabungba), নিংথৌ খোম্বা'র (Ningthou Khomba) নাম পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিংথৌখোম্বা (Ningthoukhomba) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একবার ব্রহ্মরাজের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সসৈন্যে পূর্ব-দিকে গমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া উত্তরপূর্বদিক হইতে তাংখুল নেতারা সদলবলে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া অরক্ষিত

রাজপুরির উপর হামলা দেয়। রাণী লিম্থোইঙাম্বী (Linthoi-ngambi) অবিলম্বে এক নারী-বাহিনী গঠন করিয়া তাংখুল দিগকে হঠাইয়া দেন। নিংথৌখোম্বা'র পর রাজা কীয়াম্বা'র নাম পাওয়া যায়। তাহার সময়ে প্রচলিত একটি মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। 'বিজয় পাঞ্চালি'র হিসাব অনুযায়ী তাহার রাজত্বকাল অস্বাভাবিক-রূপে দীর্ঘ। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি রাজ্য জয়ে মনোযোগ দেন। আসাম সীমান্তে মোরাণ (Moran) হইতে লুসাই পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাহার পদানত হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যকে চার ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন, যথা— অহল্লুপ (Ahallup), নাহারুপ (Naharup), খাবম (Khabam), লাইফম (Laifam)। ভারতবর্ষ তখন মুসলমানদের করতলগত। অনেক গোড়া ব্রাহ্মণ নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কার রক্ষার্থে সে সময় মণিপুর রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণদের বংশ-ধরগণ অধিকারিময়ুম, লাইহাওথাবম, সীজাগুরুময়ুম, ককচীংতাবম, ফুরাইলাংপম্, আরীবাম ইত্যাদি পারিবারিক উপাধিতে পরিচিত। মণিপুরে চৈরাউবা * (Cheirouba) নামক বর্ষশেষের উৎসবটি রাজা কীয়াম্বাই প্রথম প্রবর্তন করেন (অনুমান ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ)।

১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে মণিপুর রাজ্যের আয়তন এবং রাজার যশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক পোং রাজা (King of Pong)

* চৈরাউবা (Cheiraoba)—বর্তমানে এই উৎসবটিকে চরক পূজা বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু মূলত চরক পূজার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

মণিপুরের রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী হন। পঙ্গের দিকে যাত্রার পর খুম্বং (Khumbot) রাজা মণিপুর রাজকুমারীকে অকস্মাৎ ছিনাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু পোং এবং মণিপুরের মিলিত বাহিনী অচিরেই খুম্বং রাজাকে পরাজিত করিয়া রাজকুমারীকে উদ্ধার করে। খুম্বং রাজ্য মণিপুরের পদানত হয়। বিবাহের পর পোং রাজা বহুমূল্য উপঢৌকন সহ মণিপুরের রাজধানী পরিদর্শন করেন। তাহারই নির্দেশে রাজপুরী নূতন করিয়া নির্মিত হয়। পোংরাজ কর্তৃক প্রদত্ত উপহারের শেষ নিদর্শনটি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা দেবেন্দ্র সিং মণিপুর ত্যাগ করিবার সময় সঙ্গে লইয়া যান। (Ref. Assam District Gezetteers—Vol IX, 1905. B. C. Allen)

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজবংশের তালিকায় কৈরেংবা, লঙ্গাইঙাম্বা, ঙঙ্গিয়াইফাবা, কাবোম্বা, অতোংজাম্বা, চালাম্বা এবং মোংয়াম্বা'র নাম পাওয়া যায়। মোংয়াম্বা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। আসামের বুরঞ্জিতে দেখা যায় ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ডিহিঙ্গিয়া রাজা সুহুঙ্গমাঙ্গ (Suhungmung—1497-1537 A. D.) মণিপুরের রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। (Ref. An Account of Assam by Francis Hamilton)। কুচবিহারের ইতিহাসে দেখা যায় ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে কোচ রাজা নরনারায়ণ আহোম এবং কাছাড় রাজাকে পরাজিত করিয়া মণিপুরের রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকারের দাবী করিয়া কর আদায়ের জন্য দূত পাঠান। মণিপুর রাজার তখন শোচনীয় অবস্থা ;—নরনারায়ণের দাবী অগ্রাহ্য করার মত ক্ষমতা নাই। তিনি বিনা প্রতিবাদে বাৎসরিক কর স্বরূপ ২০ হাজার

টাকা, ৩০০ শত সোনার মোহর এবং ১০টি হাতি দিতে সম্মত হইলেন। (Ref. A History of Assam – Gait).

'বিজয় পাঞ্চালি'র হিসাব মত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খাগেম্বা মণিপুরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। খাগেম্বা সম্বন্ধে ইতি-পূর্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই খাগেম্বা যে চীনাবিজয়ী খাগেম্বা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সিংহাসনে আরোহণের পর খাগেম্বা রাজ্যকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। সমাজে 'লাল্লুপ' প্রথা অর্থাৎ বাধ্যতামূলক রাজসেবা প্রবর্তিত হয়। রাজা জমি জরিপ এবং দ্রব্যের ওজন পরিমাপ করিবার জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থির করেন।

একবার খাগেম্বার ভ্রাতা সানৌতন (Sanouton) ভগ্নিপতি কাছাড়ের রাজার সাহায্যে সিংহাসন দখল করিবার জন্য সসৈন্যে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া লাইমতোন (Laimaton) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। যুদ্ধে খাগেম্বা জয়ী হন এবং সানৌতন হত হয়। বন্দী সৈন্যদের মধ্যে নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং অনেক মুসলমান ছিল। তাহারা অনেকে মণিপুরেই থাকিয়া যায়। বিষ্ণুপুরে অবস্থান কালে খাগেম্বা ভগবান বিষ্ণুর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে লাংথাবাল (Langthabal) নামক স্থানে তিনি নূতন একটি প্রাসাদ তৈরী করিয়াছিলেন। খাগেম্বার সঙ্গে ত্রিপুরার কিরূপ সম্পর্ক ছিল জানা যায় না ; তবে দেখা যায় 'তখেল' প্রদেশের কিছু লোক মণি-পুরে খাজনা দিতে আসিয়াছিল। মণিপুরে ত্রিপুরা-রাজ্যের পরিচয়

ছিল "তাখেল" অর্থাৎ দক্ষিণ—নামে। অরিবম-সগোল্সাইলাংপম, সামুরাই লাংপাম, থোংগ্রাত্তাবম এবং হিদাংময়ুম পরিবারের আদি ব্রাহ্মণগণ খাগেম্বার সময়েই মণিপুরে আসে। ভম্নমুনশিরা এবং লাইরিকয়েংবাম নোংস্থমৈ (Lairik Yengbam Nonsumei) নামক দুইজন খ্যাতনামা পণ্ডিত খাগেম্বার রাজত্ব কালে মণিপুরের রাজ বংশের ইতিহাস "বিজয় পাঞ্চালি" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খাগেম্বার পর খুঞ্জাওবা (Khunjaoba) পাইখোম্বা (Pai-komba) এবং চরাইরোংবা এই তিন জন রাজা রাজত্ব করেন। পাইখোম্বা এবং চরাইরোংবা কর্তৃক প্রচলিত যথাক্রমে গোল এবং চতুষ্কোণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাজা চরাইরোংবার পুত্রই হইতেছেন মণিপুরে 'নবযুগ প্রবর্তক' পামহেইবা ওরফে গরীবনেওয়াজ।

পাঁচ

গরীবনিওয়াজ পামহৈবা

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মণিপুরের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এদিকে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক গগন যখন কালবৈশাখীর কাল মেঘে আচ্ছন্ন, তখন পূর্বাচলে মণিপুরের কুয়াশামুক্ত আকাশ অরুণ আভায় আলোকিত হইয়া উঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী আভাসে ইঙ্গিতে যে কাহিনী শুনাইতে চাহিয়াছে, তাহার কিছু হয়ত বুঝিলাম, কিন্তু বাকী সমস্তই কালের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পুরাতন শতাব্দীর কবরে মন্দ যাহা চাপা পড়িয়াছে তাহার জন্য দুঃখ নাই, সেই মাটীতে ভাল যাহা মিশিয়া আছে—তাহাকে শ্রদ্ধা জানাই। নূতনের সংঘাতে দেখি মণিপুরের মণি ভারতের এই সীমান্তে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া শোভা পাইতেছে। মণিপুরের ইতিহাস প্রণেতা এই অধ্যায়ে পৌঁছিয়াই গলদঘর্ম হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন; তখন হইতেই এখানকার ঘটনাবলি স্পষ্ট এবং ইতিহাসও মুখর। মণিপুরের শৌর্যবীর্য একজন বলিষ্ঠ এবং সুনিপুণ কর্ণধারের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। এই সময় বৈপ্লবিক দৃষ্টি এবং দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভা লইয়া রাজা পামহৈবা সম্রাট হর্ষের ন্যায় একাধারে রাজ্য জয় অন্যদিকে ধর্মবিপ্লব সাধন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে মণিপুরের আত্মার যোগ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়। কে জানে এই মহান ক্ষত্রিয় নায়কের সংগঠন এবং পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হইলে মণিপুরী সমাজ হয়ত আজও

আসামের অপরাপর সম্প্রদায়গুলির মত অনেক পশ্চাতেই থাকিয়া যাইত।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মতে রাজা পামহৈবা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। বিজয় পাঞ্চালির হিসাব অনুযায়ী তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেণ ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কে এই শত্রুঞ্জয়, গরীবের আশ্রয় (গরীব নিওয়াজ), বৈষ্ণব নৃপতি,—যাঁহার চরিত্রে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈষ্ণব প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল? রাজা চরাইরোংবা'র (Cl arairongba) পর পামহৈবা সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকালে তিনি নাগা সমাজে নাগা সর্দারের পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত। সিংহাসনে আরোহণ করার পরও তাহার নাগা রীতিনীতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়। নাগা বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। নাগা সম্প্রদায় এতদিন পর মণিপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে তাহাদের-ই একজন নেতারূপে বরণ করিতে পারিয়া সকল ক্ষোভ মিটাইল। কিন্তু এই পামহৈবা প্রকৃতই রাজা চারাইরোংবা'র পুত্র না নাগা-সন্তান এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই তাহাকে নাগা সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন মণিপুরী ঐতিহাসিক এবিষয়ে অনুরূপ বিবরণ দেন। পামহৈবার জন্ম এবং বাল্যজীবন সম্বন্ধে নাগা এবং মণিপুরী মহলে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে পামহৈবার রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত মণিপুরের রাজবংশে রাজাদের

প্রধানা মহিষীর সন্তান ব্যতীত অন্যান্য রাণীদের গর্ভজাত পুত্রদিগকে বাঁচাইয়া রাখা হইত না। রাজা চরাইরোংবা'র (Charairongba) অন্যতমা রাণী সুংশেল চাইবী যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করেন। পুত্রটিকে তিনি নিষ্ঠুর রাজকীয় প্রথার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গোপনে উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে লাইসাংখোং (Laisang-khong) গ্রামে নাগা সর্দারের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন,—অন্যদিকে রাজাকে খবর দেওয়া হয় যে রাণী একটি প্রস্তরখণ্ড প্রসব করিয়াছেন। অন্য একটি কাহিনীতে আছে—রাণীর গর্ভাবস্থায় রাজা জ্যোতিষীদের দ্বারা গণনা করাইয়া জানিতে পারেন যে ভাবী সন্তান পিতৃহন্তা হইবে। এই ভয়ে রাজা প্রসবের অব্যবহিত পরই নবজাত শিশুকে হত্যা করার আদেশ দেন। রাণী রাজার আদেশ শুনিতে পাইয়া গোপনে পূর্ব হইতে তাহার আপন পিতার সাহায্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করাইয়া নবজাত পুত্রটিকে উপরিউক্ত নাগা সর্দারের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। এদিকে রাজাকে পাথর প্রসবের সংবাদ দেওয়া হয়। রাজা তখনকার মত নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর তাহার মনে রাণীর সন্তান প্রসব সম্বন্ধে তাহাকে যথাযথ সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল কিনা এই সন্দেহ জাগে। তিনি পশ্চিম-দিকে নাগা গ্রামগুলিতে লোক পাঠাইয়া প্রকৃত খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন। নাগা সর্দার আশ্রিত রাজপুত্রকে নিজপুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিতেছিল। রাজার সন্দেহ এবং এ বিষয়ে তাহার অনুসন্ধানের কথা জানিতে পারিয়া সে পালিত পুত্রের নিরপত্তার জন্য তাহাকে উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে খাঙ্গাল গ্রামে কুইরণ (Quiron)

নামক নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখিয়া আসে। এদিকে অনেক বৎসর কাটিয়া যায়; কিন্তু রাজার আর কোন পুত্র সন্তান হয় না—তাহার তৃষিত পিতৃহৃদয় পুত্রাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। একবার তিনি খাজানা আদায়ের জন্য সদলবলে সেই থাঙ্গাল গ্রামে উপস্থিত হন। প্রজারা তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে। এই সময় এক বাড়ীতে একটি সুন্দর ফুটফুটে কিশোর তাহার নজরে পরে। তিনি তাহাকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্রামবাসী সানন্দে রাজার ইচ্ছায় সম্মতি দিল। জন্মের পর পরিত্যক্ত পামহৈবা পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে রাজসভার পদস্থ সদস্য হাওবম সেলুংবা'র (Haobam Selungba) নিকট তাঁহার মেয়ের সঙ্গে পামহৈবার বিবাহের প্রস্তাব করা হইল। অজ্ঞাতকুলশীল পামহৈবার নিকট কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাবে কুলীন সেলুংবার আভিজাত্যবোধে আঘাত লাগিল। এদিকে রাজা অন্যদিকে কুল—এইরূপ দ্বন্দ্বে তিনি রাজসভা হইতে কিছুদিন দূরে থাকার সংকল্প করেন। পামহৈবার জননী এইসময় একদিন সুযোগ বুঝিয়া সেলুংবা এবং রাজার নিকট পামহৈবার প্রকৃত জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করেন। ইহাতে পুত্রলোভাতুর রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না; সেলুংবারও এর পর তাঁহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। পরবর্তী কালে পামহৈবা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার উপাধি হয় গরীবনিরাজ (Garibnewas)। মণিপুরের কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গরীবনিরাজ শব্দ "করিগুম্বা নাওয়া" (পাওয়া ছেলে)

শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু তৎকালীন প্রাচীনপন্থী গুরু খোংনাংথাবা (Khongnang haba) পামহৈবাকে ক্ষত্রিয়কুলজাত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। উপরন্তু তাঁহাকে নাগা সন্তান বলিয়াই মণিপুরী মহলে প্রচার করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মত ধর্মবিরোধের ফলে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। মণিপুরের বৈষ্ণবগুরু শান্তিদাস অধিকারী সর্বপ্রথম জোরগলায় মণিপুরের রাজবংশের ধমনীতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করেন। পামহৈবা প্রকৃতই নাগা-সন্তান হইলে ক্ষত্রকুল-গৌরবের অধিকারী হইবার জন্য রাজা চরাইরোংবাকে জনক-পিতা বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। নিজের বাহু এবং বুদ্ধিবল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন; মিথ্যা ক্ষত্রকুলের বিজ্ঞাপনদ্বারা নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

একবার দক্ষিণ দিকে তু-সুক (Too-Sook) নামক নাগা সম্প্রদায় লালম্বা'র নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া খারম (Kharam) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। একে একে রাজার সমস্ত সেনা-পতি তাহাদের হস্তে পরাজিত হয়। এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় রাজা নিরুপায় হইয়া জ্যোতিষের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এদিকে পাছে রাজা চরাইরোংবা অন্যান্য রাণী এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শে মত পরিবর্তন করিয়া পামহৈবার পরিবর্তে অন্যকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এই ভয়ে বিবাহের পর হইতেই সেলুংবা তাঁহার জামাতাকে পিতার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেন। লালম্বার বিদ্রোহে তাহাদের কোন হাত

ছিল কিনা বলা যায় না ; তবে এই রাষ্ট্রবিপ্লবই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বর্ণ সুযোগ হইল। রাজা যুদ্ধে লালম্বাকে পরাজিত এবং নিহিত করিয়া যখন নম্বুল নদীর ধারে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ নিকটে এক বজ্রপাতের শব্দে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেলুংবা এইরূপ কোন সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার বর্শাফলকের দ্বারা রাজাকে আঘাত করেন, তাহার পূর্বেই রাজার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল। বর্শাবিদ্ধ রাজা যখন যাতনায় ছটফট করিতেছিলেন তখন তাঁহার একজন পার্শ্বচর চীৎকার করিয়া আততায়ী সেলুংবার এই কীর্তির কথা রাজাকে জানায়। ভিতরের রহস্য বুঝিতে রাজার বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, "এই অপকর্মে আমার পুত্রও নিশ্চয়ই জড়িত আছে"। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া রাজা পামহৈবাকে ডাকাইয়া আনিয়া রাজ্যের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী মাখাওঙামবী (Makhaongambee) তাহার স্বামী ব্রহ্মদেশের রাজা তংদোই (Tongdoi) কর্তৃক যথেষ্ট নির্যাতিতা হইয়াছে—আশা করি ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া তুমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।" অবশেষে তিনি বলিলেন—"পিতৃহত্যায় লিপ্ত হইয়া মহাপাতকে নিমগ্ন হইয়াছ, তাহা হইতে তোমার মুক্তি নাই ; বৃদ্ধবয়সে আমার মত তুমিও তোমার প্রাণাধিক পুত্রের ষড়যন্ত্রে নিহত হইবে।"

চরাইরোংবার রাজত্বকালে গুরুময়ুম, হাজারিময়ুম, লাইময়ুম, মথুরাবাসীময়ুম এবং চৌব্রিময়ুম প্রভৃতি মণিপুরের কয়েকটি বিখ্যাত

ব্রাহ্মণ-বংশের আদি পুরুষগণ মণিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

যথাবিধি রাজ্যাভিষেকের পর পামহৈবা গরীবনিরাজ উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানকালে পামহৈবা নামের চেয়ে গরীবনিরাজ নামই অধিক জনপ্রিয়। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দলিলপত্রেও গরীবনিরাজ নাম-ই পাওয়া যায়। * "করিগুম্বানাওয়া" শব্দের সঙ্গে 'গরীবনিরাজ' শব্দের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা যে মূলতঃ পৃথক শব্দ ইহা বুঝিতে ভাষাতত্ত্বের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। "পাওয়া চেছ্নে" ইহা কোন খ্যাতনামা নৃপতির গৌরব এবং আদর্শের পরিচায়ক উপাধি হইতে পারে না। তাহার চেয়ে পারসী শব্দ 'গরীব নিওয়াজ'ই (অর্থাৎ গরীবের প্রতি সদয়) পামহৈবার উপযুক্ত উপাধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মণিপুরে এই পারসী উপাধির আমদানি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। তখন-ও ভারতে ইংরেজ রাজত্ব এবং ইংরেজী সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় নাই। উত্তর এবং পূর্ব ভারতে মুসলমান শাসন তখনও কায়েম আছে। ভারতের অন্যান্য হিন্দুরাজা এবং জমিদারদের মধ্যে খাঁ, নবাব, দেওয়ান, মুন্সী, মজুমদার, বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব আজ পর্যন্তও চালু দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়

* Ref. O. C. 4th October, 1762, No. 5 (Home Dept.) The letter from Mr. Verelst, chief of Chittagong Factory to Mr. H. Vansittart, Govt. of Bengal. dt. 19th Sept. 1762.

পারস্য সাম্রাজ্য পতনের বহুদিন পর পর্যন্তও উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের রাজারা "সত্রপ" (Satrap) নামক পারসী উপাধি ধারণ করিতেন। মণিপুর, বাংলা এবং আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইলেও যেমন ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন হইতে মুক্ত ছিল না, তেমনি মুসলমান সভ্যতার ছোঁয়াছুঁয়ি হইতে তাহার ছুতমার্গ অটুট থাকার সম্ভাবনাও কম। কারণ মুঘল সেনাপতি মীরজুমলার সৈনাপত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে আসামে গৌহাটী এবং দরং জেলা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অন্যদিকে শ্রীহট্ট এবং বর্তমান কাছাড় জেলার কতক অংশ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থিত মুঘল নবাবের অধীন একজন মুসলমান আমীর কর্তৃক শাসিত হইত। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলেও আরও ১৫০ বৎসর পর্যন্ত মুঘল সিংহাসনের প্রতি ভারতের সকলেরই বিশেষ একটা আনুগত্য ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক সমবেতভাবে বাহাদুর সাহকে বিদ্রোহের নেতা নির্বাচনের দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। মণিপুরে মুসলমান প্রজাদের বসতি স্থাপন রাজা পামহৈবার বহুপূর্বেই হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা যে ধর্ম, শিক্ষা এবং বাণিজ্য উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং পামহৈবা কর্তৃক গরীবনিবাজ উপাধি গ্রহণ যে মুসলমান প্রভাবের ফল এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম।

কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য

তিনি ব্রহ্মদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ব্রহ্মরাজের সৈন্য পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। এই ব্যাপারে মণিপুরের বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শান্তি দাসের শিষ্য মহান্ত বক্রীদাস মণিপুর রাজের পক্ষে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হন। ব্রহ্মরাজ তংদোই (Tongdoi) মণিপুরের রাজকুমারী সত্যমালার পাণি প্রার্থনা করেন। বিজয়া পামহেইবা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেও মনোভাব গোপন রাখিয়া এক কূটনৈতিক চাল চালিলেন। ব্রহ্মরাজের নিকট খবর দেওয়া হইল—বসন্তপঞ্চমীর তিনদিন পর সত্যমালাকে তাহার নিকট সমর্পণ করা হইবে। তাহারা যেন সেই অনুযায়ী প্রস্তুত থাকেন। তংদোই নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজকুমারীকে রাজধানীর কিছু দূর হইতেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্তু এদিকে যে কঠিন বিবাহ ঘনাইয়া আসিয়াছে সে সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র হুঁশ ছিল না। কন্যাযাত্রিসহ রাজকুমারী সত্যমালার পরিবর্তে সশস্ত্র মণিপুরী সৈন্য ব্রহ্মের রাজধানী আভা নগরী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। ছোট বড় অনেক সহর তাহাদের পদানত হইল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইরাবতী নদীর মোহনার তীরে (Irrawaddy Delta) 'তৈলিং'দের (Tailings) বিদ্রোহের ফলে ব্রহ্মরাজের শক্তি যথেষ্ট খর্ব হইয়াছিল। সেইজন্য মণিপুর রাজের এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার

* Ref. Report on the Eastern Frontier of British India -Page 37-38,—Pemberton.

ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। কিন্তু এই সময় এক সাধারণ ঘটনায় বিজয়ী মণিপুরী সৈন্য জয়মাল্য ফেলিয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। ব্রহ্মসৈন্য যখন পরাজিত এবং পর্যুদস্ত তখন হঠাৎ ঝড়ের বেগে আভা নগরীর উপর উড্ডীন মণিপুরের বিজয়পতাকা ভূমিতে পড়িয়া যায়। রাজা পামহৈইবা ইহাতে অশুভ সূচনার ইঙ্গিত মনে করিয়া যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। রাজা তংদোই পামহৈইবা অনুজা মাখাওভাম্বী'র প্রতি প্রতিকূল আচরণের জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হন। উপরি উক্ত দৈব কারণ ছাড়াও যুদ্ধবিরতির অন্য বাস্তব কারণ ছিল। পামহৈইবা যখন তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ পরিচালনায় রত তখন ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমাণিক্য মণিপুর আক্রমণ করিয়া মোইরাং পর্যন্ত অগ্রসর হন। রাজ্য শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার খবর পাইয়া পামহৈইবা শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্গে লড়িতে হইলে পুর্বদিকে ব্রহ্মরাজের সঙ্গে সমস্ত শক্রতা মুছিয়া ফেলিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধহওয়া প্রয়োজন। নতুবা পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য তিনি মণিপুরে আসিয়াই রাজকন্যা সত্যমালাকে ব্রহ্মরাজ তংদোই'এর হস্তে অর্পণ করিয়া যথার্থ কূটনীতিজ্ঞের (diplomat) পরিচয় দেন। পামহৈইবার প্রত্যাবর্তনের অল্পদিনের মধ্যেই ত্রিপুর সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে ইংরেজ কুঠীর প্রধান কর্মচারী মীঃ ভেরেলষ্ট কর্তৃক তৎকালীন বাংলার লাট মিঃ ভ্যান্সিটার্টের নিকট

লিখিত একটি চিঠীতে * দেখা যায় গরীবনিওয়াজের দু'টি স্ত্রী ছিল। প্রথমটির গর্ভজাত পুত্রের নাম শ্যামসা (Shyam shah)। এই শ্যাম সা' এর গৌর সা এবং জয়সিং নামে দুই পুত্র ছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যথাক্রমে অজিত সা, মুন সা, তোং সা, সর্বসাচী (Sarbosachee), ভরত সা এবং শত্রুঘ্ন সা নামে এই ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়া পত্নীর প্রভাবে এবং গুরু শান্তিদাসের ইচ্ছানুসারে গরীবনিওয়াজ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যাম সা-কে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয় পুত্র অজিত সা'কে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজকার্যের গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পর ব্রহ্মরাজার সঙ্গে কোন জটিল রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য গরীবনিওয়াজ তাঁহার গুরু শান্তিদাস এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যাম সা'কে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর মণিপুরে এক গুজব রটে যে গরীবনিওয়াজ অজিত সা'কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যাম সা'কে সিংহাসনে বসানর জন্য ব্রহ্মরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। অজিত সা ইহাতে বিচলিত হইয়া মাতা গোমতীর চক্রান্তে পথিমধ্যে অসতর্ক অবস্থায় গরীবনিওয়াজ এবং শ্যাম সাকে হত্যা করার জন্য তোলেন-তোম্বার অধীনে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তোলেনতোম্বা ব্রহ্মদেশে যাইয়া গরীবনিওয়াজকে মণিপুরে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার পুত্র রাজা অজিত সা'র বিনীত অনুরোধের কথা তাঁহাকে নিবেদন করেন। বৃদ্ধ গরীবনিওয়াজ

* The letter from Mr. Verelst, Chief of Chittagong Factory to Mr. H. Vansittart, Governor of Bengal dt. 19th Sept. 1762.

পুত্রের অনুরোধক্রমে গুরুদেব এবং শ্যাম সা'.ক সঙ্গে লইয়া মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তোলেনতোম্বা তাঁহাদের রক্ষী নিযুক্ত থাকিল। হঠাৎ একদিন এক নির্জন স্থানে গরীবনিওয়াজ যখন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র জপে রত ছিলেন তখন বিশ্বাসঘাতক তোলেন-তোম্বা তাঁহাকে হত্যা করে। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের ফলে গুরুদেব শ্যাম সা সহ গরীবনিওয়াজের দলের ২০ জন নিহত হয়।

লেফটেনেণ্ট কর্ণেল বার্ণে (Lieut. Colonel Burney) ব্রহ্ম-দেশের রাজদপ্তরের দলিলগুলি পাঠ করিয়া গরীবনিওয়াজের ব্রহ্মদেশ অভিযান এবং মৃত্যু সম্পর্কে অন্যরূপ বিবরণ দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় লিখিত এই দলিলগুলি এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এবং তাহার পর বৎসর, পর পর দুইবার ব্রহ্মদেশের রাজা মণিপুর আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হন। দ্বিতীয়বার আক্রমণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। গরীবনিওয়াজ যথাক্রমে ১৭৩৫, ১৭৩৭, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া মুৎসেঙ্গ (Mutseng) দীবায়েন (Deebayen), মীএদু (Myedoo) এবং প্রাচীন রাজধানী জাকাইং (Zakaing) সহর দখল করেন। অভিযানকারী মণিপুরী সৈন্যদের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলেন ইরাবতী নদীর জলে স্নান করিতে পারিলে তাহাদের সমস্ত পাপক্ষালন হইয়া যাইবে। এইরূপ ধর্মবিশ্বাসের ফলে আক্রমণকারী সৈন্যদলের মনে ব্রহ্ম-দেশের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রবল হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে গরীবনিওয়াজ পুনরায় ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করেন, তখন

তাঁহার সঙ্গে কাছাড়ের বাহিনীও ছিল। কিন্তু এই যাত্রায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে না পারায় মিত্রপক্ষীয় অনেক সৈন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে। ফলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। এরপর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ২০ হাজার পদাতিক এবং ৩ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়া কীয়েন্দুইন নদী (Kyendwen) এবং ইর'বতী নদীর সঙ্গমস্থলে তাঁবু ফেলেন। ব্রহ্মদেশের সৈন্য এবার আভা নগরী (Ava) রক্ষার জন্য যথেষ্ট সমরায়োজন করে। গরীবনিওয়াজ আক্রমণের উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার তাঁবুর উপর হইতে পতাকাটি বাতাসে মাটীতে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার মন অশুভ আশঙ্কায় দমিয়া গেল। তিনি তাঁহার ১২ বৎসরের কন্যাকে (মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্রী) আভার রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করেন। মণিপুরে ফিরিয়া আসার পথে তিনি যখন মাগলুং (Maglung) নদীর মোহনার তীরে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র অজিত সা ওরফে কাঁকীলাল থাবা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ব্রহ্মদেশের সঙ্গে এইরূপ অপমানজনক সন্ধিসর্তে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুযোগ দেন। গরীবনিওয়াজের সৈন্যগণও তাঁহার এইরূপ সন্ধির ফলে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা এক্ষণে অজিত সা'র ইঙ্গিতে রাজার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যোগ দিল। গরীবনিওয়াজ মাত্র ৫০০ অনুচর সহ বিদ্রোহী পুত্রকে দমন করিবার জন্য, সাহায্যলাভের আশায় আভার রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। আভানগরী পেগু সৈন্য

(Peguers) কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ার প্রাক্কালে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। মাগলুং (Maglung) নদীর তীরে অজিত সা'র দূত অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া গরীবনিওয়াজ এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যাম সা ও অন্যান্য পরিজনদিগকে হত্যা করে। এইরূপে পিতা চরাইরোংবা কর্তৃক অভিশপ্ত গরীব-নিওয়াজ আপন পুত্রের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়া এতদিন পর শাপমুক্ত হইলেন।

মণিপুরের আধুনিক একজন ইতিহাসপ্রণেতার মতে গরীবনি-ওয়াজের সময়ই সর্বপ্রথম মণিপুরে দ্বিজতান্ত্রিক বৈষ্ণব মতের (Brahmanical Vaisnavism) প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব গুরু শান্তিদাস অধিকারীর নিকট রাজা রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হইয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মকেই রাজধর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন; এবং প্রজাদিগকেও সেই মত গ্রহণ করিতে আদেশ দেন। প্রাচীন পন্থী গুরু খোংনাংথাবা এবং তাঁহার শিষ্যগণ নব্য মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রাচীন মতের সমর্থনে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন; কিন্তু রাজশক্তির প্রতিকূলতায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজা বিরুদ্ধ সমালোচনায় অতিশয় বিচলিত হইয়া প্রাচীনপন্থীদের শাস্ত্রসমূহ পুড়াইয়া ফেলার আদেশ দেন। ধর্মান্ধ-তার বশে এইরূপ অবিবেচক কার্যের ফলে মণিপুরের ইতিহাস এবং ধর্মের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইয়া যায়।

এই সমস্ত ইতিহাসপ্রণেতাদের কাছ হইতে পামহেইবা কর্তৃক

প্রাচীন ধর্ম এবং শাস্ত্র নষ্ট করার কাহিনীর সমর্থনে আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাজার একার ইচ্ছায় পুরাপুরি সমাজ এবং ধর্মবিপ্লব সাধিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অজাতশত্রু চেষ্টা করিয়াও মগধরাজ্য হইতে বুদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন নাই। সম্রাট অশোক বুদ্ধধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করিয়া রাজ্যের সমস্ত শক্তি এবং অর্থ বুদ্ধধর্ম প্রচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি জৈন বৈদিক, আজীবক প্রভৃতি ধর্ম এবং সম্প্রদায় ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয় নাই। পরবর্তীকালে মুসলমান এবং খৃষ্টান শাসনব্যবস্থাও এবিষয়ে ব্যর্থকাম হইয়াছে। চীন এবং জাপান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও লাউৎসে, কনফিউসিয়াস এবং সিন্তো মতাবলম্বীদের সংখ্যা সেই সব দেশে কম নয়। আধুনিক কালেও ধর্মবিরোধী কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার গীর্জাগুলির দরজায় তালা পড়ে নাই। মণিপুরেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নূতন বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে অনেক প্রাচীন দেবদেবী, আচার অনুষ্ঠান আজও সমভাবে মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে। মোইরাংএ থাংজিং-এর মন্দির এবং ইম্ফালে সানামহীর মন্দির প্রাচীন ধর্মমতেরই অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। সমাজে মাইবা এবং মাইবী নামক প্রাচীন মতের পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রভাব এখনও বর্তমান আছে। লাইহরাউবা নৃত্য চৈরাউবা প্রভৃতি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে মণিপুরী সমাজের যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা যায়—তাহাতে সেই প্রাচীন মতেরই জয়ধ্বনি। দ্বিতত্ত্বাত্মিক বৈষ্ণব-বাদও এখানকার স্বাধীন

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের শক্ত বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ হইয়াছে।

গুরু শান্তি দাসের নিকট রামানন্দী বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণের পর পামহৈবা স্বভাবতই উক্ত মতের যথেষ্ট পোষকতা করিয়া থাকিবেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের মতের জনপ্রিয়তা-বৃদ্ধির ফলেও রামানন্দী আচার অনুষ্ঠান একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ইম্ফালে রামজীর মন্দির এবং বিশেষ পর্ব পউলক্কে শিরস্ত্রাণ পরিধান রামানন্দী মত এবং আচারেরই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। বৈষ্ণব গুরু শান্তিদাস অধিকারী'র পূর্ব পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। তিনি শ্রীহট্ট হইতে মণিপুরে আসিয়াছিলেন এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। পামহৈবার মত একজন শ্রেষ্ঠ রাজার উপর প্রভাব বিস্তার এবং অল্পদিনের মধ্যে রামানন্দী মতের জনপ্রিয়তা অর্জন—গুরু শান্তি দাসের অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভারই পরিচায়ক।

বৈষ্ণবধর্মের এইরূপ রাজসিক মর্যাদা অর্জনকে একটি আকস্মিক নিরপেক্ষ ঘটনা মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে। রাজনৈতিক কারণে মণিপুরের সঙ্গে কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা বা আসামের চেয়ে ব্রহ্মদেশের সঙ্গেই যোগাযোগ হইয়াছে বেশী। নূতন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর অতি সামান্য দিন ব্যবধানের মধ্যে-ই ব্রহ্মদেশের সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করিয়া (১৭৫৮ খৃঃ অব্দ) মণিপুর দখল করে। ১৭৫৮ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রায় ৬৮ বৎসরের মধ্যে মণিপুর বহুবার ব্রহ্মদেশ কর্তৃক আক্রান্ত ও শাসিত

হইয়াছিল। এই সমস্ত আক্রমণকারী নৃপতিগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাহারা নিশ্চয়ই এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার চেষ্টায় ত্রুটী করেন নাই। পুরাতত্ত্ব অন্বেষণের ফলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তিটি সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি মণিপুরী সমাজ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পূর্বে বা পরে কখনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নাই। নূতন বৈষ্ণব মতের তীব্র সমালোচক প্রাচীনপন্থী গুরু খোংনাং থাবা গরীবনিওয়াজকে নাগসন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গরীবনিওয়াজের নাগাকুলে জন্ম সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকিলেও তাঁহার নাগা সাহচর্য এবং নাগা-প্রীতি অত্যন্ত সুবিদিত। কিন্তু তথাপি দেখা যায় রাজার ধর্মমত একই রাজ্যের অধিবাসী নাগা সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অন্যদিকে মণিপুরী সমাজ বসনে ভূষণে, আচার নিষ্ঠায় খাঁটি বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। মানবজাতির ইতিহাস এবং উপরিউক্ত বিসদৃশ ঘটনাদৃষ্টে—বৈষ্ণবগুরু শান্তিদাসের কারসাজিতে গরীবনিওয়াজ প্রাচীন ধর্ম লোপ করিয়া মণিপুরীদের উপর বৈষ্ণবধর্ম চাপাইয়া দিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা - কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার প্রসঙ্গে ভারতীয় বৈষ্ণব মতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের দ্বারা এবিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। যদিও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ কর্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারের পর হইতেই ভারতে বৈষ্ণব মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তথাপি ভক্তিবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির

মজ্জায় মিশিয়া আছে। ইহার প্রাচীন নাম ছিল একান্তিক ধর্ম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বাণীর মধ্যেই ইহার দার্শনিক ভিত্তি। বাসুদেব কৃষ্ণ, বুদ্ধ অথবা মহাবীরের মত, নীরস বৈদিক ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর হইতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য লোকসমক্ষে প্রেম এবং ভক্তির সদর দরজা খুলিয়া দেন। কিন্তু মহাভারতের যুগেই দেখা যায় ক্রমে এই মত সার্বিকতা হারাইয়া এক নারায়ণীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এইরূপ সম্প্রদায়কেই অন্যান্য গ্রন্থে পঞ্চরাত্র এবং সত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীকপর্যটক মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ইহাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য মিলে। ক্রমে নারায়ণীয় এবং বিষ্ণু এই দুই সম্প্রদায়ের আদর্শের মিলনের ফলে বৈষ্ণববাদের (Vaisnavism) উৎপত্তি হয়। সম্রাট অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায়গুলি ক্রমশ ক্ষীণপ্রভ হইয়া গেলেও বৈষ্ণব মত একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণ পরম-ভাগবত উপাধি গ্রহণ করিতেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর আদিত্যসেন নামক মগধের একজন গুপ্ত রাজা গয়াতে একটি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য নির্গুণ ঈশ্বরবাদের সাহায্যে বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদকে শূন্য করিয়া দিয়া বুদ্ধধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাহার ফলে ভারতে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ভবসমুদ্রপারের তরণী হয় একমাত্র জ্ঞান। রামানুজ নির্গুণ ঈশ্বরের পরিবর্তে সর্বগুণ-সমন্বিত ঈশ্বরের কল্পনা করেন। ভক্তিদ্বারা সেই সগুণ ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায়।

ভক্তি জ্ঞানেরই এক বিশেষ প্রকার মাত্র। রামানুজের ঈশ্বর ভক্তের নিকটতম আত্মীয়। বুদ্ধধর্মের শূন্যবাদে অথবা শঙ্করের শুষ্কজ্ঞানমার্গে ভাবাবেগের কোন স্থান নাই। মানুষের অন্তরের ভাবপ্রবণতা এতদিন চাপা পড়িয়াছিল। রামানুজের মধুর ভক্তিরসে সিক্ত হওয়ায় শুষ্কমন-যমুনা আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। এর পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসিলেন নিম্বার্ক, মাধবাচার্য্য এবং রামানন্দ। ইহারা সকলেই সগুণ ঈশ্বরের উপাসক। রামনন্দই সর্বপ্রথম রাম এবং সীতার যুগলমূর্তির মধ্যে বিষ্ণুর যথার্থ স্বরূপ কল্পনা করিয়া আচণ্ডালে পতিতপাবন সীতারামকে ভজনা করার অধিকার দেন। তাঁহার-ই প্রধান মুসলমানভক্ত, কবীর রাম রহিম এক করিয়া হিন্দুমুসলমানের ভেদ ঘুচাইয়া দেন।

বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণপূজারী আর একটি শাখার প্রধান গুরু হইতেছেন বল্লভাচার্য (১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ)। এই মতে রাধিকা হইতেছেন কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত এবং ভক্তদের আদর্শ। কিন্তু এই কৃষ্ণরাধিকাতত্ত্বের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন কোন অংশ এক সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা এবং গোপিনীদের সম্পর্কের স্থূল ব্যাখ্যার অনুকরণ করিতে যাইয়া ত্যাগ এবং সংযমের পরিবর্তে বিলাস এবং ইন্দ্রিয় সম্ভোগকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারায়ণস্বামী এই ভুল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বল্লভাচার্যের সমসাময়িক, চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও কৃষ্ণভক্ত। তাঁহার মতে

ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবানের নিত্যলীলাসহচর পদে উন্নীত হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ভক্তের চিত্তেই রাধিকার বাস। বাহিরে তাঁহার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা, মাতামহ এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জনের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বেই শ্রীহট্ট বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। আসামেও তখন (১৪৪৯—১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ) শঙ্করদেবের সাধনা ও সঙ্গীতে বৈষ্ণব প্রেমের বন্যা বহে।

একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের এই যে প্লাবন বহে, তাহার পশ্চাতে রাজশক্তির কোন সমর্থন বা আনুকূল্য ছিল না। তখন ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-দের করতলগত। মুসলমান রাজা এবং শাসনকর্তাগণ ইসলামধর্ম এবং সভ্যতা প্রচারেই বেশী সচেষ্ট ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকগণ সর্বত্রই প্রেমের দ্বারা লোকের হৃদয়ে তাঁহাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্য সম্প্রদায়েব গ্রন্থ পুড়াইয়া বা মন্দির অপবিত্র করিয়া ধর্ম প্রচার করার অভিযোগ বৈষ্ণবধর্মের অতিবড় শত্রুগণও কোনদিন আনিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে আঘাতের বিনিময়ে প্রেম নিবেদনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ত বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস রচিত।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এই বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনের ঢেউ শ্রীহট্ট এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে মণিপুরেও আসিয়া মাঝে মাঝে লাগে নাই একথা কেহ বলিতে পারেন না। মণিপুরীদের স্বভাব

এবং সংস্কৃতির মধ্যে প্রেমধর্মের যে সমর্থন ছিল তাহা নোংপোক নিংথৌ ও পান্থোইবী, খম্বা ও থোইবী প্রভৃতি উপাখ্যানের মধ্যেই স্পষ্ট। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের স্মৃতি যতই প্রাচীন হউক মণিপুরীদের অন্তর হইতে তাহা কোনদিনই মুছিয়া যায় নাই। পামহৈবার পিতা রাজা চরাইরোংবা শান্তিদাসের আগমনের বহু পূর্বেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরে আরও পূর্ববর্তী রাজা খাগেম্বা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির আজও গরীবনিওয়াজের বহু পূর্ব হইতেই মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের অস্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তার সাক্ষী দিতেছে। *

* Ref :— Bojoy Punchali— M. Jhulan Singh ; Advanced History of India—Majumdar, Roychoudhury & Dutta; A History of Assam—Gait ; Report on the Eastern Frontier of British India—Capt. R. Boileau Pemberton (1835); Manipur Sanatan Dharma—Atombapu Sharma ; Administration Report—1934-35—G. P. Stewart, I. C. S., President Manipur State Darbar ; Indian Philosophy—Radha Krishnan ; Vaisnava Faith and Movement—S. K. De ; History of Mediaeval India—Ishwari Prasad.

(ছয়)

গৃহবিবাদ ও বৈদেশিক আক্রমণ

গরীবনিওয়াজের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম ছিল শ্যাম সা। এই শ্যাম সা'র গৌর সা এবং চিংথংখোম্বা (জয় সিংহ) নামে দুই পুত্র ছিল। মহারাজের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে অজিত সা, নুন সা, তোং সা, সব্যসাচী, ভরত সা এবং শত্রুঘ্ন সা এই ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল। গরীবনিওয়াজের জীবিতকালেই অজিত সা'র সিংহাসন লাভ এবং তাঁহার চক্রান্তে পিতা গরীবনিওয়াজ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যাম সা'র মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অজিত সা'র রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে পিতার বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্রের কথা রাজ্যে জানাজানি হইয়া যায়। এদিকে ভরত সা নিজের দল পুষ্ট করিয়া একদিন অজিত সা'কে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সহোদরের রক্তপাতের কলঙ্ক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। নিরুপায় অজিত সা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কাছাড় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেণ। প্রজাদের সম্মতিক্রমে ভরত সা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পর মণিপুরের অধীন প্রায় ৩১ জন সামন্ত রাজা মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে শ্যাম সা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌর সা'কে মণিপুরের রাজা নির্বাচিত করেন। অনুমান ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌর সা সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌর সা নিজে খোঁড়া ছিলেন, সেইজন্য রাজকার্যে সাহায্য করিবার জন্য আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিংথং খোম্বাকে (Chinthangkhomba) নিযুক্ত করেন। কার্যত চিংথংখোম্বাই

শাসন ব্যাপারে সর্বেসর্বা রহিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে গৌর সা'র মৃত্যুর পর মণিপুরের সিংহাসনে চিংথংখোম্বার দখল পাকাপাকি হইল।

জয়সিংহ (অথবা চিথাংখোম্বা, ভাগ্যচন্দ্র, কর্তা)

১৭৬৪ হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ।

জয়সিংহ গরীবনিওয়াজের পৌত্র। মণিপুরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নৃপতিগণের মধ্যে গরীবনিওয়াজের পরই জয়সিংহের স্থান। তাঁহার ন্যায় কৌশলী, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ বীর নৃপতি মণিপুরের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। 'কর্তা'র বীরত্বের এবং জনপ্রিয়তার নানা কাহিনী মণিপুরীদের মুখে মুখে এখনও চলিয়া আসিতেছে। মণিপুরের রাজকুমার এবং রাজকুমারীগণ তাঁহারই বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করেন। এই কর্তার সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে ইতিহাস হিসাবে গ্রহণ করা না গেলেও উহাদের মধ্যে ইতিহাসের মসলা যে বিন্দুমাত্রও নাই একথা জোর করিয়া বলা যায় না। কথিত আছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌর সা'র রাজত্বকালে তিনি একদিন রাজার অবর্তমানে কংলায় আরোহণ করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একমাত্র রাজা ব্যতীত আর কাহারও কংলায় আরোহণ করার অধিকার নাই। কনিষ্ঠের এই আচরণ রাজার কানে যাওয়ায় তিনি জয় সিংকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। জয়সিং তাহার মাতুল মোইরাংএর দলপতি খেলেইন্থুংনাং তেলহেইবার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। রাজা জয়সিংকে

হত্যা করিবার জন্য উক্ত মাতুলকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেন। তাঁহাদের এই দুরভিসন্ধি টের পাইয়া জয়সিং নাগার ছদ্মবেশে মারামের পথে থিগোমৈ (বর্তমান কোহিমা) আসেন। সেখান হইতে হিড়ম্বাপুরে তাঁহার পিসা রামনারায়ণের প্রাসাদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তেখাও (Tekhao) রাজ্যে গমন করেন। মণিপুরীরা আসামকে তখন তেখাও বলিত। কিন্তু শত্রু সেখানেও তাঁহার পশ্চাৎ ধাওয়া করিল। তেখাও রাজ স্বর্গদেব * তাঁহার বন্য হস্তী বশীভূত করার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় এবং সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপ কৌশল এবং বীরত্বের জন্যই তাঁহার নাম হয় জয়সিং। কিছুদিন পর তিনি 'কুকীর' ছদ্মবেশে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে মোইরাং এবং পরে বিষ্ণুপুরে আসেন। লোকে তখন তাঁহার কথা ভুলে নাই। ক্রমশঃ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ায় দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পক্ষে যোগ দিতে থাকে। কিন্তু কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার পূর্বেই রুগ্ন গৌর সা'র মৃত্যু হওয়ায় জয়সিং অনায়াসেই কংলায় আরোহণ করিয়া মণিপুরের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন।

গরীবনিবাজের মৃত্যু এবং রাজপুত্রদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে মণিপুর রাষ্ট্রের শক্তি অনেকাংশে খর্ব হইয়া যায়। এই সুযোগে ব্রহ্মদেশের বাহিনী বিভিন্ন সময়ে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা চালায়। বস্তুতঃ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ান্দাবো চুক্তির (Treaty of Yandabo) কাল পর্যন্ত মণিপুরের

---

* আমাদের নৃপতিগণ স্বর্গদেব (স্বর্গদেও) উপাধি ধারণ করিতেন।

ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হইতেছে ব্রহ্মবাহিনীর আক্রমণ এবং তাহা প্রতিহত করার চেষ্টা। জয়সিংহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ এবং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পর পর দুইবার ব্রহ্মের সৈন্য কর্তৃক মণিপুর আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলোম্প্রা (Alompra) অথবা আলাউঙ্গপায়া (Alaungpaya) নামক উত্তর ব্রহ্মের কোন দোলপতি উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মজয় করিয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ দক্ষিণ-পূর্বে শ্যাম এবং পশ্চিমে মণিপুর পর্যন্ত হানা দেয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে আলোম্প্রার এক আত্মীয়ের পরিচালনায় ব্রহ্মসৈন্য মণিপুরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধ্বংসকার্য সম্পাদন করে। আজও এই 'কুলথাকাহালবা' (Koolthakahalba) অথবা প্রাথমিক ধ্বংসলীলার কথা মণিপুরীদের মনে দুঃস্বপ্নের মত জাগিয়া আছে। ব্রহ্মবাহিনীর এই আকস্মিক বিজয়ের মূলে ছিল তাহাদের ব্যবহৃত আগ্নেয় অস্ত্র। মণিপুরের অস্ত্রাগারে তখনও আগ্নেয় অস্ত্র প্রবেশ করে নাই; দা, বর্শা, তীর ধনুকই ছিল সেখানকার প্রধান সমরোপকরণ। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আলোম্প্রা স্বয়ং সসৈন্যে মণিপুরের সামন্ত রাজ্য শান (Shan) এবং পরে কাবো (Kubo) দখল করিয়া আইমোল (Imole) গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পালেল (Palel) অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তৎকালীন রাজা ভরত সা পরিচালিত মণিপুরের সৈন্য এই স্থানে তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু মণিপুরের রাজধানীতে ১৩ দিন থাকার পরই পেগুদের (Peguers) বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়। এ যাত্রায় ব্রহ্মের সৈন্য

চলিয়া গেলেও কাবো (Kubo) সমেত মণিপুর রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের অনেকাংশ ব্রহ্মের অধীনে রহিয়া গেল। ইতিপূর্বে কাবো উপত্যকা বরাবরই মণিপুর রাষ্ট্রের অধীন ছিল।

পিতৃহন্তা অজিত সা আলোম্প্রার অভিযানের দুই বৎসর পূর্বেই ভরত সা কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া কাছাড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। মণিপুর রাষ্ট্র ব্রহ্মের হাস্তে এইরূপ পর পর দুইবার পর্যুদস্ত হওয়ায় তাঁহার মনে হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের বাসনা জন্মে। কিন্তু অপর কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাঁহার এই আশা ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য তিনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে অবস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী মিষ্টার ভেরেলষ্টের (Mr. Verelst) সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে জানান যে তাঁহার ভ্রাতাগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে অন্যায়ভাবে মণিপুরের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরেজের সাহায্য পাইলে তিনি সেই সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। এইরূপ আবেদনে ভেরেলষ্ট সাহেব প্রথমে তাঁহার প্রতি কিছু সদয় হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গৌরসার ভাই জয়সিংহ তখন ভাইএর নামে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে অজিত সার যোগাযোগের খবর পাইয়া তিনি অবিলম্বে ভেরেলষ্ট সাহেবের নিকট পিতৃব্য অজিৎসার অপকীর্ত্তির কথা সবিস্তারে নিবেদন করেন। তৎকালীন ত্রিপুরার অধিপতিও জয়সিংহের বিবরণ সমর্থন করিয়াছিলেন। ফলে অজিৎসার সম্বন্ধে ভেরেলষ্ট সাহেবের মত পরিবর্তিত হয়। ইহার

পর অজিত সার সঙ্গে ইংরেজের আর কোন চিঠি পত্রের আদান-প্রদান হয় নাই।

ব্রহ্ম রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধিতে ভারতের ইংরেজ প্রতিনিধিগণও কিছু বিচলিত হইয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের প্ররোচনায় ইরাবতী মোহনায় নেগ্রাইজ (Negrais) দ্বীপে অবস্থিত ইংরেজ ব্যবসায়িগণ বর্মিদের দ্বারা নিহত হওয়ায়, ইংরেজ সরকার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এইসময় জয়সিং অজিৎসার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইংরেজের সাহায্যে ব্রহ্মকর্তৃক অধিকৃত মণিপুরের অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য চট্টগ্রামে অবস্থিত ভেরেলষ্ট সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালান। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে মণিপুরের রাজদূত শ্রীহরিদাস গোস্বামী চট্টগ্রামে মণিপুর রাজের পক্ষে প্রথম ইঙ্গ-মণিপুর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিপত্রে সর্ব-শুদ্ধ ৯টি সর্তের উল্লেখ দেখা যায়। সর্ত অনুযায়ী ইংরেজসরকার ৬ কোম্পানী সৈন্য দিয়া ব্রহ্মের দখলে মণিপুরের অংশ পুনরুদ্ধারে প্রতিশ্রুত হয়। স্থির হয় মণিপুররাজ উক্ত সৈন্যের ব্যয় এবং ক্ষতি মণিপুরের স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা শোধ করিবেন; কোন পক্ষই অপরের অনুমতি ভিন্ন ব্রহ্মের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবে না; পরস্পব পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের কোন বাধা নিষেধ থাকিবে না; উপরন্তু মণিপুর-রাজ তাঁহার রাজধানীতে ইংরেজের কুঠি (Factory) নির্মানের জন্য যথোপযুক্ত নিষ্কর ভূমি দান করিবেন; মণিপুরের হৃত অঞ্চল

পুনরুদ্ধার হওয়ার পর মণিপুর-রাজ তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্য দিয়া ইংরেজের সঙ্গে চীনের ব্যবসা বাণিজ্যেব সুবিধা করিয়া দিবেন।

চুক্তি অনুযায়ী চট্টগ্রাম হইতে কোম্পানীর একদল সৈন্য বঙ্গের পূর্ব সীমান্ত পথে ৪ মাসের রাস্তা অতিক্রম করিয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাছাড়ের রাজধানী খাসপুর (Cassspur) আসিয়া পৌঁছে। তখন বর্ষাকাল, সেইজন্য মণিপুরের দিকে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। স্বয়ং ভেরেলষ্ট এই বাহিনীর নায়ক ছিলেন। খাসপুরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তিনি সৈন্যদল বরাক নদীর বাম তীরে জয়নগর পরগণায় বর্তমান বদরপুরের নিকট স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজের সঙ্গে বাংলার নবাব মীরকাসিমের যুদ্ধ বাধায় ভেরেলষ্ট সাহেবের উপর অবিলম্বে বাহিনীসহ চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসার আদেশ হয়। সুতরাং সেবারের মত তাঁহাকে মণিপুরে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।

এদিকে মণিপুরের রাজদূত হরিদাস গোস্বামী চুক্তিপত্রসহ যথাসময়েই মণিপুরে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে ইতিপূর্বেই সাময়িকভাবে জয়সিংহের কর্তৃত্ব লোপ পাইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় ইংরেজ সৈন্য যখন খাসপুরে আসে তখন মণিপুর রাজদরবার হইতে ভেরেলষ্ট সাহেব কোন সাড়াশব্দ পান নাই। এক বৎসর পর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে গৌর সা'র ৩ জন দূত চট্টগ্রামে ভেরেলষ্ট সাহেবের নিকট আসিয়া জয়সিং কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিতে মণিপুর রাষ্ট্রের অনুমোদন জানায়।

তাহারা এই সঙ্গে জানায় যে ব্রহ্মের আক্রমণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় মণিপুরের পক্ষে বৃটিশ সৈন্যের খরচ বাবদ অর্থ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া সম্ভব হইবে না। মণিপুর রাজ তাঁহার দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা উক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক। গত বৎসর বৃটিশ সৈন্যের খাসপুর পর্যন্ত যাওয়ার ফলে যে ব্যয় হয়, তাহাও তিনি উক্ত উপায়ে শোধ করিতে সম্মত হন। চুক্তি পালনে মণিপুররাজের আগ্রহ এবং সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার পক্ষে তাঁহার দূতগণ ইংরেজ সরকারকে সেই সময়ই ৫ শত মেক্‌লে স্বর্ণমুদ্রা (500 Meckle Gold Rupees) প্রদান করেন। তখন একটী মেক্‌লে স্বর্ণ মুদ্রার দাম ছিল ১২৲ টাকা। কিন্তু এই চুক্তির পরই মণিপুরের সঙ্গে ইংরেজের যোগসূত্র পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে গৌর সা'র মৃত্যুর পর জয়সিংহের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এবারে রাজশক্তি ও রাজসম্মানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌর সা কর্তৃক জয় সিংহের পদচ্যুতি সম্পর্কে মণিপুরে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলদ্বারাও সমর্থিত হইতেছে দেখা যায়। কোম্পানীর দলিলসমূহের হিসাবমত দেখা যায়, জয়সিং ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের কোন সময় হইতে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত অন্ততঃ ১॥ হইতে ২ বৎসরের জন্য মণিপুরের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মণিপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন বেশী দিন পূর্বে হয় নাই। মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যেও আজ পর্যন্ত কেহই ভারত সরকারের

মহাফেজখানায় রক্ষিত ঐতিহাসিক দলিলপত্রের অনুসন্ধান করেন নাই। সেই জন্য মণিপুরে প্রচলিত এই কাহিনী কোনরূপ লিখিত বিবরণের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া পুরুষপরম্পরাক্রমে ঐতিহাসিক সত্য-কেই পরিবেশন করিতেছে।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জয় সিং সিংহাসনে আরোহণ করিলেও নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ তাহার ভাগ্যে ছিল না। ১৭৬৪ হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ৩ বার সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সিংহাসনে আলোম্প্রার (Alompra) উত্তরাধিকারী সিন্-ব্যুঁ-সিন্ অথবা সেম-বিউ-গুয়েন (Hsin-byu-shin or Shembewgwen) মণিপুরে প্রবেশ করিয়া মণিপুর সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। জয়সিং মণিপুর ছাড়িয়া কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী সৈন্যের হস্তে মণিপুরের অধিবাসীদের লাঞ্ছনার একশেষ হয়। ব্রহ্মের এই অভিযানে জয়সিংহের মাতুল, মণিপুরের বিভীষণ খেলেই ঙ্গংনাং তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়সিং পরে সিংহাসন অধিকার করিয়া এই গৃহশত্রু এবং মোইরাং অঞ্চলে তাহার সমর্থক-দিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। সিন-ব্যুঁ-সিন, ওয়াং-খাইময়ুম এরিংবা (Wangkheimayum Eringba) নামক মণিপুরের রাজবংশের এক রাজকুমারকে ব্রহ্মের সামন্ত রাজারূপে মণিপুরের সিংহাসনে বসাইয়া নিজ দেশে চলিয়া যান।

আসামের ইতিহাস টুংখুঙ্গিয়া বুরঞ্জীতে (Tung khungia Buranji) দেখা যায় স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের রাজত্বকালে (১৭৫১ —১৭৬৯ খৃঃ অব্দ) ১৬৮৫ শকের পর (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর'

মাসের পর) কোন সময়ে মণিপুরের অধিপতি জয়সিং ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক নিজদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়সিং এবং কাছাড়ের রাজা উভয়ে একযোগে কীর্তিচন্দ্র বড়বড়ুয়ার মারফত স্বর্গদেবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আসামে তখন শদিয়া হইতে কোলিয়াবড় (Koliabar) পর্যন্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং সেনাপতিকে বড়বড়ুয়া বলা হইত। স্বর্গদেব তাঁহাদের ইচ্ছা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে রাজদরবারে লইয়া আসিবার জন্য বড়বড়ুয়াকে অনুমতি করেন। সেই অনুসারে তিনি ১৬৮৬ শকের আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করিয়া রাহা (Raha) অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া মণিপুর-রাজ জয়সিং এবং কাছাড়ের ডেকাবাজাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর পাঠান। জয়সিংহের সঙ্গে তখন তাঁহার পুত্র যুবরাজ অনুপানন্দও ছিলেন। যথাসময়ে রাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকাপথে বড়বড়ুয়া রাজধানী রংপুর পৌছিয়া স্বর্গদেবকে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ দেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে স্বর্গদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বড়বড়ুয়া বলেন "মণিপুরের রাজাগণ অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর। ইহারা যে ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমি আশা করি আপনি মণিপুরের অধিপতি জয়সিংহের কন্যা কুরঙ্গনয়নীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন।" বড়বড়ুয়ার অনুরোধে স্বর্গদেব বিবাহে সম্মত হইলেন। মহাসমারোহের সহিত বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এইস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে 'বিজয়-পাঞ্চালী'র লেখক রাজকুমারী কুরঙ্গনয়নীকে জয়সিংহের কন্যা না

বলিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌর সা'র কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত লেখকের বিবরণে দেখা যায় জয়সিং গৌর সা'র কন্যাকেই আপন কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বর্গদেবের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন। জয় সিংহের পক্ষে এইরূপ লুকোচুরি করার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জয়সিংহের কন্যার সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। বৃদ্ধবয়সেও তিনি তাঁহার একটি কন্যাকে ত্রিপুরার রাজা রতনমাণিক্যের হস্তে সমার্পণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে আসামের রাজা স্বর্গদেবের হস্তে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি থাকার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কুরঙ্গনয়নী নিজের গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্গদেবের 'প্রধানা মহিষী'র পদে উন্নীতা হইয়াছিলেন। ১৬৯১ শকে স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর মাওমার নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা রাঘ মরাণ যখন রংপুর দখল করিয়া পরবর্তী রাজা লক্ষ্মী সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করে তখন এইকুরঙ্গনয়নীই কৌশলে রাঘকে হত্যা করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মী-সিংহকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন।

কুরঙ্গনয়নীর সঙ্গে স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের বিবাহের পর কীর্তি-চন্দ্র বড়বড়ুয়া এবং অপরাপর ডাঙ্গরিয়াগণ স্বর্গদেবের নিকট মণিপুররাজ জয়সিংকে মণিপুর পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য করিতে পরমার্শ দেন। স্বর্গদেব ইহাতে সম্মত হইয়া ভীটরুয়াল ফুকনের অধীন একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জয়সিং তাহাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে থাকেন। কিন্তু অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে নাগাদের প্রতিবন্ধকতার দরুণ অভিযান ব্যর্থ হয়। জয়সিং তাহাদিগকে পথ দেখাইতে গিয়া

নিজেই পথ ভুল করিয়া ফেলেন। ফলে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সেবারের মত আসামের সৈন্যদল ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে স্বর্গদেব, জয়সিংহের সাহায্যার্থ পুনরায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই দলের প্রধান অংশ 'রাহা'তে ছাউনি করে। অবশিষ্ট ১০ হাজার সৈন্য জয়সিংহের সঙ্গে কাছাড়ের মধ্য দিয়া মীরাপ নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখান হইতে জয়সিং একদল নাগাবাহিনী সংগ্রহ করিয়া মণিপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের সামন্তরাজাকে লাঙ্গাথেনের (Langathen) নিকট পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।

রাজা জয়সিংহের অবর্তমানে ব্রহ্মের সামন্ত রাজা ওয়াংখেই ময়ুম এরিংবা মণিপুরের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজসরকারে জয়সিংহের মাতুল বিশ্বাসঘাতক, মৈরাংএর দলপতি খেলেই নুংনাং তেল হেইবার প্রতিপত্তিও অসাধারণ বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মের রাজা সিন বুঁ-সিনের নিকট সে নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করে। এরিংবা ব্রহ্মরাজকে খুসী করার জন্য যজ্ঞোপবীত এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীক 'মালা' পরিত্যাগ করেন। জনসাধারণ তাঁহার ব্যবহারে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে মণিপুরে এক প্রবল জলপ্লাবনে প্রজাদের দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছে। এ অবস্থায় অভিষেকক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে জয়সিং আসামের সাহায্যে সিংহাসন পুনর্দখল করিয়া মণিপুরের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনেন। ওয়াংখেই ময়ুম এরিংবা বশ্যতা স্বীকার করায় জয়সিং দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বিনা

দণ্ডে মুক্তি দিয়া মণিপুরীদের কোন একটি সম্প্রদায়ের নেতারূপে মনোনীত করেন।

জয়সিং শাসনভার গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময়ে বাংলা দেশ হইতে বৈষ্ণবগুরু শ্রীরূপ পরমানন্দ ঠাকুর, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনারায়ণ চক্রবর্তি, কুঞ্জবিহারী, নিধিরাম আচার্য ঠাকুর, রামগোপাল বৈরাগী, অধিকারী কামদেব ব্রজবাসী, কৃষ্ণদাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন সময়ে আসিয়া মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তখন হইতেই রামানন্দী বৈষ্ণব মতের পরিবর্তে গৌড়ীয় মত রাজধর্মে পরিণত হয়। রাজা তাঁহার প্রাসাদে মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে কাঁঠাল কাঠে তৈরী সুন্দর শ্রীগোবিন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মন্ত্রী অনন্ত সাই মন্ত্রীময়ুম লৈকাই নিজবাড়ীতে মন্দির নির্মাণ করিয়া একই কাঠের তৈরী বিজয়গোবিন্দের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া হঙোইবম চূরা শর্ম্মা এবং কিশোরীপুত্র মন্দির নির্মাণ করিয়া যথাক্রমে মদনমোহন এবং গোপীনাথের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। রাজপ্রাসাদে শ্রীগোবিন্দের মূর্ত্তি স্থাপিত হওয়ার পর জয়সিং 'মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। মহারাজের কন্যাগণ সর্বদা শ্রীগোবিন্দের পূজা ও সেবায় রত থাকিতেন। মহারাজকুমারীদের মধ্যে সীজা লাইরোইবী (Sija Lairoibi) ভক্তি এবং সেবায় সাধনমার্গের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দই তাঁহার সংগীত এবং নৃত্যের মূল প্রেরণা ছিলেন। তাঁহার গানে এবং নাচে শ্রীগোবিন্দের প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি

ফুটিয়া উঠিত। মহারাজ জয়সিং ধ্যানে নৃত্যের এক নূতন ভাব ও ছন্দের সন্ধান পান। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা তাহার কন্যা 'মণিপুরের রাধা সীজা লাইরোইবী'র নৃত্যে সেই ভাব ও ছন্দরূপ পরিগ্রহ করে; এইরূপে অতি মনোরম 'রাসনৃত্যে'র জন্ম হয়। মহারাজকুমারী রাসেশ্বর শ্রীগোবিন্দের সম্মুখে নিজেকে রাসেশ্বরী কল্পনা করিয়া 'রাসনৃত্য' করিতেন। তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত একটি বাংলা বৈষ্ণব সংগীতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সংগীত তিনি তাঁহার প্রেমের ঠাকুরকে শুনাইতেন।

মহারাজ জয়সিংহের সুশাসনে নানাদিক দিয়া রাজ্যের সমৃদ্ধি শীঘ্রই ফিরিয়া আসে। কিন্তু ইহাই পুনরায় ব্রহ্মদেশ কর্তৃক মণিপুর আক্রমণের কারণ হয়। ১৭৬৮ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মণিপুর অন্তত চারবার আক্রান্ত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলে দেখা যায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ ব্রহ্মের সৈন্য কর্তৃক মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া উত্তরদিকে পাহাড়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া জোরহাট পৌঁছেন। সেখান হইতে কাছাড়ে যাইয়া তিনি অনেকবার সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে খেলেম্বা নামক মণিপুরের একজন রাজকুমার ব্রহ্মের সামন্ত রাজা হিসাবে মণিপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জয়সিং ব্রহ্মরাজ 'সিন-ব্যু-সিনে'র সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া মণিপুরের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার রাজত্ব কাল শান্তিতেই কাটে।

এদিকে আসামের রাজা লক্ষ্মীসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র

গৌরীনাথসিংহ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মাওমারিয়া সম্প্রদায় পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজধানী রংপুব দখল করে। রাজা গৌরীনাথ গৌহাটীতে পলাইয়া আসিয়া মণিপুব, কাছাড় ও জয়ন্তীয়ার রাজাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। মণিপুরের রাজা জয়সিং তাহার পুত্র মধুচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে আসাম রাজার সাহায্যার্থ আসেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌স্ (Captain Welsh) যখন জোড়হাটে আসেন তখন তিনি সেখানে মণিপুরের একটী অশ্বারোহী বাহিনীকে দেখিতে পান। বৃদ্ধ রাজা জয়সিং অল্পদিন যুদ্ধ করিয়াই দেশে ফিরিয়া যান।

প্রাক্ বৃটিশ যুগে মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে আসামের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক যোগাযোগ জয়সিংহের সময়ই আরম্ভ হয় এবং তাঁহার সময়ই শেষ হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মণিপুরে আসামের রাজা প্রমথসিংহ কর্তৃক ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত যে মুদ্রাটি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই প্রমথ সিংহের পরবর্তী রাজা রাজেশ্বরসিংহের সময় আসিয়া থাকিবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে নানা কারণে মণিপুর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে অথবা মণিপুরের সৈন্য অন্যান্য রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু আসামের সঙ্গে এরূপ কোন অপ্রিয় ঘটনা কোনদিন ঘটে নাই। অধিকন্তু আসাম এবং মণিপুর একে অন্যের বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লাতে একজন মণিপুরী পুরোহিতের সঙ্গে

ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন (Francis Hamilton) সাহেবের দেখা হয়। তাঁহার নিকট তিনি জানিতে পারেন যে মণিপুরে পূর্বে প্রচুর গরু এবং ঘোড়া পাওয়া যাইত ; দেশে অন্নবস্ত্রের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু বার বার ব্রহ্মদেশের আক্রমণের ফলে দেশ একেবারে ছারখার হইয়া যায়। আগের তুলনায় তখন সেখানে গরু-ঘোড়ার সংখ্যা শতকরা একটিও হইবে কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মদেশের সৈন্যকর্তৃক স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা নির্বিশেষে হত্যা এবং বন্দী'র সংখ্যা হইবে অনুমান ৩ লক্ষের কাছাকাছি। হ্যামিল্টন সাহেব ইতিপূর্বে যখন আভাতে ছিলেন তখন সেখানেও শুনিয়াছিলেন নগরীর নিকটেই বিভিন্ন বয়সের প্রায় একলক্ষ মণিপুরী স্ত্রীপুরুষকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজা জয়সিংহ সিংহাসন উদ্ধারের পর অবশ্যই রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি পূর্বের সমৃদ্ধি আর ফিরিয়া আসিল না।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে একজন ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া রাজকর্মচারিগণ কর্তৃক নিহত হয়। ধর্মভীরু রাজা এই খবর শুনিয়া রাজ্যে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে পুত্র লাবণ্যচন্দ্রকে ওরফে রবীনচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নবদ্বীপে থাকিয়া ধর্মকর্মের মধ্য দিয়া কাটানর জন্য মণিপুর হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরে তিনি আর-ও একটি মন্দির নির্মান করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টন সাহেবের সঙ্গে কুমিল্লাতে যে মণিপুরী পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তাঁহার নিকট তিনি জয়সিংহের সিংহাসন ত্যাগের পর তাঁহার সম্বন্ধে

আর-ও খবর সংগ্রহ করেন। পুরোহিতটি আগরতলা পর্যন্ত জয়সিংহের সঙ্গে ছিলেন; পরে সেখান হইতে কুমিল্লা আসেন। বৃদ্ধ রাজা জয়সিং সহজ পথে কাছাড়ের রাজধানী খাসপুর (Khaspur) হইয়া না আসিয়া দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত আরও দুর্গম পথে ৭শত লস্কর এবং ৩শত মোট বাহক সহ ঘোড়ায় চড়িয়া শ্রীহট্টে পৌছেন। তখন কাছাড়ের রাজার সঙ্গে তাঁহার মনকষাকষি চলিতেছিল। আথিক অবস্থা-ও তেমন সচ্ছল ছিল না। ত্রিপুরার রাজা রতন মাণিক্য তাঁহার পথ খরচ বহন করেন। তিন পুত্র এবং সীজা লাইরোইবী সহ তিন কন্যাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আগরতলা আসিয়া জয়সিং একটি কন্যাকে রাজা রতনমাণিক্যের হস্তে সমর্পণ করেন। কন্যার বিবাহের অনতি পরই তিনি সেখান হইতে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। নবদ্বীপে তখন মণিপুরের রাজাদের নিজস্ব কোন ভবন অথবা থাকিবার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। জয়সিংহ সেখানে একটি বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের নিকট দূত মারফত নিম্নোক্ত আবেদন জানান।

৭ শ্রীমোহনরামো জয়তি গঙ্গা ৫

অনুপেক্ষণীয় শ্রীভাগ্যচন্দ্র সিংহস্য—

বিনয়পূর্ব্বক সেলাম নিবেদনঞ্চ। আগে শ্রীযুত লাড সাহেবের উমর দৌলত জেয়াদা ৺করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং নিজরাজ্য মণিপুর হইতে আমি মোঃ মুরসিদাবাদে ৺স্নান করিতে আসিয়া অন্তকরণ হইল, আমার স্নান কারণ ৺তিরে এক বাটি

তৈয়ার করাই এবং সওদাগরিকারণ বড় হাতির দাঁত ও মোম আর আর হরেক জিনিষ নিজ রাজ্য হইতে মোকান মুরসিদাবাদে পাঠাই কথক জমিন না হইল বাটি কিমতে হয় মরজি হইলে মুরসিদাবাদে কলেকটর সাহেব নামে এক চিটি আমার উকিলকে হুকুম হইলে অনেক মেহরবানগী আমার মুক্তিয়ার উকিল শ্রীরাস-বিহারি দাসকে নিকট পাঠাই জে জে বিষয় রোবরো আরজ করিবে তাহাতে গৌর মেহরবানগী ফরমাইলে আমা প্রীতি অনুগ্রহ প্রকাশ আমার উকিল মজকুরকে সবফরাজ করিয়া ত্বরায় বিদায় হুকুম হইলে বহুস মেহরবানগী লাড সাহেবের দৌলত জেয়াদার খএরাফিয়ত লিখিয়া খুসী করিতে হুকুম হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি মোঃ মুরসিদাবাদ সন ১২০৫ সাল তারিখ ২১ শে শ্রাবন —

মহামহিম শ্রীযুৎ লার্ড মারনিংটন সাহেব গবনর

জানরেল বাহাদুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেষু

মোঃ — কলিকাতা

জয়সিংহের এই চিঠি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে সেপ্টেম্বর গভর্ণর জেনারেলের নিকট পৌছে।

নবদ্বীপে জয়সিং গঙ্গাস্নান এবং বিবিধ ধর্মকর্মের মধ্য দিয়া জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া গঙ্গা তীরেই দেহত্যাগ করেন। কাহার-ও কাহার-ও মতে তিনি নবদ্বীপ হইতে নৌকা-যোগে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার পথে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভগবানগোলা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজকুমারী সীজা লাইরোইবী

পিতার মৃত্যুর পর নবদ্বীপে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও নাম কীর্তন করিয়া বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।*

*Ref: (1) Statistical Account of Manipur—1873—R. Brown. F. R. C. E. (2) Report on the Eastern Frontier of British India—1835—Capt. R. B. Pemberton (3) Assam District Gazetteers Vol. IX Naga Hills & Manipur—1905 B. C. Allen, C. S. (4) A History of Assam—Sir Edward Gait (5) An Account of Assam—Compiled—1807—1814 by Francis Hamilton. (6) Bejoy Punchali—M. Jhulon Singh. (7) Tungkhungia Buranji (8) Kachar Buranji (9) published Progs Vol. 1762 Page 232—4 (10) Notes on the Early History of Manipur—A. F. M. Abdul Ali, M. A. (11) Report on the Archaeological Studies in Manipur—Bulletin I—W. Yumjao Singh. (12) প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন—ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন।

(সাত)

গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়

রবিনোচন্দ্র—

মহারাজ জয়সিংহের (১) সানাহাল (২) রবিনোচন্দ্র (হর্ষচন্দ্র, লাবণ্যচন্দ্র) (৩) মধুচন্দ্র (৪) তুলসীজিৎ (৫) চৌরজিত (৬) মারজিত (৭) দাওজী (খোংজাইঙাম্বা) (৮) গম্ভীর সিং — এই আটজন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। পিতার জীবদ্দশায়ই সানাহালের মৃত্যু হয়। জয়সিং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রবিনোচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়া নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় হইতে প্রথম বৃটিশ-ব্রহ্মযুদ্ধ পর্যন্ত মণিপুরের ইতিহাস গৃহযুদ্ধের কালিমায় লিপ্ত। রাজভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। দাওজী ও গম্ভীর সিং গোপনে তাহাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রথম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রবিনোচন্দ্র মাত্র ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে একদিন পলো খেলার পর মাঠ হইতে ফিরিবার সময় আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন।

মধুচন্দ্র—

রবিনোচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র ৩য় পুত্র মধুচন্দ্র ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া সিংহাসন দখল করেন। গম্ভীরসিংহের দল তাহাদের এই ব্যর্থতায় নিরস্ত না হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। মধুচন্দ্র নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিবার জন্য চৌরজিতকে যুবরাজ এবং মারজিতকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেন। ইহাতেও রাজ্যের সংহতি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। যুবরাজ

চৌরজিত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। মণিপুর হইতে নির্বাসিত অবস্থায় কিছুদিন নবদ্বীপে বাস করার পর কয়েক শত সৈন্য লইয়া ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মণিপুরে প্রবেশ করেন। মহারাজ মধুচন্দ্র স্বয়ং তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পারিবারিক কলহের ফলে সেনাপতি মারজিত এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মহারাজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া চৌরজিতের পক্ষে যোগ দিলেন। ফলে সাঙাইথেলের (Sangeithel or Sangaithen) নিকট যুদ্ধে মহারাজ মধুচন্দ্র পরাজিত হইয়া কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

চৌরজিত—

চৌরজিত শূন্য সিংহাসন দখল করিয়া মারজিতকে যুবরাজ ও সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেন। এদিকে মধুচন্দ্র কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। মধুচন্দ্র পরিচালিত কাছাড় সৈন্য বিষ্ণুপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মহারাজ চৌরজিত সেনাপতি মারজিতকে মধুচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেণ। বিষ্ণুপুরের নিকট যুদ্ধে মধুচন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু ইহার পরও রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া আসিল না। কিছুদিনের মধ্যেই যুবরাজ মারজিত সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যে মহারাজ চৌরজিতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে ব্যর্থকাম হওয়ায় তিনি টামুতে (Tummo) পলাইয়া গিয়া আভার রাজদরবারে ব্রহ্মদেশের নরপতি বোদপায়ার (Bodawpaya —1779-1819) নিকট দূত মারফত সাহায্যের আবেদন করেন।

ব্রহ্মরাজের প্রতিনিধি মহারাজ চৌরজিতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া সাময়িকভাবে এই ভ্রাতৃ বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেন। চৌরজিত মারজিতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় পূর্ব পদে বহাল করেন। তথাপি তাহার অন্তর হইতে সিংহাসনের লোভ দূর হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজধানীর উপর পর পর দুইবার আক্রমণ চালান। কিন্তু দুইবারই ব্যর্থকাম হইয়া কাছাড়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। তাহার সঙ্গে তখন অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে পলো খেলার নিপুণ একটি প্রসিদ্ধ ঘোড়া ছিল। এই ঘোড়াটির প্রতি তৎকালীন কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ে। এই প্রবন্ধে নিম্নে উল্লেখিত শ্রীহট্টের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত মারজিত সিংহের একটি পত্রে প্রকাশ যে তিনি কাছাড়ের রাজা ও তাহার ভাইকে চারিটি ঘোড়া উপহার দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা মারজিতের নিকট হইতে আরও ৭টি ঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এলেন সাহেবের মতে (B. C. Allen, Assam District gazetteers, Vol. I, Cachar PP. 25—26) গোবিন্দচন্দ্র প্রথমে ন্যায্য মুল্য দিয়া মারজিতের ঘোড়া খরিদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মারজিত আপোষে ঘোড়া দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি তাহা কাড়িয়া লইলেন। এই বিবরণের সহিত মারজিতের চিঠিতে উল্লেখিত বিবরণের অনৈক্য দেখা যায় না। বিশেষ একটি ঘোড়ার প্রতি লোভ থাকিলেও ছিনাইয়া লইবার সময় গোবিন্দচন্দ্র হয়ত একাধিক ঘোড়া লইয়া থাকিবেন।

অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ মারজিত প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া সাহায্য লাভের আসায় আরাকানের পথে ব্রহ্মদেশের রাজধানী আভা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি প্রায় ৬। ৭ বৎসর ছিলেন। বহু আবেদন নিবেদনের পর ব্রহ্মদেশের রাজা বোদপায়া (Bodawpaya) ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন। সাহায্যের সর্ত অনুসারে মারজিত কাবো উপত্যকার (Kubo Valley) উপর মণিপুরের দাবী ছাড়িয়া দিতে এবং ব্রহ্মের সামন্ত রাজা হিসাবে মণিপুর শাসন করিতে সম্মত হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে মারজিত সিং এবং সামজোক রাজার (Sumjok Rajah) পরিচালনায় ব্রহ্মদেশের দুইদল সৈন্য টামু হইতে যথাক্রমে আইমোল (Imole) গিরিবর্ত্ম এবং মুচী পথে (Muchee route) মণিপুরে প্রবেশ করে। চৌরজিতের ভ্রাতুষ্পুত্র পীতাম্বর সিংহের পরিচালনায় মণিপুরের সৈন্য হীরকের (Heerok) নিকট সামজোক রাজাকে নিহত এবং তাহার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া কাকচীংএর (Kakching) দিকে অগ্রসর হন। সেখানে মারজিত সিং কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সঙ্গে ক্রমাগত ৫ দিন যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া তিনি কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মহারাজ চৌরজিত সিংহ ভ্রাতা গম্ভীর সিংহের সঙ্গে মণিপুর ত্যাগ করিয়া কাছাড়ে চলিয়া যান। মণিপুর তখন মারজিতের পদানত হয়।

রাজ্যহারা চৌরজিত—

মণিপুরের রাজারা নির্বাসনেও চুপ করিয়া থাকিতেন না।

মহারাজ চৌরজিত কাছাড়ে থাকিয়াও সিংহাসন উদ্ধারের জন্য নানা ফন্দিফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। ইংরেজের সঙ্গে ব্রহ্মরাজের সম্পর্ক ভাল ছিল না, এমন কি যুদ্ধও বাধিতে পারে এইরূপ সংবাদ ইতিপূর্বেই তিনি কাছাড়ের পরলোকগত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইয়া এইরূপ কোন সুযোগে ইংরেজের নিকট হইতে সাহায্য লাভের আশায় ইংরেজ সরকারের নিকট নিম্নোক্ত চিঠি লিখেন :—

শ্রীহরি

৭৶ স্বস্তি……………শ্রীশ্রীযুত কর্ণকটা বরসাহেবর…………

…পরম প্রচণ্ড প্রতাপেষু নিবেদন পূর্ব্বক প্রেষিত চৈত্রস্য রুদ্রদিন জেয়ং……সমাচার শ্রীযুত পিতৃদেব মহারাজা বর্ত্তমানাবধি মোঁ সুবু রাজার* সঙ্গে বিরোধ মত চলে ৺ঈশ্বর কৃপাতে আমাদের নৃপাভিষেকের পশ্চাৎ সেই রাজা ধর্ম্মের নিমিত্তে সন্ধি করিতে পত্র সমেত ভদ্রলোক পাঠাইতেছি আমিও ধর্ম দেখিয়া মানিলাম তদবধি প্রীতিমত চলিয়াছি পঞ্চত্রিংশদধিক সপ্তদশ শাকেতে শ্রীযুত কর্ণকাটা বরসাহেবর আমাকে মিলিতে চাই ইথমিবধ পত্র সমভ্যারি মদীয় শ্রীখুড়া ভদ্র সিংহকে পাঠাইলাম। আমিও তদনুরূপ করিতে ৫ পাঁচ দিন মুকামেতে

* (চিঠিতে উল্লিখিত 'মোঁসুবু রাজা' হইতেছেন তৎকালীন ব্রহ্মের রাজা। 'ব্রহ্মের শেষ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলংপায়ার জন্মস্থান ও রাজধানী শোয়েবো (Shwebo) নগরের প্রাচীন নাম মোক সোবমিয়ো (Moksobomijo)-র মণিপুরী অপভ্রংশ। অথবা শোয়েবোর সমীপবর্ত্তী মুনদীর যোগে মুশোয়েবো?"

আসিয়া রহিয়াছেন তত্রচ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর ভাই হেড়ম্বেশ্বর সঙ্গে শ্রীবরসাহেবর মিলিয়া পেগু সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে যে যে পরামর্শ করিয়াছেন সেই কালক্রমে সর্গ প্রাপ্তি হৈয়াছে অতএব আমিও পুনশ্চ দেশে যাত্রা সে উদ্যম করিতে চাই অতএব লিখি আপনার যদি আমারদিগে যথচিত প্রীতি থাকে তবে যতকিঞ্চিৎ সাহায্য করি দিবেন আর বিশেষ সেই দেশেতে আপনাকার মনস্ত থাকেন একত্র হৈয়া যদ্ধ করিলে বর বিশেষ হই আইতে যাইতে নাগা কুকিতে আমিও যথাশক্তি সাহাজ্য করি দিব শ্রীবলরাম সিংহের প্রমুখাৎ বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিবেন কিমধিকং বিজ্ঞবরেষু সন ১৭৩৬ তারিখ ৯ চৈত্রস্য লিপিরিয়ং·· ••••••

উপরোক্ত পত্রের মর্মার্থ অনুযায়ী দেখা যায় ব্রহ্মদেশের রাজার সঙ্গে চৌরজিতের পিতা স্বর্গগত মহারাজ জয়সিংহের বিরোধ ছিল। চৌরজিত যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ব্রহ্মরাজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হয়। ১৭৩৫ সকে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) চৌরজিত তাহার খুড়া ভদ্রসিংহের মারফত গভর্ণর জেনারেলের নিকট এক পত্রে ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজেও গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে এ বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে আলোচনার জন্য রাজধানী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময় ব্রহ্মের সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করায় তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। বর্তমানে দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত সৈন্য কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হওয়ায় তাহাকে কাছাড়ে বাস করিতে হইতেছে। সেইজন্য তিনি বলরাম সিংহের মারফত উপরোক্ত

চিঠিতে ইংরেজ সরকারকে জানাইতেছেন যে—ইংরেজের সাহায্য পাইলে তিনি নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্ভাবিত বৃটিশ-ব্রহ্মযুদ্ধে তিনি তাহার নাগা ও কুকি সৈন্য দিয়া ইংরেজকে সাহায্য করিতে পারেন।

এই পত্র প্রেরণের অব্যবহিত পরই দেখা যায় চৌরজিতের সঙ্গে কাছাড়ে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মনোমালিন্য হওয়ায় চৌরজিত জৈন্তিয়ার রাজা ২য় রামসিংহের আশ্রয়ে যাইয়া কাছাড়ের সীমান্তে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন। গোবিন্দচন্দ্র শুনিলেন যে জৈন্তিয়ার রাজা অবিলম্বে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। গভর্ণর জেনারেলের নিকট গোবিন্দচন্দ্রের চিঠিতে উপরোক্ত ঘটনার যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়। চিঠিতে গোবিন্দচন্দ্র লিখিয়াছেন —"পূর্বে মণিপুরেশ্বর শ্রীযুত চৌরজীত সিংহ রাজা আপন ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধক্রমে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমার রাজ্যে আসিয়া আমার নিকট দরখাস্ত দিয়াছিলেন আমী অনুবল দিবার তিনি পুনরায় যাইয়া মণিপুর রাজ্যে চড়াহি করিবার তাহাতে উভদিগে (উভয় দিকে অর্থাৎ চৌরজিত এবং মারজিত উভয়ের সঙ্গে) সমান সসম্পর্ক প্রযুক্ত (সমান সম্পর্ক থাকায়) অনুবল দেওয়া গেল না এই বিষয় আমাতে অপরিতোষিত হইয়া জয়ন্তীপুরে রাজার নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে একতা পাইয়া আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন সম্প্রতি জয়ন্তীপুরের রাজা আমার রাজ্যের পরগণে কালাইন মৌজে তেরাপুর আমার পুরুষানুক্রমে কাবিজ মিরাস সাওাদেও যাইয়া বলিয়াছেন এই পর্যন্ত তিনি

দখল করিবেন তাহা আমল করিবার সয্য সন্ধান করিতেছেন অবশ্য আমার রাজ্যে চড়াহি করিবেন এই বিষয় লিখি পূর্বে মদগ্রজ মহারাজা আপনার নিকট দরখাস্ত দিয়াছিলা আমার রাজ্যে অন্য বিরুদ্ধ লোকে আসিয়া চড়াহি করিতে মেহেরবাণী করিয়া মদত দিবার তাহাতে অনুগ্রহ বাসনাতে জিলা শ্রীহট্টের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল সময়ানুসারে শিপাহিলোক দিয়া মদত করিবার সিপাহিয়ানের তলপ আমার নিজ হইতে দিবার এই বিষয় লিখি আপনে মুরব্বী আমি আপনাতে শরনাগত আশ্রিত বাই অনুগ্রহ বাসনা প্রর্বক অবশ্য পঁচিশ ২৫ জনা শিপাহিলোক আমার নিকট পাঠাইতে জিলা শ্রীহট্টের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হবে এই বিষয় আপনার দিগের অখণ্ড প্রতাপানুগ্রহ আমাতে ব্যক্ত হইলে আমার দিগের বিরুদ্ধ লোক নিরস্ত হবে আপনার অনুগ্রহ মাত্র ভবসা বিশেষ কি লিখিব অবশিষ্ট সমাচার কালীদাস বন্দোপাধ্যায় ও সুকদেব রামদাসের বাচনিকক্রমে গোচর হবে······শক ১৭৩৭ সাল বতারিখ মাসে ১৭ কার্তিক”—গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক গভর্ণর জেনারেলের নিকট ১৭৪০ শক বৈশাখ মাসের ৭ই তারিখ লিখিত পত্রে জানা যায়। “·· ···সম্প্রতি মণিপুরের মাজুল রাজা শ্রীচৌরজিত সিংহ তাহান ভ্রাতা শ্রীমারজিত সিংহ রাজার সহিত রাজত্ব বিশয় আখেজ করিয়া পরাভূত হৈয়া আমার দেষে আসিয়া মদ্দ চাহিয়া ছিলেক তাহা না দেওয়াতে মনোজস্ত হৈয়া দেশ বিদেস ভ্রমণ করিয়া মোকান কলিকাতা গীয়া হুজুরে দরখাস্ত করিয়াছিলেক তাহাতে হুজুরে না মঞ্জুর হওযাতে শ্রীহট্ট মোকাম হৈয়া জএন্তাপুরের রাজার সরহদ্দে রহিয়াছিলেন

তাহাতে ৩ পৌষ ঐ মারজিত সিংহ রাজা আকস্মাত অনেক ফৌজ সহিত আসিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করাতে শ্রীমে কেরি সাহেব যুদ্ধ করিতে জানেন না কারণ লজ্জিত হৈয়া পিছে হটীয়া আমাকে না কহিয়া গেলেন পরে আমার সেনাপতি শ্রীগম্ভির সিংহ গত্ররহ ফৌজ সহকারে তাহার সহিত যুর্দ্ধ করিলাম তৎকালীন শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাত্বর আলিসানের সহর্দ্ধ হেফাজত কারা মোকাম শ্রীহট্ট হতে শ্রীযুত মেস্তর কাপ্তাব ডেবিসন সাহেব খানে বদরপুর পৌছিলেন পর ঐ মারজিত সিংহ রাজা পরাভুত হইয়া আপনদেশে গমন করিলেন পর ঐ চৌরজিত সিংহ বাজা ও তুলারাম ও আনন্দরামের সহিত সাদুস করি ফুন্দিয়া হৈয়া আমার সেনাপতি গম্ভির সিংহকে একতা করিয়া প্রজালোকের ঘরবাড়ি জালাইয়া মালোমাল লুট তছরূপ করিয়া রায্য অত্রবান করিতেছে এবং ঐ নমকহারাম চাকর লোকে আমার সহিত অশেষ প্রকার অধর্ম আচরণ করিতেছে সাহেবান বহি আমার অন্য আশ্রয় নাই··· · অনুগ্রহ পূর্বক আপনকার সরকার হৈতে কিঞ্চিত ফৌজ দিয়া আমার শত্রুর নির্জাতন করিবেন···আর বিষয় আমার ওকিল শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরসুন্দর চট্টোপাধ্যায় দরখাস্ত অনুসারে মেহেরবানি করিবেন··· ১৭৪০ সাল মাহে ৭ বৈশাখ।”

গোবিন্দচন্দ্রের কর্মচারীদের মধ্যে তুলারাম ও তাহার পিতা খাসাতেও ষড়যন্ত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিঠিতে গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতির নাম দেখা যায় শ্রীগম্ভির সিংহ। ইহার সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র অন্য একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন "শ্রীচৌরজিত সিংহ উহার

ভ্রাতা আমার চাকর গম্ভীর সিংহ।" ইহা হইতে বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মণিপুর হইতে গম্ভীর সিং তাহার ভ্রাতা মহারাজ চৌরজিত সিংহের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়া কাছাড় রাজার অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝিয়া চৌরজিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরাপর রাজকর্মচারীদের সঙ্গে একত্র হইয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

গোবিন্দচন্দ্র যখন দেখিলেন ইংরেজ সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না, তখন তিনি কোম্পানীর সিপাহীর আশা পরিত্যাগ করিয়া একজন "বাজে ইংরাজ" ও কিছু সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেন। উপরোক্ত পত্রের কেরিসাহেব বোধ হয় "বাজে ইংরাজ" হিসাবে কাছাড়ের সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র যখন চৌরজিত ও তুলারাম প্রভৃতির চক্রান্তে বিব্রত তখন সহসা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর মারজিত সসৈন্যে কাছাড়ে উপস্থিত হইলেন।

মারজিতের কাছাড় আক্রমণ—

১৮১২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মারজিত ব্রহ্মের সামন্ত রাজা হিসাবে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বে নির্বাসিত অবস্থায় তাহার প্রতি কাছাড়ের রাজার আচরণের কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। মণিপুর রাজ্যে তাহার ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়া তিনি কাছাড় আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কাছাড় আক্রমণ করিবার সময় কাছাড়ের প্রতিবেশী প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ

কোনরূপ ভুল বুঝিয়া তাহার বিপক্ষে না অগ্রসর হয়, সেইজন্য পূর্বাহ্নেই তিনি শ্রীহট্টের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক চিঠিতে লিখিয়া জানাইলেন "…… . .. …. . পূর্ব্বে ৺ব্রহ্মাদেশের সঙ্গে বিরুদ্ধক্রমে রাজ্য ভাবিয়া হেড়ম্ব (কাছাড়) রাজ্যে ইষ্টগোষ্টির সম্বন্ধে কএক দিবস বাসা করিয়াছিল তাতে শ্রীসন্ধিকারি হেড়ম্বেশ্বরে ৺শ্রীযুক্ত মৎ পিতৃদেব মহারাজাকে প্রাণান্ত করিয়া শ্রীধর সাহাকে রাজা বানাইতে উদ্যম করিয়াছিল আর আমাকেও রাজা শ্রীমন্তুর সঙ্গে বিরুদ্ধ কারণ স্থান ভ্রষ্ট হৈয়া অনেক দুঃখ শোকেতে হেড়ম্ব রাজ্যে আসিতেও শ্রীহেড়ম্বেশ্বর দুই ভাইকে চারিটি ঘোড়া সন্দেশ করিয়াছেন তদধিক ৭ গোট ঘোটক বিনামূল্যে বলৎকারে লুটিয়া নিলেন এজন্যে আমার চিত্তে অত্যন্ত অসন্তোষিত হৈয়া যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছি এই কারণ মাত্র জ্ঞানী হবেক আর কোন প্রকারে আপনকার সঙ্গে আমারার যৎকিঞ্চিৎ বিরোধভাব নাই……আর কোন একপ্রকারে আপনকার ক্ষোভিতান্তঃকরণ না হবেক ইহা জ্ঞানী হবেক আরই রাজ্যে পুনরায় শ্রীহেড়ম্বেশ্বর আরম্ভুত্যাদিবর্গ আসিতে অনুরোধ কারণ ১ এক ফেরেঙ্গি ঠানাদার দিতে হবেক আমিও যৎকিঞ্চিৎ অনুপযুক্ত এক গ্রামের খাজনা পৌছাই দিতে উপযুক্ত… …১৭৩৯ তারিখ ১২ পৌষ সৎলিপিঃ"

ইংরাজ সরকার মণিপুর ও কাছাড়ের এই বিরোধে নিরপেক্ষ রহিলেন, কেবল আপনাদের সীমান্তের শান্তি রক্ষার জন্য তাঁহারা বদরপুরে কাপ্তেন ডেভিডসনের সহিত একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। দুর্বল গোবিন্দ চন্দ্র পুনরায় ইংরেজ সরকারের শরণাপন্ন হইলেন।

বিপদকালে "বাজে ইংরাজ" কেরি সাহেবের দ্বারা কোন কাজ হইল না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি মণিপুরীদের ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তখনও গোবিন্দচন্দ্রের ভাগ্যে কিছুদিন রাজত্ব ছিল। মারজিতের অভিযানের সংবাদ পাইয়া চৌরজিত জৈন্তিয়া হইতে সসৈন্যে কাছাড়ের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন। কারণ মারজিত উভয়েরই সমান শত্রু। গোবিন্দচন্দ্রের সেনাতি গম্ভীরসিং-ও ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কেরি সাহেবের পলায়নে-ও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না মারজিত পরাজিত হইয়া মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন।

মণিপুরের সিংহাসনে মারজিত সিং—

১৮১২ খৃষ্টাব্দে মারজিত সিং মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মদেশের সৈন্য এবং কর্মচারীদিগকে অবিলম্বে বিদায় করিয়া দেন। তাঁহার রাজত্বের ছয় বৎসর শান্তিতেই কাটে। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেন এবং প্রাসাদ হইতে সাঙাইথেন পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। ব্রহ্মের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। চারণক্ষেত্রগুলিতে পুনরায় প্রচুর গো-মহিষ দেখা যাইতে থাকে। রাজ্যে প্রজাদের সুখ এবং সমৃদ্ধি দেখিয়া পূর্বে যে সমস্ত মণিপুরী মারজিতের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এত শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশীয় চালচলন এবং ব্রহ্মরাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য মারজিত প্রজাদের হৃদয় জয় করিতে পারিলেন না। সেই জন্য দেখা যায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি

যখন কাছাড় আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সঙ্গে এত সৈন্য ছিল যাহা দ্বারা সহজেই ঐ রাজ্য জয় করা যাইত; কিন্তু কাছাড়ের পক্ষে আগত চৌরজিত এবং গম্ভীরসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে এই সংবাদ শুনিয়া মারজিতের বাহিনীর যুদ্ধে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। বুদ্ধিমান মারজিত সৈন্যদলের মনোভাব টের পাইয়া ব্যাপার আরও দূর গড়ানব পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন। *

মারজিত ব্রহ্মদেশের সামন্ত রাজা হিসাবে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেও কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে রাজত্ব করার পর তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তখন আর ব্রহ্মরাজের আধিপত্য স্বীকার না করিলেও চলে। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মরাজের প্রতি আনুগত্য একেবারে অস্বীকার না করিলেও কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য চালাইতেন। কিন্তু তাহাতেও উভয়রাষ্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। এই অবস্থায় মারজিতের সাহস ক্রমশ বৃদ্ধির সুযোগ পায়। তিনি ধীরে ধীরে কাবো উপত্যাকায় মণিপুরের দখল পুনরায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রজাদিগকে সেখানে গাছ কাটিবার আদেশ দিলেন। ব্রহ্মদেশের রাজা বৃদ্ধ বোদপায়া (Bodawpaya) মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলে-ও এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবিধান করার তাঁহার সময় ছিল না। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোদপায়ার মৃত্যুর পর বা-গ্যী-দ (Ba-gyi-daw) ব্রহ্মের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মারজিত যখন মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া

* Ref. Sir Edward Gait—History of Assam P. 272

আভা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এই বা-গ্যী-দ'র স্থপারিশে বোদপায়া মারজিতকে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছিলেন। বা-গ্যী-দ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যাভিষেকের সময় সমস্ত সামন্ত রাজাদিগকে উৎসবে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সামন্ত নরপতি মারজিত বিনা অনুমতিতে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ব্রহ্মরাজকে এতদিন উপেক্ষা করিয়া এবং সর্বোপরি কাবো উপত্যকায় বেআইনীভাবে গাছ কাটাইয়া ব্রহ্মরাজের যথেষ্ট বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। সেইজন্য অভিষেক উৎসবে যোগদান করিতে গিয়া বিপন্ন হইতে পারেন এই আশঙ্কায় মারজিত বা-গ্যী-দ'র নিকট তাঁহার অনুপস্থিতির কারণস্বরূপ বিনীত ভাবে লিখিয়া জানাইলেন যে—তাঁহার ভাই চৌরজিত ও গম্ভীর সিং কাছাড় দখল করিয়া মণিপুরের উপর হামলা দেওয়ার জন্য ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই অবস্থায় রাজ্য ছাড়িয়া তিনি অভিষেকক্রিয়ায় যোগ দিতে পারিলেন না। নূতন রাজার নিকট এই অজুহাত কোন কাজে লাগিল না। ব্রহ্মের সঙ্গে মণিপুরের বংশানুক্রমিক শত্রুতা আবার চাড়া দিয়া উঠিল। সাম্রাজ্যলোভী বা-গ্যী-দ মারজিতের এই উপেক্ষা এবং স্পর্দ্ধা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। অচিরে বন্যাপ্রবাহের মত ব্রহ্ম সৈন্য মণিপুরে প্রবেশ করিল। মারজিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। ব্রহ্মের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মণিপুরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মারজিতের সঙ্গে কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নির্বাসিত মণিপুরের রাজাদের কাছাড় দখল

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মারজিত কাছাড় আক্রমণে বিফল হইয়া মণিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেও কাছাড়ের দুর্ভাগ্যের অবসান হইল না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর (২৯শে আশ্বিন, ১৭৪০ শক) গোবিন্দ চন্দ্র ইংরেজ সরকারকে এক পত্রে লিখিয়া জানাইলেন "মণিপুরের তুন্দিয়া শ্রীচৌরজিত সিংহে উহান ভ্রাতা আমার চাকর গম্ভীর সিংহের সহিত একতা হৈয়া রাত্রি যুদ্ধে আমাকে রাজ্য হৈতে বেদখল করাতে আমি শ্রীযুত সাহেবানকে ভরসা করি শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের সরহদ্দ মোকাম শ্রীহট্ট আসিয়াছিলাম......ত্বরিত রাহাদারি দিতে অনুমতি হবেক।"

এইরূপে চৌরজিত এবং গম্ভীর সিং কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র যখন শ্রীহট্ট হইতে ইংরেজ সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন নিবেদন করিতেছিলেন তখন মণিপুর হইতে ব্রহ্মের সৈন্যকর্তৃক বিতাড়িত মারজিত সিং সদলে কাছাড়ে আসিয়া চৌরজিতের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মণিপুর হইতে আসার সময় তিনি শ্রীগোবিন্দের মূর্তিটি-ও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে মণিপুরের রাজদণ্ডের অধিকারীগণই শ্রীগোবিন্দের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মারজিত মণিপুরের সিংহাসনের উপর তাঁহার দাবী পরিত্যাগ করিয়া চৌরজিতের হস্তে মূর্তিটি অর্পণ করেন। চৌরজিত মারজিতের পূর্ব আচরণ বিস্মৃত হইয়া, তিনভাই একসঙ্গে সমগ্র কাছাড় রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। ১৫ই বৈশাখ ১৭৪২ শকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা'র (Lord Moira)

নিকট লিখিত (২৩শে মে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত) একটি পত্রে গোবিন্দচন্দ্র উপরোক্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়া প্রার্থনা করিলেন—

"মেহেরবানি করি আমাদের মুলুক আপনকার সরকারের শ্রীহট্টের সামিলান হৈয়া আমি স্মরণাপন্ন যে প্রকারে প্রদাক্ত হয় তাহা অনুমতি হবেক এহাতেহ যদ্যপি মেহেরবানি পূর্ব্বক অনুমতি না হয় তবে অন্য সময়ে আমি একক রাজ্য রক্ষা করিতে পারি নাই কারণ আমার দেশরক্ষা করিতে পারে হেন কোন এক বাজে টুপিআলা সাহেবকে ঘুষরাজি করি আনিতে মেহেরবানি পূর্বক অনুমতি হৈবেন..." কিন্তু ইংরেজ সরকার তখন পর্যন্ত মণিপুর এবং কাছাড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত বোধ করে নাই। কাছাড় শ্রীহট্ট জেলার সঙ্গে যুক্ত করা দূরে থাক কোন "বাজে টুপিআলা সাহেব" পর্যন্ত গোবিন্দচন্দ্রের সাহায্যের জন্য পাঠান হইল না। কাছাড় মণিপুরের রাজাদের দখলেই রহিয়া গেল।

পূর্বভারতে বৃটিশ নীতি—

ইংরেজ বণিকগণ অস্ত্রের দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল না—দেশীয় নৃপতিদের রাজনৈতিক—দ্বন্দ্বে বিব্রত ভারতবাসী শান্তি এবং সুশাসনের আশায় ইংরেজের হস্তে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছিল এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্থানের যুগে ইংরেজের পররাষ্ট্রনীতি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সূত্র বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু "কুচ-

বিহার, আসাম, কাছাড় ও মণিপুরের ইতিহাস আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে এতদঞ্চলে প্রজার হিতার্থেই বৃটিশ শাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল।" মারজিত কাছাড়ে ফিরিঙ্গি থানাদার নিযুক্ত করার জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আপনার পৈতৃক কাছাড় রাজ্য ইংরেজ শাসিত শ্রীহট্ট জেলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্যার জন্ শোর যখন ক্যাপ্টেন ওয়েলসকে সসৈন্যে আসাম হইতে চলিয়া আসার নির্দেশ দেন তখন আসামের বুড়া গোহাঞি, বড় গোহাঞি, বড় বড়ুয়া প্রভৃতি নেতৃ-স্থানীয় রাজপুরুষগণ, এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বড়লাটকে সকাতরে অনুনয় করিয়া ছিলেন। তাহাদের মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে ওয়েলস সাহেব তাহার বাহিনীসহ চলিয়া গেলে তাহাদের একটি প্রাণী একদিন-ও বাঁচিবে না। "আমাদের সকলকে অনুগ্রহ করিয়া কাপ্তান ও বালিচ সাহেবকে ফৌজ সমেত থাকিয়া শত্রু দমন করি দেশটা প্রতুল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন জদ্যপি এই হুকুম না করে দেশসুদ্ধা সকলকে হুকুম করি পাঠাইবেন তোমার নিকট জাইতে তোমাদের সহায়তে দেশসুদ্ধ গোব্রাহ্মণ রক্ষা পাইয়াছি —এখন আমাদের সকল লোককে শত্রুএ নষ্ট করা উচিত নয়—"। আসামের হিন্দুসমাজের অন্যতম নায়ক বড়ফুকন কলিকাতার খড়ু সাহেব স্যার জন শোরকে ধর্ম ও সমাজের রক্ষাকর্তা 'গোব্রাহ্মণ-প্রতিপালক' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। একজন দেশীয় রাজার পক্ষে ইহার চেয়ে অযোগ্যতার পরিচায়ক আর কি হইতে পারে?

কিন্তু স্কাব জন শোর এই করুণ আবেদনেও তখন আসামে দেশরক্ষা এবং দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মের দখল হইতে আসাম উদ্ধার করার পরও তাহারা পুরন্দর সিংহের সিংহাসন কাড়িয়া লয় নাই। গোবিন্দচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কাছাড়ের সিংহাসনে প্রাচীন রাজবংশের অধিকার লোপ পায় নাই। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুতে যখন রাজবংশ নির্বংশ হইল তখনই কাছাড় ইংরেজের অধিকারে আসে। এতদঞ্চলে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই যে বৃটিশ শাসনেব প্রয়োজন হইয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কাছাড় হইতে মণিপুর উদ্ধারের চেষ্টা ঃ—

ব্রহ্মের বাহিনী মণিপুব দখল করিয়া গরীবনিওয়াজের অন্যতম জামাতা যাদুসিংকে সামন্ত নৃপতি হিসাবে মণিপুরের সিংহাসনে বসায়। কিছুদিন পর যাদুসিংকে পদচ্যুত করিয়া নরসিংহের একজন ভাইকে সেই স্থলাভিষিক্ত করে। মণিপুরীগণ এই দুইএর একজনকেও অন্তরের সহিত রাজা বলিয়া গ্রহণ করে নাই।

এদিকে কাছাড় জেলার দক্ষিণে সুনাইমুখ (Sunai Mukh) নামক স্থানেরাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া চৌরজিৎ কাছাড় রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করেন। মারজিত গম্ভীরসিং এবং তাহাদের অপর একজন ভ্রাতা বিশ্বনাথ সিং যথাক্রমে হাইলাকান্দি, কালীন (Kaiyn) এবং বিক্রমপুর (বদরপুরের নিকট) নামক স্থানে নিজ নিজ আস্থ গড়েন। প্রত্যেকের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কাছাড় রাজ্যের রাজস্ব হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

মারজিতের মণিপুর হইতে পলাইয়া আসার পরও রবিনোচন্দ্রের পুত্র হীরাচন্দ্র মণিপুরে গুপ্তভাবে থাকিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের বাসনায় বিজয়ী ব্রহ্মসৈন্যের উপর অতর্কিতভাবে যখন তখন হানা দিয়া শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিতে থাকেন। মণিপুরিগণও গোপনে তাঁহার এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিত। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে চৌরজিৎ সিং কাছাড় হইতে একদল সৈন্যসহ তাহার অপর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র পীতাম্বর সিং-কে হীরাচন্দ্রের সাহায্যার্থ পাঠান। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মের এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ব্রহ্মের আক্রমণে বিধ্বস্ত মণিপুর হইতে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালনা করা সম্ভব ছিল না বলিয়া তাহারা পুনরায় কাছাড়ে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। পরবৎসর পুনরায় পীতাম্বর সিংকে মণিপুরে পাঠান হয়। এইবার পীতাম্বর মণিপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের সামন্ত রাজা সুবল (Shoobol) কে বিতাড়িত করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতকতার সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য স্বয়ং গম্ভীর সিং সসৈন্যে মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। জয়নগরের (Joynagar) নিকট যুদ্ধে পীতাম্বর পরাজিত হইয়া আভা'র (Ava) রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গম্ভীর সিংহ ও উপযুক্ত রসদের অভাবে অবিলম্বে কাছাড়ে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

প্রবাসেও গৃহবিবাদ মণিপুরের রাজভ্রাতা দিগকে নিষ্কৃতি দিল না। মণিপুর হইতে ফিরিয়া আসার অল্পদিনের মধ্যেই গম্ভীর সিং চৌরজিতের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হইলেন। তিনি তাঁহার ব্যয়ের

জন্য রাজস্বের আরও বেশী অংশ দাবী করিয়া বসিলেন। চৌরজিৎ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় গম্ভীর সিং চৌরজিৎকে পরাজিত করিয়া নিজেই কাছাড়ের সিংহাসন দখল করিয়া লইলেন। মারজিৎ যেমন ছিলেন তেমনি রহিলেন। চৌরজিৎ নিরুপায় হইয়া শ্রীহট্টে আশ্রয় লইলেন। প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকিয়া যান।

এদিকে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের জন্য ইংরেজের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার কোনরূপ আশ্বাস না পাইয়া গোপনে ব্রহ্মদেশের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ব্রহ্মের সৈন্য ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের মধ্য দিয়া কাছাড় আক্রমণ করে। কিন্তু গম্ভীরসিংহের প্রবল বাধায় তাহাদের কাছাড় হইতে হটিয়া যাইতে হয়। পুনরায় এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনায় মারজিৎ সিং কাছাড়ে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া শ্রীহট্টে চলিয়া যান। ১৮২৩ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গম্ভীর সিং ব্রহ্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট একাধিকবার আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সরাসরিভাবে লড়াই না বাধা পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কাছাড় ও মণিপুর সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন ছিল। *

* Ref—Bejoy Panchallee—M. Jhulan Singh; Assam District Gazetteers—Vol I—B. C. Allen; প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন—ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন; The Eastern Frontier of British India—Pemberton; Eastern Frontier of British India—A. C. Banerji; Statistical Account of Manipur—R. Brown; A History of Assam—Gait; Burmese war—Wilson.

(আট)

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪—১৮২৬)

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজের বাণিজ্যিক সম্পর্ক চলিয়া আসিলেও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় আরও প্রায় এক'শ বৎসর পর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এদিকে ভারতবর্ষে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়া উহার সীমারেখা পূর্বদিকে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং গোয়ালপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন অপর দিকে ব্রহ্মে আলোম্প্রার (Alompra) সাম্রাজ্য ক্রমশ পেগু (Pegu), তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চল গ্রাস করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত জেলা চট্টগ্রামের গায়ে আসিয়া ঠেকে। দুইজন সাধারণ লোক এক বিছানায় একে অন্যের গা-ঘেঁষিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে, কিন্তু দুইটি বৃহৎ রাজ্যের সীমানা সংলগ্ন থাকিলে ঠোকাঠুকি অনিবার্য। ব্রহ্মের নববিজিত রাজ্য আরাকান হইতে উৎপীড়নের ভয়ে দলে দলে লোক আসিয়া ইংরেজের অধীন চট্টগ্রামে আশ্রয় লইতে থাকে। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের প্রতাপশালী সম্রাট বোদপায়া (Bodawpaya) ইংরেজ সরকারের নিকট এক কড়া চিঠিতে অবিলম্বে ঐ সমস্ত পলাতকদিগকে ফিরাইয়া দিতে বলেন এবং এই সঙ্গে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কাশীমবাজারের উপর তাহার দাবী জানান। ব্রহ্মের সৈন্য তখন রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসামের উপর হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ইংরেজ সরকার তখন পিণ্ডারিদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ব্রহ্মদেশের সম্রাটের ধারণা হইয়াছিল ইংরেজ হয়ত ভয় পাইয়া

তাহার দাবী মানিয়া লইবে। কিন্তু সেই চিঠি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে পিণ্ডারি যুদ্ধের (১৮১৭—১৮) পর। গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস (Lord Hastings or Lord Moira—1813-23) অত্যন্ত উপেক্ষার সহিত এই অস্বাভাবিক দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর আসিল ব্রহ্মের এক বিরাট বাহিনী শ্যামের নিকট পরাজিত হইয়াছে। এইরূপ বিপর্যয়ের ফলে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ তখন স্থগিত রাখিতে হইলেও ব্রহ্মার কিন্তু যুদ্ধের নেশা কাটিল না। রাজা হইতে ভিখারী পর্যন্ত সকলেরই মুখে এক কথা "রণং দেহি"। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসামে গৃহ-বিবাদের সুযোগে ব্রহ্মের সৈন্য সেখানে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে সিংহাসনে সাক্ষী-গোপাল হিসাবে বসাইয়া নিজেদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত স্বাধীনতা হারাইয়া শীঘ্রই হাঁফাইয়া উঠেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌহাটীতে পলাইয়া আসিয়া রাজ্যোদ্ধারে সচেষ্ট হন। পুনরায় ব্রহ্মের বিখ্যাত সেনাপতি মিঙ্গি মহাবান্দুলার (Mingi Maha Bandula) পরিচালনায় ব্রহ্মের সৈন্য বন্যাপ্রবাহের মত আসামে প্রবেশ করিয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র আসাম দখল করিয়া লয়। চন্দ্রকান্ত বারবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজ রাজ্যে পলাইয়া আসেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম কর্তৃক মণিপুর দখলের কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। মণিপুরের রাজগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ই ব্রহ্মের সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন। গোয়ালপাড়া তখন ইংরেজের অধীনে,—তথাপি

ব্রহ্মের উৎপীড়ন হইতে ইহা রক্ষা পাইল না। জৈন্তিয়া রাজ্য এতকাল আসামের সামন্ত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জৈন্তিয়ার রাজা ২য় রামসিংহের উপর আসামের তৎকালীন অধিপতি ব্রহ্মের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ আসিল। ইংরেজ সরকার ব্রহ্মের বাহিনীকে জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। কিন্তু রণোন্মাদ ব্রহ্মের বাহিনীকে তখন নিষেধের ডোরে ঠেকায় কার সাধ্য? বিজয়ী সৈন্য রণভেরী বাজাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। নওগাঁও হইতে উত্তর কাছাড়ের মধ্য দিয়া একদল, জৈন্তিয়ার মধ্যদিয়া একদল এবং মণিপুরের মধ্যদিয়া আর একদল—ব্রহ্মের এই তিনদল সৈন্য কাছাড়ে প্রবেশ করিয়া মণিপুরী রাজা গম্ভীর সিংহের সৈন্য-দলকে পরাজিত করিয়া কাছাড় দখল করে। ফলে এইদিক দিয়াও শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত ইংরেজ সীমানার বাহিরে আর কোন রাজ্য ব্রহ্মের দখলে আসিতে বাকী রহিল না। ইতিপূর্বে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নিকট ইংরেজের অধীনস্থ সাপুরি (Shahpuri) দ্বীপটি ব্রহ্মের সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হয়।

ইংরেজ সরকার এতদিন পর্যন্ত আলাপ আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের নীতি কোনটাই ইংরেজের পক্ষে তখন গুরুতর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুকূলে ছিল না। কিন্তু সত্য সত্যই ব্রহ্মদেশ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া ধরিয়া টান দিল তখন আর

ভারত-শাসকদের নিরপেক্ষ নীতি টিকিল না। ইংরেজ সরকারের পক্ষে ব্রহ্মের এই সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্বে আহ্বান গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট (Lord Amherst) ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রহ্মের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মণিপুরের রাজাগণ এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। যুদ্ধ সত্যসত্যই বাধিয়া যাওয়ায় বৃটিশ সরকার কাছাড় এবং মণিপুরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। দুর্গম হইলেও পূর্ব সীমান্তে স্থলপথে ব্রহ্মদেশে অভিযান চালানব একমাত্র পথ গিয়াছে কাছাড় এবং মণিপুরের মধ্য দিয়া। সেইজন্য স্থানীয় লোকের সাহায্য পাওয়ার আশায় বৃটিশ সরকার নিরপেক্ষ-নীতি ত্যাগ করিয়া কাছাড়ের নির্বাসিত রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে কাছাড়ের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সর্তে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজের এই সাহায্যের জন্য বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা কর দিতে এবং শাসন ব্যাপারে ইংরেজের হস্তক্ষেপ মানিয়া লইতে সম্মত হন। সঙ্গে সঙ্গে জেন্তিয়া রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ইংরেজ সরকার গ্রহণ করে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে ইংরেজসৈন্য কাছাড় এবং জৈন্তিয়া ব্রহ্মের দখল হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মের বাহিনী মণিপুর রাজ্যে পশ্চাদপসরণ করে। মণিপুর এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তখনও ব্রহ্মের দখলেই থাকে।

ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মারজিত এবং গম্ভীর সিংকে শ্রীহট্টে থাকিতে সম্মত করানর জন্য সরকার হইতে ডেভিড স্কটের

(David Scott) উপর নির্দেশ আসে। গম্ভীর সিংহের সাহস এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় ইতিপূর্বেই ইংরেজ সরকারের গোচরে আসিয়াছিল। ডেভিড স্কট, গম্ভীর সিং এবং মারজিতের নিকট ইংরেজের পক্ষ হইয়া মণিপুরে ব্রহ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার প্রস্তাব করেন। এইরূপ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মণিপুরীদের সাহায্য লাভ। ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী স্থির হইল মণিপুর ব্রহ্মের কবল হইতে মুক্ত হইলে চৌরজিত তাঁহার সিংহাসন ফিরিয়া পাইবেন, মারজিত ও গম্ভীর সিং যথাক্রমে যুবরাজ ও সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু রাজভ্রাতাদের মধ্যে মতানৈক্যের জন্য এবং চৌরজিত ও মারজিতের পক্ষে—বার্ধক্যহেতু সৈন্য পরিচালনায় অক্ষমতার দরুণ উপরোক্ত ব্যবস্থা কোন কাজে আসিল না। নূতনভাবে আর একটি চুক্তির প্রয়োজন হইল। গম্ভীর সিং তখন যুবক সুতরাং তাঁহার সাহায্যই অধিকতর কাম্য। অনেক বিবেচনার পর ঠিক হইল সিংহাসন গম্ভীর সিংকে দেওয়া হইবে এবং গরীবনিওয়াজের অন্যতম প্রপৌত্র উদীয়মান যুবক নরসিংহ সেনাপতির পদ অধিকার করিবেন। মণিপুরের বর্তমান মহারাজা এই নরসিংহের বংশধর। নরসিংহের অপরাপর বংশধরগণও জয়সিংহের বংশধরদের ন্যায় রাজকুমার এবং রাজকুমারী নামে পরিচিত। বর্তমান রাজার নিকট জ্ঞাতি বলিয়া এই রাজকুমার এবং রাজকুমারীগণ জয়সিংহের বংশধরদের চেয়ে অধিকতর কৌলীন্য দাবী করে। চৌরজিত বৃটিশ সরকারের নিকট মাসিক ১০০৲ টাকা ভাতা গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল নবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। সিংহাসনে

আরূঢ় থাকা কালেও মহারাজ চৌরজিতের ধর্মপ্রাণতার কথা সুবিদিত। তিনি অবসর সময়ে বর্তমান চীফ্ কমিশনারের ভবনের সম্মুখে দীঘির মধ্যে নির্জন দ্বীপে প্রায়ই ঈশ্বর আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। মারজিতও মাসিক ১০০৲ টাকা ভাতা গ্রহণ করিয়া শ্রীহট্টে বসতি স্থাপন করেন। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে বালুঘাট (Balughat) নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মের সৈন্য কাছাড় হইতে মণিপুরে পশ্চাদপসরণের পর এক বিরাট বৃটিশ বাহিনী ঢাকা হইতে কাছাড়ে আসিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর গম্ভীর সিং এবং নরসিং সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বদরপুর ক্যাম্পে চলিয়া আসেন। সেখানে তাঁহাদের অধীনে ৫শত মণিপুরী সৈন্য ভর্তি হয়। বলা বাহুল্য ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যয়ভার ইংরেজই বহন করে।

১৮২৪ সনের অক্টোবর মাস। জমি হইতে জল তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। কাছাড় হইতে ব্রহ্মের সৈন্য চলিয়া গেলেও জল-কাদা, বনজঙ্গল এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে বৃটিশ সৈন্যের এক পা'ও অগ্রসর হওয়ার সাধ্য ছিল না। এই অবস্থায় ব্রহ্মের সৈন্য কেন এত তাড়াহুড়া করিয়া পশ্চাদপসরণ করিল তাহা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিশেষতঃ যখন দেখা যায় দুদ্‌পাৎলিতে (Dudpatli) তাহাদের প্রায় দশ হাজার সৈন্যের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল।

ইংরেজ সৈন্য (১) আসাম ফ্রন্ট, (২) চট্টগ্রাম ফ্রন্ট এবং

জলপথে (৩) রেঙ্গুন ফ্রন্ট, এই তিনদিক হইতে ব্রহ্মের উপর আক্রমণ চালাইল। আসাম এবং চট্টগ্রাম ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মের রাজধানী আভা নগরী। রেঙ্গুন ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল শত্রুর একদল সৈন্যকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া রাখা; যুদ্ধের প্রথমভাগে আসাম এবং চট্টগ্রাম ফ্রন্টে আক্রমণকারী শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করা গেল বটে কিন্তু রসদ বিভাগের অব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক বাধার দরুণ বৃটিশ সৈন্য আসামে এবং রেঙ্গুনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

অপরপক্ষে আসামে ব্রহ্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পার্বত্য জাতিগুলিও তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। এই সময় আসামের রাজ্যচ্যুত রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ ব্রহ্মের ফাঁদে পা দিয়া জোড়হাটে যাইয়া বন্দী হইলেন। কিন্তু তাহাতেও ব্রহ্মের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। চারিদিকে বিদ্রোহ, মহামারী এবং সর্বোপরি রসদের অভাবে সেনাপতি মিঙ্গি মহাবাণ্ডুলা আসাম প্রদেশের ভার একজন গভর্ণরের উপর ন্যস্ত করিয়া অধিকাংশ সৈন্যসহ ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া গেলেন। এই জন্যই বোধহয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মের বিরাট বাহিনী কাছাড় হইতে বিস্ময়কর পরিস্থিতির মধ্যে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল।

মিঙ্গি মহাবাণ্ডুলা ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আরাকানের পথে বঙ্গদেশ আক্রমণে যাত্রা করিলেন। রামু (Ramu) নামক স্থানে একদল বৃটিশ সৈন্য তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রেঙ্গুন ফ্রন্টে স্যার আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল সাহেবের অগ্রগতি রোধ

করিবার জন্য তাঁহাকে চট্টগ্রাম ফ্রন্ট হইতে ডাকিয়া পাঠান হয়। এইখানেই ব্রহ্মের আক্রমণাত্মক নীতির অবসান হয়। তাহার পর যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে তাহা ব্রহ্মের পক্ষে নিছক আত্মরক্ষামূলক। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাণ্ডুলা সসৈন্যে রেঙ্গুন সহরের সম্মুখে উপস্থিত হন,--কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের হস্তে পরাস্ত হইয়া ৪০ মাইল উত্তরে ডোনাবিউ (Donabew) সহরে পশ্চাদপসরণ করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ক্যাম্বেল সাহেব সসৈন্যে ডোনাবিউ আক্রমণ করিয়া মিঙ্গি মহাবাণ্ডুলাকে পরাজিত করেন। সেনাপতি বাণ্ডুলা স্বয়ং যুদ্ধে নিহত হন। ইহার পর দক্ষিণ ব্রহ্মের রাজধানী প্রোম সহর অনায়াসেই ইংরেজের দখলে আসে। যুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে পৌছিয়াছে। ব্রহ্মের সম্রাট আশা ছাড়িয়া দিয়া —শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেন।

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্মের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে অনাবশ্যক। কিন্তু কিভাবে মণিপুর রাজ্য শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের কবল হইতে উদ্ধার পাইল তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে যুদ্ধের সমস্ত ফ্রণ্টেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ না জানিলে চলে না। কেবল মাত্র সেই জন্যই অন্যান্য ফ্রণ্টেরও কিছু কিছু খবর দেওয়া হইল। এখন পুনরায় আসাম অথবা কাছাড় মণিপুর ফ্রণ্টে চলিয়া আসা যাক। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মিঙ্গি মহাবাণ্ডুলার ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাছাড় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে যুগপৎ ব্রহ্মবাহিনী উধাও হওয়ার পর এই ফ্রণ্টে আর কোন গুরুতর যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল না। কারণ তখন ব্রহ্মের বেশীরভাগ সৈন্যই আরাকান এবং

ইরাবতী উপত্যকায় নিয়োজিত হইয়াছিল। আসাম ফ্রন্টের ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধাম (Shuldham) মণিপুরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সসৈন্যে ঢাকা হইতে বাঁশকান্দি (কাছাড় জেলায়) পৌছেন। কিন্তু তাঁহার চলার পথ একেই ছিল দুর্গম পাহাড় এবং অরণ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার উপর অসময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ তিনি আর অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। এমন কি রাস্তা নির্মাণের জন্য লোকেরও অভাব হয়। এই অবস্থায় ব্রিগে-ডিয়ার-জেনারেল শুলধাম অভিযান চালনার বাসনা ত্যাগ করিয়া কাছাড় এবং শ্রীহট্টে দুইটী ছোট বাহিনী রাখিয়া সেনাদলের বৃহৎ অংশ সহ ঢাকা সহরে ফিরিয়া আসেন।

গম্ভীর সিং তখন-ও বৃটিশ ক্যাম্পে থাকিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধামের নৈরাশ্যজনক প্রত্যাবর্তনের খবর পাইয়া তিনি একাই তাঁহার বাহিনীসহ মণিপুরে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবিলম্বেই অনুমতি আসিয়া গেল। তিনি তাঁহার ৫ শত সৈন্য সহ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিয়া ৭ দিনের মধ্যে বাঁশকান্দি পৌছেন। লেফ্‌টেনেণ্ট পেম্বারটন (Lieutenant Pemberton) নামক একজন বৃটিশ অফিসার স্বেচ্ছায় তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। বাঁশকান্দি হইতে মণিপুরের দিকে ৩০ মাইল রাস্তা অত্যন্ত কর্দমাক্ত এবং নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত। তারপর শুধু চড়াই আর উৎরাই।

সারি সারি পাহাড় উত্তর হইতে নামিয়া আসিয়া রাস্তার উপর অসংখ্য লম্বপাত করিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধামের সমতলবাসী সৈন্যদের পক্ষে এই পথ দুর্লঙ্ঘ্য হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। গম্ভীর সিং তাঁহার বাহিনীসহ বহুক্লেশে নানা সঙ্কট পার হইয়া ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন মণিপুর উপত্যকার পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হন। তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মের সৈন্য রাজধানী ইম্ফাল সহর ত্যাগ করিয়া ১০ মাইল দূরে উন্দ্রা (Undra) নামক স্থানে পশ্চাদপসরণ করে। গম্ভীর সিং ইম্ফাল সহর দখল করিয়া উন্দ্রাতে আসিয়া দেখেন ব্রহ্মের সৈন্য সেখান হইতে আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধামের সুশিক্ষিত বিশাল বাহিনী দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, গম্ভীর সিং তাঁহার মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় এবং নৈপুণ্যের দ্বারা তাহাই সাধন করিলেন। প্রয়োজন হইলে মণিপুরের ছেলেও যে মাতৃভূমির জন্য সমস্ত বিপদ বাধা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অসাধ্যসাধন করিতে পারে ইহা তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জুনমাসের শেষে গম্ভীর সিং মণিপুরে মাত্র ৩০০ জন সৈন্য রাখিয়া বাকী সৈন্যসহ শ্রীহট্টে চলিয়া আসেন। ব্রহ্মের সম্রাট যে ইতিমধ্যেই কাবু হইয়া আসিয়াছিলেন ইহা তাঁহারও অগোচরে ছিল না। সেইজন্য তখনও মণিপুরে ব্রহ্মের কিছু সৈন্য থাকিলেও তিনি তাঁহার অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার জন্য ৩০০ জন সৈন্যই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া দেশবাসীর সাহায্যও তিনি পাইবেন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার মনে ছিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর। ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট (Capt. Grant) সাহেবকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীর সিং পুনরায় সসৈন্যে মণিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মের প্রায় ৩। ৪ শত সৈন্য তখনও টামু (Tamu) এবং কালেমীয়ার মধ্যবর্তী চীন্দুইন অববাহিকায় কাবো (Kabaw) উপত্যকাতে ছিল। কয়েক দিন পরই খবর পাওয়া গেল, স্থানীয় ৫ শত লোকের হাতে উপত্যকা রক্ষার ভার দিয়া সেখান হইতেও তাহারা চলিয়া গিয়াছে। গম্ভীর সিং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী সেখানে তাঁহার সৈন্য প্রেরণ করেন। মনে মনে আশা ছিল হয়ত বিনা যুদ্ধেই কাবো উপত্যকা দখল করা যাইবে। কিন্তু সেখানকার প্রধান দলপতি সুমজু রাজা (Sumjoo Raja) তাঁহার শত অনুচর লইয়া টামুতে মণিপুরী সৈন্যকে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। এই সংবাদ শুনিয়া গম্ভীর সিং এবং ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট (Capt. Grant) সেখানে যাইয়া শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেন। মণিপুরে ইংরেজসৈন্য রহিয়াছে এইরূপ গুজব শুনা মাত্র সুমজু রাজা হঠাৎ রণক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হন। গ্র্যান্ট সাহেবেরও ধারণা ছিল, এইরূপ গুজব ব্রহ্মের রাজধানী আভানগরীতেও অনুরূপ ভীতির সঞ্চার করিবে এবং তাহা ইরাবতী মোহনায় যুদ্ধরত ইংরেজ সৈন্যের অনুকুলেই যাইবে। গম্ভীর সিংহের পরিচালনায় আগুয়ান মণিপুরী সৈন্য নিংথী (Ningthi) নদীর দক্ষিণ তীরে দেশরক্ষার জন্য তৈরী ব্রহ্মের একটি দুর্গ দখল করিল। সাধারণতঃ দুর্গ দখল করিতে কামানের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মণিপুরী সৈন্য ব্রহ্মের দুর্ধর্ষ বাহিনীকে একমাত্র সাহস এবং

বিক্রমের দ্বারাই পরাভূত করিয়া দুর্গ দখল করিতে সক্ষম হয়। এই হিসাবে গোড়া হইতেই গম্ভীর সিংহের দক্ষতার উপর নির্ভর করায় ইংরেজের হিসাবে একচুলও ভুল হয় নাই। উইলসন (Wilson) সাহেব তাঁহার এই যুদ্ধের বিবরণে মণিপুরী সৈন্যের বীরত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী গম্ভীরসিং নিংথী নদীর পশ্চিম তীরে আসিয়া দেখেন ব্রহ্মের সৈন্য বন্দী মণিপুরীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অপরাপর সাধারণ লোকও বাড়ীঘর গরুবাছুরেব মায়া ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। এমন কি নিংথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত অঞ্চলের-ও একই অবস্থা। যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হওয়ার কাল আসন্ন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ডোনাবিউ'এর (Donabew) যুদ্ধে ব্রহ্মের সর্ব-প্রধান সেনাপতি মহাবাণ্ডুলা পরাজিত ও নিহত হওয়ার পরই ব্রহ্মের সম্রাট বা-গ্যীদ (Ba-Gy-Daw) যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আসন্ন বর্ষাকালে কিছু সুবিধা হইতে পারে এই ভাবিয়া যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ক্যাম্বেল সাহেব দক্ষিণ-ব্রহ্মের রাজধানী প্রোম (Prome) সহর দখল করিয়া সেখানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে বৃষ্টি থামিয়া আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া উঠিল। ব্রহ্মের সম্রাট কেবলমাত্র কালাতিপাত ছাড়া আর কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেইজন্য তখন তিনি সন্ধি করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের কঠোর সর্ত

তাহার মনঃপূত হইল না। উত্তর ব্রহ্মের বৃহত্তর অংশ তাহার দখলে এমন কি আসাম এবং মণিপুরে তখনও তাঁহার সৈন্য রহিয়াছে —অতএব এত সহজে হটিবার পাত্র তিনি নন। যুদ্ধ আবার পূর্ণ উদ্যমে চলিল। কিন্তু সমস্ত ফ্রন্টেই ইংরেজ এবং তাহার মিত্রদের সৈন্য অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এদিকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গম্ভীরসিং সমস্ত মণিপুর দখল করিয়া ব্রহ্মদেশে অভিযান আরম্ভ করেন। ১৮.৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তাহার সৈন্য নিংথী নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আভা নগরী সেখান হইতে বেশী দূরে নয়। পূর্ব দিক হইতেও ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইতেছে এই ধারণায় ব্রহ্মের রাজধানীতে একটা ভয়ের কালো ছায়া পড়িয়া গেল। এদিকে দক্ষিণে ক্যাম্বেল সাহেবও বসিয়াছিলেন না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া আভার ৬০ মাইল দক্ষিণে ইয়ান্দাবো সহর দখল করিয়া লইলেন। সংগ্রামের পথে ব্রহ্মের আত্মরক্ষার সমস্ত সম্ভাবনা শূন্যে মিলাইয়া গেল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই ইয়ান্দাবো সহরেই বৃটিশ এবং ব্রহ্মের মধ্যে সন্ধিসর্ত স্বাক্ষরিত হইয়া প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয়।

ইয়ান্দাবো চুক্তির (Treaty of Yandabo) পর মণিপুরের সিংহাসনে গম্ভীর সিংহের দখল পাকাপাকি হয়। কিন্তু মুল চুক্তিপত্রে (Article 2nd—"His Majesty the King of Ava renounces all claims upon and will abstain from all future interference with the principality of Assam and its dependencies, and also with the contiguous petty states of Cachar and Jyntia. With regard to

Manipur it is stipulated that should Gambhir Singh desire to return to that country he shall be recognised by the King of Ava as Rajah thereof") সিংহাসনের উপর তাঁহাব দখলের স্বরূপ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন কথা না থাকায় তিনি কি স্বাধীন বাজা হিসাবে বিবেচিত হইবেন, না—ব্রহ্মের সামন্তরাজারূপে বিবেচিত হইবেন, এসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। ইংবেজের পক্ষে মণিপুবকে ব্রহ্মের সামন্তরাজ্য হিসাবে থাকিতে দেওয়া বিপদজনক ছিল। কারণ কাছাকাছি শ্রীহট্টের উপব ব্রহ্মেব চাপ থাকিয়াই যায়। অপর পক্ষে বৃটিশ সীমান্তেব নিরাপত্তাব জন্য দুই রাজ্যের মধ্যে একটি বাফার (Buffer) রাজ্য হিসাবে মণিপুরকে স্বাধীন রাখাই বৃটিশের কাম্য। সুতরাং এবিষয়ে পুনরায় আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইল। ভাবত সরকারের পক্ষ হইতে আভার রাজদরবারে নিযুক্ত তৎকালীন ইংরেজ দূত মেজর বার্ণে (Major Burney) বিষয়টি সেখানে উত্থাপন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মের মন্ত্রীবর্গ মণিপুরের উপর ব্রহ্মের প্রভুত্ব ত্যাগ করিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু গোল বাধিল কাবো উপত্যকার উপর স্বত্ব লইয়া। ব্রহ্ম হইতে মণিপুরে প্রবেশের পথ দুইটি এই উপত্যকার উপর দিয়াই গিয়াছে। নিংথী নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত অঞ্চল তখনও গম্ভীর সিংহের দখলে। কাবো উপত্যকা মণিপুরের হাতে ছাড়িয়া দিতে ব্রহ্ম সরকারের ভীষণ আপত্তি। ইয়ান্দাবো চুক্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ব্রহ্মের সৈন্য নিংথী নদী পার হইয়া কাবো উপত্যকার

প্রবেশ করে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় স্বেচ্ছায় তাহারা চলিয়া যায়। গম্ভীর সিং যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া বিষয়টি মীমাংসার ভার ভারত সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেন। আট বৎসর ধরিয়া এবিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক চলে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ভারত সরকারের নিকট এক গোপন বিবৃতিতে মেজর বার্ণে (Major Burnev) এই অভিমত জানান যে কাবো উপত্যকা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মের দ্বারাই শাসিত হইয়া আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতি অল্পদিনের জন্য ইহা হাতছাড়া হইলেও প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ১২ বৎসর পূর্বে পুনরায় ব্রহ্মসরকার কাবো উপত্যকা নিজেদের দখলে আনে। বলা বাহুল্য ইংরেজের যে বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই, সেই স্থলে ব্রহ্মের রাজদরবারে নিযুক্ত ইংরেজ দূত মেজর বার্ণে ব্রহ্ম সরকারকেই খুশি করিতে সচেষ্ট থাকিবেন। মেজর বার্ণের বিবৃতি যে ভ্রান্ত এবং পক্ষপাতদুষ্ট তাহা তাঁহারই স্বজাতীয় গেইট (Gait) সাহেবের আসামের ইতিহাস পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেখানে দেখা যায় – ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা পঙ্গ (Pong) রাজার সঙ্গে একযোগে খুম্বৎ (Khumbat) বিজয় করিয়া কাবো উপত্যকা মণিপুরের দখলে আনেন। মণিপুরের প্রতি গেইট সাহেবের বিশেষ কোন দরদ থাকার কারণ নাই। সুতরাং তাঁহার কথা মানিয়া লইলে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ কাবো উপত্যকার উপর ব্রহ্মের অখণ্ড দখল থাকার কাহিনী বার্ণে সাহেবের স্বকল্পিত অথবা মিথ্যা সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ব্রহ্মের ক্ষতবিক্ষত রাজনৈতিক ইতিহাস দৃষ্টে ইহা মনে হয় না যে এই সমস্ত অঞ্চলে

দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। মণিপুরের পুরাণ এবং ইতিহাসও যে বার্ণে সাহেবের অনুকূলে নয়—এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট (Political Agent) কর্ণেল জনষ্টন সাহেবও (Col Johnston) বার্ণে সাহেবের উক্ত বিবরণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। উপরোক্ত ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও নিংথী নদী হইতেছে মণিপুর এবং ব্রহ্মের মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখা। সুতরাং কাবো উপত্যকায় মণিপুরের স্বত্ব স্বীকৃত হইলে মণিপুর রাজ্যের প্রাকৃতিক সীমার সঙ্গে রাজনৈতিক সীমারেখার কোন অসঙ্গতি থাকে না। কিন্তু তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (William Bentinck) প্রবলতর রাষ্ট্র ব্রহ্মের মুখের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মের সম্রাটকে খুশি করার জন্য কাবো উপত্যকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। [The supreme governmet wrote to the Resident at Ava on March 16, 1833—"... ...the supreme government still adheres to the opinion that the Ning'hee formed the proper boundary between Ava and Manipur, but that in consideration for His Majesty (i, e. Burmese king's) feelings and wishes and in the spirit of amity and goodwill subsisting between the two countries the supreme government consents to the establishment of the boundary line at the foot of the Yoomadoung hills."]

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী কাবো উপত্যকা হস্তান্তরিত করা

হয়। গম্ভীর সিং অনিচ্ছা সত্বেও কাবো উপত্যকার উপর তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভারত সরকার হইতে মণিপুরের রাজাকে মাসিক ৫ শত টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। মণিপুরের শাসন ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মণিপুর সরকার নিয়মিতরূপে সেই বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কাবো উপত্যকার কথা মণিপুরবাসী আজিও ভুলে নাই। শুনা যায় কাবো উপত্যকা হস্তান্তরের জন্য গম্ভীর সিং লাংথাবাল প্রাসাদে রুগ্ন অবস্থায় যথেষ্ট আক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু হয়। হয়ত এই ঘটনাই তাঁহার মৃত্যুকে ঘনাইয়া আনিয়াছিল।

এদিকে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের পর কাছাড় রাজ্য গোবিন্দচন্দ্রকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের কোনরূপ সদ্ভাব ছিল না। শুনা যায় গম্ভীর সিংহের মাতা খুম্বোং আপাম্বী (Khumbong Apambi) একবার গোবিন্দচন্দ্রের হাতে যথেষ্ট নির্যাতিতা হইয়াছিলেন। মাতার এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পুত্র গম্ভীর সিং সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায় সকলেরই সন্দেহ গম্ভীর সিংহের উপর পড়িল কিন্তু ইহা লইয়া কাহারও মাথাব্যথা না থাকায় এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য হইল না। গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার মূলে গম্ভীর সিংহের ইঙ্গিত থাকাই স্বাভাবিক। এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার আরও একটি কারণ আছে। অপুত্রক গোবিন্দচন্দ্রের কাছাড় রাজ্য

গম্ভীর সিংহের ভাগে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল—এবং ইহাও যে, এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রেরণা যোগায় নাই তাহা অবিশ্বাস করা কঠিন।

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাছাড়ের সিংহাসনের জন্য গোবিন্দচন্দ্রের বিধবা পত্নী চন্দ্রপ্রভা, তুলারাম, তুলারামের ভ্রাতষ্পুত্র গোবিন্দরাম ও মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিং প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। তুলারামের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। দাবীদারদের মধ্যে গম্ভীর সিং এক সময় কাছাড় রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাৎসরিক ১৫ হাজার টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া ২০ বৎসরের জন্য সমগ্র কাছাড় রাজ্য ইজারা নিতে চাহিলেন। গম্ভীর সিংহের প্রস্তাব ইংরেজের নিকট অতিশয় লোভনীয় ছিল সন্দেহ নাই। কারণ গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজের বন্দোবস্ত হইয়াছিল মাত্র বাৎসরিক ১০ হাজার টাকায়। মণিপুর রাজ্যে নিযুক্ত তৎকালীন বৃটিশ কমিশনার ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট (Capt. Grant) গম্ভীর সিংহের পক্ষে যথেষ্ট সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন জেঙ্কিনস্ (Capt. Jenkins) এবং লেফটেনেণ্ট পেম্বারটন (Lieutenant Pemberton) মণিপুরের মত দুর্বল রাষ্ট্রের হাতে কাছাড় শাসনের ভার অর্পণ করার প্রস্তাবে তীব্র বিরোধিতা করায় গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক কাছাড় রাজ্য পুরাপূরি বৃটিশ এলাকাভুক্ত করার নির্দেশ দেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট হইতে কাছাড় রাজ্য চিরতরে বিলীন হইয়া তাহার স্থলে সমতল অংশে শিলচরকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ শাসিত কাছাড় জেলার পত্তন হয়। অবশ্য গম্ভীর

সিংও কাছাড় রাজ্যের কিঞ্চিৎ ভাগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কাছাড়ের পূর্বদিকে পার্বত্য অঞ্চলসমূহ মণিপুরকে দেওয়া হইল।

বিগত ৬০ বৎসর ধরিয়া মণিপুরের উপর ব্রহ্মের উপর্যুপরি আক্রমণের যে পালা চলিয়া আসিতেছিল প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসানে তাহার যবনিকা পাত হয়। ব্রহ্মকে অবশেষে মণিপুরের উপর প্রভুত্ব করার বাসনা চিরতরে সংযত করিতে হইল। কিন্তু মণিপুর যখন স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল তখন তাহার সেই পূর্ব শ্রী আর নাই ;—পরিবর্তে রহিল একটি প্রাক্তন সমৃদ্ধিশালী জনপদের শ্মশান। শত্রুর হস্তে কত লোক নিহত অথবা বন্দী হইয়া স্থানান্তরিত হয় তাহার কোন হিসাব নাই। বহু লোক প্রাণভয়ে সুর্মা উপত্যকায় পলাইয়া আসে। পাঁচ ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে যুদ্ধের পর মণিপুর উপত্যকায় প্রাপ্তবয়স্ক মণিপুরী পুরুষের সংখ্যা ৩ হাজারে নামিয়া আসে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শস্যক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া যায়, পথঘাট জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় গম্ভীর সিং এবং তাঁহার সেনাপতি নরসিংকে পুনরায় সব কিছুরই নূতন গোড়া পত্তন করিতে হয়। শ্রীহট্টের রাজবাড়ীতে রক্ষিত শ্রীগোবিন্দের মূর্তিটি আনাইয়া পুনরায় রাজপ্রাসাদের মন্দিরে স্থাপন করা হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই গম্ভীর সিং পথঘাট সংস্কার করিয়া রাজ্যে শান্তি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনিলেন। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নাগা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদিগকেও বশে আনিলেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য পুনরায় চলিল। রাজ্যে ধীরে ধীরে শ্রী ফিরিয়া আসিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে

জনবলও বাড়িয়া চলিল। গম্ভীর সিং ইম্ফালের প্রাচীন রাজবাটীতে না থাকিয়া ৩½ মাইল দূরে লাংথাবাল (Langthabal) নামক স্থানে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই প্রাসাদের নিকটেই নৌকা-বাইচের জন্য খাল কাটান হইল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মণিপুরেব রাজাগণ এই প্রাসাদেই ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা পুরাতন প্রাসাদে চলিয়া যান। ১৮৬৯ সালে এবং ১৮৮০ সালে পর পর দুইবাব ভূমিকম্পেব দ্বারা বিধ্বস্ত হইলেও এখনও সেখানে এই লাংথাবাল প্রাসাদের নানা চিহ্ন প্রাচীন স্মৃতি মনে করাইয়া দেয়।

মণিপুরের পূর্ববর্ত্তী রাজাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি যে নাগা পাহাড়ের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত ছিল, তাহা ঐ অঞ্চলের নাগা গ্রামগুলির মণিপুরী নাম হইতেই প্রামাণিত হয়। ব্রহ্মদেশ কর্তৃক মণিপুব বিজিত হওয়ার পর সেই প্রভাব লুপ্ত হইলেও যুদ্ধের পর গম্ভীর সিং তাহা পুনরায় বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেংকিংস (Capt. Jenkins) এবং লেফটেনেণ্ট পেম্বারটন (Lieutenant Pemberton) গম্ভীর সিংহকে সঙ্গে লইয়া উত্তর দিকে পাহাড়ের মধ্য দিয়া আসামে যাওয়ার রাস্তার সন্ধানে পাপতোংমাই (Paptongmai) এবং সামাগুড়তিং (Samagudting) হইয়া মোহংদীউৎ (Mohong Deyood) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে গম্ভীর সিং কোহিমা (Kohima) সহ বহু নাগা গ্রাম অধিকার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। কোহিমাতে তিনি তাঁহার পদচিহ্নিত একটি প্রস্তরলিপি স্থাপন করিয়াছিলেন। নাগারা

বহু বৎসর পর পর্যন্তও এই লিপি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। উপরোক্ত অভিযানের পর নাগাদের সঙ্গে মণিপুরীদের বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় চালু হয়। যখন কোন ইংরেজ এই সমস্ত মস্তক ছেদকদের (Head-hunter) এলাকায় প্রবেশ করিতে সাহস করিত না তখন মণিপুরীগণ সেখানে সম্মানীয় অতিথির ন্যায় নির্ভয়ে যাতায়াত করিত। এমনকি ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নাগাদের ধারণা ছিল বৃটিশ রাষ্ট্রের চেয়ে মণিপুর রাষ্ট্রই অধিকতর প্রবল। সেইজন্য ইংরেজকে তাহারা উপেক্ষা করিয়াই চলিত; কিন্তু মণিপুরকে রাগাইলে আর রক্ষা ছিলনা; গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছন্ন হওয়া অবধারিত, তাহার উপর ক্ষতিপূরণ আর খাজনা আদায়ের পালা-ত আছেই। মণিপুরের এই কঠোর নীতি এই সমস্ত অরাজক অঞ্চলে শান্তিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। নাগারা মণিপুরের শাসনে থাকায় মণিপুরের রাজভাষাও আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অঞ্চল সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার আগের মত উদাসীন থাকিলে এবং মিশনারীরা না আসিলে আজ নাগারা খৃষ্টধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্ট না হইয়া মণিপুরকেই তাহাদের রাষ্ট্র এবং সামাজিক জীবনের কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মণিপুর লেভি'র (Manipur levy) * এড্জুটেণ্ট লেফটেনেণ্ট গর্ডন (Lieutenant Gordon) যখন আঙ্গামিদের বিরুদ্ধে

---

* মণিপুর লেভি (Manipur Levy) – ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় গম্ভীর সিং ইংরেজের সাহায্যে যে ৫শত মণিপুরী সৈন্যের বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন তাহাই মণিপুর লেভি নামে পরিচিত। দুইজন বৃটিশ অফিসার

অভিযান চালান তখন তিনিও গম্ভীর সিংকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মণিপুরেব সৈন্য সেবারেও কোহিমার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বিদ্রোহী গ্রামগুলি শায়েস্তা করিয়া মণিপুর সরকারের খাজনা আদায় করিয়াছিল।

ব্রহ্মের নিকট হইতে মণিপুব উদ্ধার করার সময় গম্ভীর সিং ইংরেজের নিকট হইতে নামমাত্র সাহায্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মণিপুরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মের সৈন্যকে বিতাড়িত না করিলে ইংরেজের পক্ষে মণিপুরে প্রবেশ করা সম্ভব হইত না। সেইদিক দিয়া ইংরেজও তাঁহার নিকট কম উপকৃত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও ইংরেজ কাবো উপত্যকার উপর তাঁহার ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া উক্ত অঞ্চল ব্রহ্মের হাতে দিয়া দিল। কিন্তু গম্ভীর সিং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখিতে কোন ত্রুটী করেন নাই। ইংরেজের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য যখনই আবেদন আসিয়াছে তখনই তিনি তাহা যথাসাধ্য পূরণ করিয়াছেন। এই আবেদন এবং সাহায্যের মধ্যে দুর্বল রাষ্ট্রের উপর প্রতিবেশী প্রবল

ইহার পরিচালনা করিতেন। পরে এই লেভির সৈন্যসংখ্যা ২ হাজার পর্যন্ত বাড়ান হয়। ইহাদের বেতন, রসদ, সমরোপকরণ ইত্যাদি সমস্তই ইংরেজ সরকার বহন করিত বলিয়া ইংরেজের হুকুমমতই তাহাদের চলিতে হইত। গম্ভীর সিং এই মণিপুর লেভির সাহায্যেই মণিপুরে প্রবেশ করিয়া কাবো উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মণিপুর লেভি হইতে বৃটিশ অফিসারগণ চলিয়া যায়। তাহার পর হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে মণিপুর রাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এককথায় মণিপুরের আধুনিক শিক্ষিত স্থায়ী সামরিক বাহিনীর জনক বলা চলে।

রাষ্ট্রের সাধারণভাবে যেটুকু বাধ্যবাধকতা থাকে তাহার অতিরিক্ত কোন সম্পর্ক ছিলনা বলিয়াই আমরা জানি। অর্থাৎ গম্ভীর সিং মণিপুরের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। আইনতঃ তাঁহার সহিত ইংরেজের সম্পর্ক ভারতের অপরাপর করদমিত্র রাজাদের অনুরূপ ছিল না।

গম্ভীর সিং বহুবৎসর যাবৎ নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সেনাপতি নরসিংহই সিংহাসনে বসিবেন ইহাই একপ্রকার স্থির ছিল। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্তির জন্ম হয়। সিংহাসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা লুপ্ত হইলেও ধার্মিক এবং প্রভুভক্ত সেনাপতি নরসিংহের অন্তরে কোন কুমতলব স্থান পাইল না। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি মণিপুরের স্বাধীনতা উদ্ধারক বীর নরপতি গম্ভীর সিং কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া লাংথাবাল প্রাসাদে শেষ বিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Ref :—

(1) Historical Sketch of the Burmese-war - Wilson. (2) Report on the Eastern Frontier on British India—Pemberton. (3) History of British India—Roberts. (4) An Advanced History of India—R. C. Majnmder & Others. (5) My Experience in Manipur & the Naga Hills—Johnstone. (6) Annexation of Cachar—P. B. Chakravarty. (7) History of Assam—Gait. (8) Political & Secret letters to and from the Court of Directors (1785—1850). (9) Early British Relations with Assam—S. K. Bhuyan. (10) Gazetteers of Eastern Districts. (11) Bejioy Punchali—M. Jhulon Singh.

(নয়)

নরসিং (১৮৩৪—৫০)

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর পর তাহার ২ বৎসরের নাবালক পুত্র চন্দ্রকীর্তির প্রতিনিধি স্বরূপ, নরসিং রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইলেন। সেনাপতি রূপে নরসিংহের দক্ষতা এবং প্রভুভক্তির পরিচয় ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালেও প্রাক্তন রাজাদের বংশধরগণ বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সন হইতে পর পর এই বিদ্রোহের পালা আরম্ভ হয়। প্রথম মধুচন্দ্রের পুত্র তারিং কোম্বা কাছাড় হইতে তিনশত অনুচর লইয়া মণিপুরে প্রবেশ করেন। ইহার কএক বৎসর পর মার্জিত সিংহের পুত্র যোগেন্দ্র সিং-ও কাছাড় হইতে মণিপুর আক্রমণের চেষ্টা করেন। ইহাদের দেখাদেখি চৌরজিৎ সিংহের তিন পুত্র ত্রিভবন রাম ও তিলান্দো মণিপুরে থাকিয়া বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। অতঃপর ১৮৪৪ সনে নাবালক রাজা চন্দ্রকীর্তির মাতা মহারাণী কুমুদিনী দেবীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর নরসিং যখন নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন অপর একজন প্রাক্তন রাজা চরাইরংবার (গরীবনিওয়াজের পিতা) বংশধর মেলাইরংবা (Melai Romba) কাছাড় হইতে মণিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। নরসিং এবং তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহের তৎপরতায় একে একে তাহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। মেলাইরংবা ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহী নেতাগণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। মেলাইরংবা ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইহার পর ১৮৮১ সন পর্যন্ত রাজনৈতিক অপরাধের জন্য মণিপুরে আর কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই।

মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক

১৮৩০ সনে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাজা গম্ভীর সিং কাছাড় রাজ্য মণিপুরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কি কারণে কাছাড়ের বিস্তৃত সমতলভাগ তাঁহাকে না দিয়া নিজেদের এলাকাভুক্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৩ সনে হিন্দুস্থানের গভর্ণর জেনারেল এবং সুপ্রিম কাউন্সিল মণিপুরের মহারাজাকে এইরূপ জানাইলেন যে :—

"বরাক নদীর পূর্ব ও পশ্চিম বাঁকের মধ্যে, কালা নাগা এবং নুংজাই নামক দুইটী পর্বত শ্রেণী আছে। মান্যবর কোম্পানীর তাহাতে যে দাবি দাওয়া আছে, তাহা অমরা ত্যাগ করিব এবং এই পর্বত দুইটি রাজাকে দখল করিতে দিব। অধিকন্তু জিরি নদীর পূর্ব তীর এবং বরাক নদীর পশ্চিম বাঁক পর্যন্ত তাহার রাজ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে, মণিপুর রাজাকেও সম্মত হইতে হইবে।

১। চন্দ্রপুর হইতে তাঁহার থানা স্থানান্তরিত করার কথা, ইতিপূর্বে তাঁহাকে যেরূপ জানান হইয়াছে, তদনুসারে তিনি তাহা অবিলম্বে জিরি নদীর পূর্বধারে স্থাপিত করিবেন।

২। উভয় দেশের মধ্যে বাঙ্গালী ও মণিপুরী সওদাগরেরা যেরূপ পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে, তিনি তাহা

কোনরূপ বন্ধ করিবেন না। তিনি এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন না এবং কোন পণ্য দ্রব্যই একচেটিয়া করিবেন না।

৩। কালানাগা এবং নুংজাই পর্বতের অধিবাসী নাগারা, আদা, তুলা, মরিচ এবং তাহাদের দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য (যেরূপ পুর্বাপর কাছাড় প্রদেশে এবং বাঁসকান্দি উধারবণ) বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে, সে পক্ষে তিনি কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মাইবেন না।

৪। জিরি নদীর পূর্ব কিনারা হইতে আবন্ত করিয়া, কালানাগা এবং খাউপুমের মধ্যদিয়া, মণিপুর উপত্যকা পর্যন্ত যে পথ আছে, তাহা বান্ধান হইবার পর, রাজা সেটিকে এইরূপ মেরামত অবস্থায় রাখিবেন, যাহাতে তাহা দিয়া ভারবাহা বলদগণ শীত ও গ্রীষ্মকালে যাতায়াত করিতে পারে। অধিকন্তু রাস্তা তৈয়ারির সময় যদি তাহা তদারক করিতে ইংরেজ কর্মচারী পাঠান হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিবেন, রাজা তদনুসারে কার্য করিবেন।

৫। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধিকৃত দেশ ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে, যেরূপ ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা বৃদ্ধি পাইলে রাজা এবং তাঁহার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। অতএব যাহাতে এই সুফল শীঘ্র ফলিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহিলে, রাজা রাস্তা তৈয়ারির সাহায্য করিতে নাগা কুলি দিবেন।

৬। ব্রহ্মের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে, দেশরক্ষা অথবা নিংথি নদী অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য, যদি মণিপুরে সৈন্য পাঠান হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহিলে, সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্র পাঠাইবার জন্য, রাজা, পাহাড়ী মুটে দিবেন।

৭। ব্রিটিশ রাজ্যের পুর্বাংশে কোন দুর্ঘটনা হইলে, যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহে, তবে মণিপুর রাজ তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশের দ্বারা সাহায্য করিবেন।

৮। তাহার কার্যের জন্য, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সকল যুদ্ধ সামগ্রী দিবেন, রাজাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গোচরার্থে যাহা খরচ হয় তাহার বিস্তারিত তালিকা মাসে মাসে মণিপুর সৈন্য সংশ্লিষ্ট বৃটিশ কর্মচারীকে তিনি দিবেন।" *

---

* Treaty of 1833 :—

"The Governor General and Supreme Council of Hindusthan declare as follows :—

...... With regard to the two ranges of hills, the one called the Kala Naga Range and the other called Nungjai range, which are situated between the eastern and western bends of the Barak, we will give up the claim on the part of the Hon'ble company thereunto, and we will make these hills over in the possesston of the Raja, and give him the line of the Jiri, and the western bend of the Barak as a boundary, provided that the Raja agrees to the whole of what is written in this peaper which is as follows :—

1st—The Raja will, agreably to instructions received, without delay, remove his thana from Chandrapur, and establish it on the eastorn bank of Jiri.

2nd—The Raja will, in no way obstruct the trade carried on between the two countries by Bengalee and Manipuri merchants. He will not exact heavy duties, and he will make a monopoly of no articles of merchandise whatever.

3rd—The Raja will in no way prevent the Nagas inhabiting the Kala Naga and Nungjai ranges of hills from selling or barterting ginger, cotton, pepper and every other article, the produce of their country, in the plains of Kachar, at the Banskandi and Oodherban bazars as has been their custom.

4th—With regard to the road commencing from the eastern bank of the Giri, and continued via Kala Naga and Kowpum as far as the valley of Manipur, after this road has been finished, the Raja will keep it in repairs, so as to enable laden bullocks to passing during the cold and dry seasons. Further, at the making of the road, if British officers be sent to examine or superintend the same, the Raja will agree to every thing these officers may suggest.

5th—With ref. to the intercourse already existing between the territories of the British Govt. and those of the Raja, if the intercourse be futher extended, it will be well in every respect, and it will be highly advantageous to both the Raja and his country. In order, therefore, that this many speedily take place, the Raja at the requisition of the British Govt. will furnish a quota of Nagas to assist in the construction of the road.

6th—In the event of the war with the Burmese, if the troops be sent to Manipur either to protect the country or to advance beyond the Ningthi, the Raja, at the requisition of the British Govt. will provide hill porters to assist in transporting ammunitions and baggage of such troops.

7th—In the event of anything happening on the eastern frontier of the British territories the Raja will, when required, assist the British Govt. with a portion of his troops.

মহারাজা গম্ভীর সিং সমস্ত সর্তই মানিয়া লইয়াছিলেন।

উপরোক্ত সর্তগুলিতে অর্থনৈতিক এবং সামরিক চুক্তি ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন কথা নাই। এবিষয়ে বারবার বিশদভাবে আলোচনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে মণিপুরের সঙ্গে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করা। মণিপুরে তখন ইংরেজের প্রভাব বিস্তৃত হইলেও প্রভুত্ব তখনও কায়েম হয় নাই। গম্ভীর সিং এবং তাঁহার পরবর্তী নরসিং স্বাধীন নরপতি ছিলেন। কিন্তু এস্থলে ইংরেজ সরকারের অর্থে গঠিত এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত মণিপুর লেভির মণিপুর রাজ্যে অবস্থান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। কোন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী অন্য রাষ্ট্রের অর্থে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকা সেই রাষ্ট্রের পক্ষে কোনরূপেই মর্যাদাকর বলিয়া গণ্য হয় না। যে কারণে এবং যে অবস্থায় মণিপুর লেভি গঠিত হইয়াছিল ইয়ান্দাবো চুক্তি, কাছাড় রাজ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিষ্পত্তি, এবং ১৮৩৩ সনে ইঙ্গ মণিপুর চুক্তির পর ইংরেজের পক্ষে মণিপুর লেভির প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। ১৮৩৪ সনের জানুয়ারি মাসে গম্ভীর

8th—The Raja will be answerable for all the ammunition he receives from the British Govt. and will, for the information of the British Govt. give in every month a statement of expenditure to the British officer attached to the levy."

All the provisions of the above treaty with the exception of the last remained in force. The last one became inoperative when the Br. officer connected with the Manipur levy was withdrawn.

সিংহের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা হওয়ার আশঙ্কায় মণিপুর লেভি আরও এক বৎসর ইংরেজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সুদক্ষ সেনাপতি নরসিং নাবালক রাজার অছি স্বরূপ রাজ্যের কর্ণধার হইয়া এক বৎসর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করার পর ১৮৩৫ সনে ইংরেজ সরকার 'মণিপুর লেভি'র ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণভাবে মণিপুর সরকারের হাতে তুলিয়া দেয়। সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গ্র্যান্ট (Major Grant) সমস্ত দায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়া মণিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন গর্ডন (Capt. Gordon) ১৮২৭ সন হইতে উক্ত বাহিনীর এড্‌জুটেন্টের (Adjutant) কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। সৈন্যদল হস্তান্তরিত হওয়ার পর তিনি ১৮৩৫ সনে মণিপুর রাজ্যে ইংরেজ সরকারের পলিটিক্যাল এজেন্ট (Political Agent) নিযুক্ত হন। গর্ডন সাহেব ব্যতীত মণিপুরে তখন দ্বিতীয় ইংরেজ কর্মচারী রহিলেন ক্যাপ্টেন পেম্বারটন (Capt. Pemberton)। পেম্বারটন সাহেব ১৮২৫ সনে গম্ভীর সিংহের সঙ্গে মণিপুরে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি মণিপুরের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণে রত ছিলেন। ১৮৩৫ সনে তাহাকে মণিপুরে যুগ্ম কমিশনারের (Joint Commissioner) পদে নিযুক্ত করা হয়। উপরোক্ত গর্ডন সাহেবই মণিপুর রাজ্যে নিযুক্ত সর্বপ্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট। এই পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং প্রয়োজনমত মণিপুরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। ব্রহ্ম-মণিপুর সীমান্তে গোলযোগের

মীমাংসা করাও তাহার অন্যতম কর্তব্য ছিল। * ইহাতে দেখা যায় যে পলিটিক্যাল এজেন্টের কর্তব্য এবং ক্ষমতা অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজদূতের (Ambassador) চেয়ে বেশী ছিল না। গর্ডন সাহেব কৃতিত্বের সহিত তাহার কর্তব্য পালন করিয়া ১৮৪৪ সনের ডিসেম্বর মাসে মারা যান। মণিপুরীগণ তাহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের এই বন্ধুটিকে মনে রাখিয়াছিল। নরসিংহের শাসনকালে পর পর যে সমস্ত বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল তাহাতে অবস্থা কখনও কখনও সঙ্কটাপন্ন হইলেও ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট সব সময় নিরপেক্ষই ছিলেন। সেইজন্য কোন পক্ষই ইচ্ছাকৃতভাবে পলিটিক্যাল এজেন্টের কর্তব্যে বাধা সৃষ্টি করে নাই গর্ডন সাহেবের মৃত্যুর পর কুলক (Mc Cullock) সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন।

কুমুদিনী মহারাণীর ষড়যন্ত্র ঃ—

মহারাজা গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে মহারাণী কুমুদিনী দেবীর গর্ভে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্তি সিংহের জন্মের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহারাণীর মনে চন্দ্রকীর্তির প্রতি নরসিংহের অভিপ্রায়

* A political Agent first appointed in 1835 when the European officer deputed to supervise the Manipur Levy was withdrawn. He was posted in the valley "for the preservation of a friendly intercourse and as a medium of communication with the Manipur Govt, and as occasion may require, with the Burmese authorities on that frontier and more especially to prevent border feuds, which might lead to hostilities between the Manipuris and the Burmese. (Political correspondence, No. 106)

সম্পর্কে সব সময়ই একটা সন্দেহ ছিল। নরসিংহের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এইরূপ সন্দেহের পিছনে মূলতঃ কোন কারণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। নরসিংহের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিং অনেকদিন যাবৎই তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের উপায় খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোক, নরসিংহের সুশাসনে যেরূপ সন্তুষ্ট ও তাঁহার এবং নাবালক রাজা চন্দ্রকীর্তির প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ছিল তাহাতে তাঁহার দুরভিসন্ধি কার্যে পরিণত করার কোন সুযোগ তিনি পান নাই। অবশেষে কতিপয় দুষ্ট লোকের সাহায্যে মহারাণীর মনে এমন একটি সন্দেহ দৃঢ়রূপে জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন যে, নরসিং অচিরে চন্দ্রকীর্তিকে দেশান্তরিত বা প্রাণে বিনষ্ট করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ গোপনে গোপনে করিতেছেন। সেইজন্য সময় থাকিতেই মহারাণী নরসিংকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া থাঙ্গাল, পাওসাং (Paosang), মন্ত্রীময়ুম নবীন সিং প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লোকদিগকে স্বপক্ষে আনেন। দেবেন্দ্রের প্ররোচনায় তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু মন্ত্রীময়ুম নবীন সিং এই ব্যাপারে মহারাণীকে সমস্ত কৌশল বাৎলাইয়া দিয়া ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেন। আর দেবেন্দ্র রহিলেন ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থায়। তিনিই যে পশ্চাতে থাকিয়া দাবার চাল দিতে ছিলেন তাহা কেহ টের পাইল না। যদি নরসিং মাৎ হন তবে চন্দ্রকীর্তিকে গুম করিয়া সিংহাসনে বসিতে আর কতক্ষণ? আর এই কিস্তি বিফল হইলে চন্দ্রকীর্তিসহ তাঁহার দলের নির্বাসন অনিবার্য। সুতরাং এক্ষেত্রেও নরসিংহের

মৃত্যুর পর তাহাকে সিংহাসনে বসিতে বাধা দেয় এমন সাধ্য কার আছে।

১৮৪৪ সনে একদিন নরসিং যখন শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে উপাসনায় রত ছিলেন তখন মহারাণীর ইচ্ছাক্রমে নবীন সিং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টায় নিজেই প্রহরীদের দ্বারা নিহত হন। নরসিং আহত হইলেও দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া যান। ১৮৩৩ সনের চুক্তি অনুযায়ী মণিপুর সরকারের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন গুথ্রীর (Capt. Guthrie) তত্ত্বাবধানে ১৮৩৭ সনে জিরিঘাট হইতে বিষেণপুর পর্যন্ত নূতন রাস্তা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৪৪ সন পর্যন্ত এই কাজ চলে নবীন সিং কর্তৃক নরসিং আক্রান্ত হওয়ার সময় পলিটিক্যাল এজেন্ট গর্ডন সাহেব অথবা তাঁহার সহকারী কেহই রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা তখন উপরোক্ত রাস্তা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে মহারাণী তাঁহার পুত্রসহ থাঙ্গাল ও পাওসাং-এর সঙ্গে মণিপুর হইতে পলাইয়া কাছাড়ে ইংরেজের আশ্রয়ে চলিয়া যান। পলায়নের সময় তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই নূতন রাস্তা দিয়া না যাওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেন্ট অথবা তাঁহার সহকারীর দেখা হয় নাই। নরসিং এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিজেকে মণিপুরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মণিপুরের লোক নরসিংহের বীরত্বে এবং সুশাসনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল বলিয়া চন্দ্রকীর্তিসহ মহারাণীর পলায়নের পর তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি উঠে

নাই। এই ব্যবস্থা ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ মনঃপূত না হইলেও তাহারা এসম্বন্ধে নিরপেক্ষই থাকেন।

মণিপুরে কুকীদের প্রবেশ ঃ—

কুকীগণ নাগা অথবা মণিপুরী হইতে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়ের লোক। তাহাদের আদি নিবাস কোথায় বলা কঠিন। তবে দক্ষিণে মালয় হইতে আরম্ভ করিয়া কাছাড় ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত।

ইহাদের কোন কোন গোষ্ঠী বহুদিন পূর্ব হইতেই মণিপুর রাজ্যে বসবাস করিতেছিল। কিন্তু ১৮৩০ হইতে '৪০ সনের মধ্যে দলে দলে নূতন কুকী গোষ্ঠী দক্ষিণ হইতে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া পাহাড় অঞ্চলের নাগাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের জায়গা দখল করিতে থাকে। ১৮৪৫ সনে অবস্থা চরমে পৌছায়। মহারাজা নরসিং তখন সবে সিংহাসনে বসিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা তখনও একেবারে দূর হয় নাই। এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে নবাগত কুকীদিগকে দমন করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেবের উপর বিষয়টি ছাড়িয়া দিলেন। কুলক সাহেব এই কুকীসমস্যা সমাধানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া মণিপুরী এবং ইংরেজ মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে কুকী সম্প্রদায় দক্ষিণ হইতে অপেক্ষাকৃত প্রবলতর মানব গোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হইয়া মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে তাহাদের লক্ষ্য চাষ এবং বাসের জমি।

ইহা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কুলক সাহেব তাহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমি বাড়ী দিয়া বসাইয়া দিলেন। এই ব্যাপারে তিনি বহু দলপতিকে নিজের পকেট হইতেও ঋণ দিয়া সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। বহু লোককে সৈন্যদলে অথবা অন্যান্য বিভাগে কাজ দেওয়া হইল। যাহাদিগকে কোন কাজ দেওয়া গেল না তাহারা বেগার খাটিয়া সাহেবের ঋণ শোধ করিতে প্রতিশ্রুত রহিল। এইরূপ হাজার হাজার দুর্ধর্ষ কুকী কুলক সাহেবের ব্যবস্থায় মণিপুর রাজ্যে আশ্রয় পাইয়া আজিও শান্তিপ্রিয় প্রজা এবং সীমান্তের প্রহরীর দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা পর্যন্ত কুলক সাহেবের এই সাফল্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিল।

কাছাড় হইতে চন্দ্রকীর্তির জন্য সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা :—

মহারাণী তাঁহার পুত্রসহ মণিপুর হইতে পলাইয়া কাছাড়ে আসিয়া ইংরেজ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের নিরাপত্তার জন্য সরকার হইতে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, এবং তাঁহাদের ভরণ পোষনের জন্য মণিপুর সরকারের প্রাপ্য কাবো উপত্যকার জন্য ক্ষতি পূরণের টাকা হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। এইরূপ নির্বাসনে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর কাটে। এর মধ্যে মহারাণী তাঁহার পুত্রকে মণিপুরের সিংহাসন ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করার জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট বহুবার আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ নরসিংকে ঘাঁটাইয়া শান্তি নষ্ট করিতে সম্মত হয় নাই। অতঃপর তিনি আসামে যাইয়া সেখানকার কমিশনার ক্যাপ্টেন জেংকিনসের (Capt. Jenkins)

নিকট তাঁহার আবেদন পেশ করেন। অনেক লেখালেখির পর মহারাণীকে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিতে বলা হয়। প্রায় এক বৎসর আসামে থাকার পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া মহারাণী কাছাড়ে চলিয়া আসেন। ১৮৫০ সনে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় কোন সুযোগ মিলিল না।

নরসিংহের মৃত্যু :—

১৮৫০ সন। মণিপুরে ব্যাপক কলেরা মহামারীর প্রকোপে বহুলোক মারা যায়। মহারাজ নরসিংও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলিটিক্যাল এজেন্টের চিঠিপত্রে দেখা যায় নরসিং তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। মণিপুরী মহলে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন নরসিং তাঁহার পুত্রগণের নিকট কাছাড় হইতে চন্দ্রকীর্তিকে আনাইয়া সিংহাসনে বসানর জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নরসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিং কাহাকেও কোন সুযোগ না দিয়া নিজেই সিংহাসনে বসিলেন। নরসিংহের তিনপুত্র তখন কাছাড়ে পলাইয়া গিয়া চন্দ্রকীর্তির দলে যোগ দিলেন।

মহারাজা গম্ভীর সিংহের সময় ব্রজময়ুম ও আনৌবাম এবং মহারাজা নরসিংহের সময় কুলীনময়ুম ও গোসাঁইময়ুম প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পরিবার সমূহের পূর্ব পূর্বপুরুষগণ মণিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ব্রজময়ুম আসিয়াছিলেন শান্তিপুর হইতে।

তিনি গোপালজীর পূজা করিতেন বলিয়া মণিপুরে তাহার উপাধি হইল ব্রজময়ুম। আনৌবাম আসিয়াছিলেন আগরতলা হইতে; আনৌবা শব্দের অর্থ নূতন—সেইজন্য এই নবাগতকে বলা হইল আনৌবাম। কুলীনময়ুম আসিয়াছিলেন বরানগরের কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার হইতে সেইজন্য তিনি হইলেন কুলীনময়ুম। কুলীন ময়ুম কালী সাধক ছিলেন। তিনিই বোধ হয় মণিপুরে সর্বপ্রথম কালীপূজা প্রচলন করেন, কিন্তু মণিপুরিগণ তাহাদের হৃদয়ের যে আসনে সুদর্শন কালোকে বসাইয়াছে সেই স্থান ভৈরবী কালীকে ছাড়িয়া দিতে তাহাদের মন সাড়া দিল না। সেইজন্য মণিপুরে কালীপূজা এখনও ততটা জনপ্রিয় হয় নাই। গোসাঁইময়ুম আসিয়াছিলেন শান্তিপুর হইতে; তাঁহার পূর্ব উপাধি ছিল গোস্বামী —সেইজন্য তিনি হইলেন গোসাঁইময়ুম। আসামের খারাদত হইতে আচার্য উপাধিধারী একজন কথক ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন, মণিপুরী ভাষায় কথককে বলা হয় ওয়ারিলিবাম, সেইজন্য তাহার উপাধি হইল 'ওয়ারিলিবাম'।

মহারাজা নরসিং কীর্তন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময় 'নীপা-পাল্লা' নামক কীর্তনের বিশেষ উন্নতি হয়। 'নীপা-পাল্লার' গায়কগণ সকলেই পুরুষ, তাহারা পাগড়ি, মালা, বহু ভাঁজকরা দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসরে কীর্তনের প্রাচীন এবং নূতন বিভিন্ন গান গাহিয়া থাকে। ঝুলন এবং দুর্গা পূজার সময় যে "ধোপ-পাল্লা" গাওয়া হয় তাহারও গম্ভীর সিং এবং নরসিংহের সময় জন্ম হয়। গোস্বামী কৃষ্ণদাস ঠাকুরের নিকট হইতে ভাব এবং

অনুপ্রেরণা লইয়া তাঁহারা এই নূতন পালা কীর্তনের রূপ দেন। রাজ পরিবারের মেয়েরাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া জল-কেলি এবং 'রাসেশ্বরী-পাল্লা' অভিনয় করিতেন। সাধারণতঃ নরসিংহের পরিবারের মেয়েরা সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার অঙ্গে জল ছিটাইয়া 'জল-কেলি' করিতেন। আর কর্তা অর্থাৎ মহারাজা জয়সিংহের বংশের মেয়েরা রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসের অভিনয় করিয়া 'রাসেশ্বরী পাল্লা' গাহিতেন।

(দশ)

মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিং

চন্দ্রকীর্তির সিংহাসন উদ্ধার

মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু সময়ে চন্দ্রকীর্তিব বয়স হয় প্রায় আঠার। তিনি মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াইয়া সদলবলে জিরি নদী পার হইয়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখান হইতেই তিনি পলিটিক্যাল এজেণ্টকে তাঁহার সঙ্কল্প জানাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্র সিংহের প্রতি মণিপুরের কোনরূপ আনুগত্য ছিল না। চন্দ্রকীর্তি যতই অগ্রসর হইতেছিলেন ততই তাঁহার দল বাড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রের চেষ্টা সত্ত্বেও মণিপুরীগণ গম্ভীর সিংহের পুত্র চন্দ্রকীর্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সম্মত হইল না। দেবেন্দ্র সিংহের বিশ্বস্ত সৈন্যগণও চন্দ্রকীর্তির বশে আসিয়া গেল। নিরুপায় দেবেন্দ্র সিং মাত্র তিন মাস রাজত্ব করার পর কাছাড়ে যাইয়া আশ্রয় লইলেন কিন্তু সিংহাসন উদ্ধারের সঙ্কল্প তখনও মনে মনে রহিয়া গেল।

দেবেন্দ্র সিং সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁহাকে মণিপুরের রাজা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট সুপারিশ পত্র দিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার হইতে এই অনুমোদন দেবেন্দ্র সিংহের পলায়নের ১১ দিন পর পলিটিক্যাল এজেণ্টের হাতে আসে। তখন ইহার কোন মূল্য রহিল না। এদিকে চন্দ্রকীর্তি সিং সিংহাসনে উপবেশনের পর নরসিংহের পুত্র ভুবন সিংকে যুবরাজপদে এবং ২য় পুত্র সেতু সিংকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। নরসিংহের

পুত্রদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত যে বেশী দিন টিকিবে না তাহা পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব ভাল করিয়াই জানিতেন। এ দিকে দুই মাস যাইতে না যাইতেই দেবেন্দ্র সিং সিংহাসন উদ্ধারের বাসনায় কাছাড় হইতে মণিপুর আক্রমণ করিলেন। মণিপুরের সৈন্য তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ করে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চন্দ্রকীর্তি দেবেন্দ্র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবেন এই বিশ্বাসে সুবিধা-বাদিগণ প্রজাদিগকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে। লোকে চন্দ্রকীর্তির প্রতি বিরূপ হইয়া সিংহাসনে পুনরায় দেবেন্দ্রকে কামনা করিতে থাকে। তাঁহার উপদেষ্টাগণও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দেবেন্দ্রসিং এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পুনরায় দলবল লইয়া মণিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কাছাড়ের কর্মচারীগণ তাঁহার মতলব টের পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীহট্টে চালান দেয়। তাঁহার ভাগ্য এই ভাবে বিড়ম্বিত না হইলে এ যাত্রায় তাঁহার চেষ্টা সম্ভবত বিফল হইত না। শ্রীহট্ট হইতে পরে তাঁহাকে ঢাকায় চালান দেওয়া হয়। ১৮৭১ সনে নভেম্বর মাসে তিনি মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে কাবো উপত্যকা বাবদ মণিপুরের প্রাপ্য অর্থ হইতে মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইত।

এ দিকে ইংরেজ সরকার হইতে ইতিপূর্বেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে যতদিন পর্যন্ত মণিপুরের রাজা সিংহাসনে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম না

হইবেন ততদিন পর্যন্ত কাবো উপত্যকার জন্য মণিপুরের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকিবে। এই অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকায় চন্দ্রকীর্তি পলিটিক্যাল এজেন্টের উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। এমনও কথা হইল—যদি বৃটিশ সবকার অবিলম্বে এই অর্থ না দেয় তবে কাবো উপত্যকা জোর করিয়া দখল করা হইবে। নির্বাসন কালে চন্দ্রকীর্তি সিংহাসন উদ্ধারেব জন্য ইংরেজেব নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায় বোধ হয় তাঁহার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। তাহার উপর কাবো উপত্যকার টাকা বন্ধ করা এবং তাঁহাকে তখনও সরকারীভাবে মণিপুরের রাজা বলিয়া গ্রহণ না করা তাঁহার ইংরেজবিদ্বেষের মূলে আরও ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

তাঁহার এইরূপ বাড়াবাড়িতেও পলিটিকাল এজেন্টের মনে বিশ্বাস ছিল—চন্দ্রকীর্তি শীঘ্রই তাঁহার নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আশঙ্কা হইয়াছিল তৎকালীন অরাজকতার সুযোগে ব্রহ্ম সরকাব আভার রাজ দরবারে আশ্রিত রাজকুমার নিবিড়জিতের পক্ষে মণিপুর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা না করে। ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে অবস্থা আরও চরমে পৌঁছে। তখন মণিপুর রাজ্যের উত্তরে এক নাগা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজের শত্রুতা চলিতেছিল। পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া মণিপুর সরকার এই বিদ্রোহী নাগাদিগকে সাহায্য করে। এই ঘটনা যথাকালে বৃটিশ সরকারের গোচরে আনা হইলে মণিপুরের রাজার নিকট এক কড়া চিঠি আসে। * অবশ্য ইহার পরই মণিপুর সরকার সাবধান হইয়া

* In reply Govt. administered a rebuke to the Manipur

যায় এবং ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কেরও উন্নতি হয়। চন্দ্রকীর্তি স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব তখন চন্দ্রকীর্তিসিংকে সরকারীভাবে মণিপুরের রাজা বলিয়া গ্রহণ করার জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ পত্র দেন। ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার কুলক সাহেবের মারফৎ নিম্নোক্ত সঙ্কল্প মণিপুর সরকারকে জানায়।

"(মণিপুরের রাজা) চন্দ্রকীর্তি সিংকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার চেষ্টা, বারম্বার হইতে লাগিল; তাহাতে দেশের শান্তি নষ্ট ও ব্রিটিশ প্রভুত্ব হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হইল। এজন্য গভর্ণমেন্ট, চন্দ্রকীর্তি সিংহকে মণিপুরের সিংহাসনে স্থায়ী রাখিতে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিমাত্রকেই শাস্তি দিতে, বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন।"*

এই ঘোষণার অল্প দিনের মধ্যেই দেবেন্দ্রসিংহের এবং নরসিংহের

Raja, and reminded him that his state existed only by the sufference and countenance of the British Govt. At this the state of affairs improved considerably; the Raja evidently being recalled to a proper sense of this position, and ruling with a greater regard to the rights and feelings of his subjects."

* Mc Culloch.........received authority to "make a public avowal of the determination of the British Govt. to uphold the present Rajah and to resist and punish any parties attempting hereafter to dispossess him." Treaties by Achison. vol 1. page 248.

পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া চন্দ্রকীর্তির হস্তে পরাজিত হন। তাহাদের দেখাদেখি মধুচন্দ্রের দুই পুত্র এবং মারজিত সিংহের পুত্র কানাই সিংও সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র কানাই সিং মণিপুর হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই সব বিদ্রোহের পর ১৮৫২ সনের মে মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স (Court of Directors) পলিটিক্যাল এজেন্টকে মণিপুরের রাজার উপদেষ্টা এবং পরিচালক হিসাবে কাজ করার নির্দেশ দেয়। প্রজাগণ কোন সময়ে উৎপীড়িত হইলে তাহা নিবারণের অনুমতিও তাহাকে দেওয়া হয়। *

এই ভাবে মণিপুরে ঘন ঘন রাজদ্রোহ এবং রাজা বদল হওয়ার ফলে ভারত সরকার মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাইয়া কাগজে পত্রে (dejure) না হইলেও কার্যত (defacto) মণিপুর রাষ্ট্রের অভিভাবকস্থানীয় (sovereign) হইয়া দাঁড়াইল। তখনকার দিনে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবর্তমানে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে প্রবলতর প্রতিবেশীর সর্বদা মুখাপেক্ষী থাকিয়া নিজের পুরাপুরি

* The Court of Directors of the East India Co., in a despatch dated May 5th, 1852, confirmed the order of the Govt. of India and commented thus: "The position you have assumed of pledgod protection of the Rajah imposes on you as a necessary consequence the obligation of attempting to guide him, by your advice, but, if needful, of protecting his subjects against oppression on his part; otherwise our guarantee of his rule may be the cause of inflicting on them a continuance of reckless tyranny.

স্বাধীনতা বজায় রাখা একরূপ অসম্ভব ছিল। মণিপুরের অপর প্রতিবেশী ব্রহ্মরাষ্ট্রও যদি ব্রিটিশের মত হইত তবে মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইরূপ হস্তক্ষেপ করার ঘোষণায় তীব্র প্রতিবাদ হইত। মহারাজা চন্দ্রকীর্তি যখন দেখিলেন কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সের ঘোষণায় মণিপুরের সিংহাসনে তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরদের দখল পাকাপাকি হইল তখন তিনি ইহার পরিণামের কথা না ভাবিয়া প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরংচ খুশিই হইলেন। ইহার পর ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ৩৫ বৎসর তিনি নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিয়া গেলেন।

কিন্তু মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রহণের সময় ইংরেজ সরকারের যেরূপ আগ্রহ এবং সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল, শাসনব্যবস্থার উন্নতি করা সম্বন্ধে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থা অপরিবর্তিতই রহিল। পূর্বে বিদ্রোহের ভয়ে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য শাসন ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবর্তন ও সংশোধন করা হইত, সিংহাসনের পশ্চাতে ইংরেজ শক্তির সমর্থন পাওয়ার পর রাজা এ বিষয়ে আর কোন রদ বদলের চেষ্টা করিলেন না। ইংরেজ সরকারও নিজেদের ষোল আনা সুবিধা আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট, মণিপুর রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে তাহাদের তেমন কোন গরজ ছিল না।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মণিপুর ঃ—

১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার তাপ মণিপুরের গায়েও আসিয়া

লাগে। চট্টগ্রামের সৈন্যাবাস হইতে সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিয়া কাছাড় অভিমুখে আসিতেছিল; কিন্তু শ্রীহট্ট জেলার সীমান্তে লাতু (Latu) নামক স্থানে সরকারের বিশ্বস্ত সৈন্যর (44th Native Infantry) নিকট বাধা পাইয়া তাহারা মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই সময় কাছাড়ে অবস্থিত চৌরজিত সিংহের অন্যতম পুত্র নরেন্দ্রজিৎ সিং (অপর নাম চহি অহুম *) মণিপুরের সিংহাসন দখলের আশায়—ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। মণিপুরের তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব চট্টগ্রামের সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই, তাহারা যাহাতে মণিপুরে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য মহারাজা চন্দ্রকীর্তিকে পশ্চিম সীমান্তে একদল সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করেন। এই স্থানে ইহা উল্লেখ করা সঙ্গত যে সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের সম্মুখে ইংরেজ বিতাড়ন ছাড়া স্বাধীন ভারতের কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। পক্ষান্তরে বাহাদুর শাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দ্বারা যে অচল মোগল হুকুমতকে চালু করার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে প্রাক্তন মোগল এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলের লোকদের উল্লাসের কোন কারণ ছিল না। বিদ্রোহীদের নেতাগণও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের সমর্থন পাওয়ার কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সব কারণে মণিপুরের জনসাধারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিরপেক্ষই ছিল। মহারাজা

* চহি অর্থ বৎসর, অহুম অর্থ তিন; শুনা যায় নরেন্দ্রজিৎ সিং নাকি মাতৃগর্ভে তিন বৎসর ছিলেন—সেইজন্যই তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল চহি অহুম।

চন্দ্রকীর্তি তখন একে ইংরেজের প্রতি আস্থাবান ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ নরেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে বিপদটা তাঁহার ঘাড়েও আসিয়া পড়িল। তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টের কথামত অবিলম্বে দুই জন মেজরের অধীন ৪ শত সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে বিদ্রোহী সিপাহীগণ মণিপুরে প্রবেশের সময় তাহাদের হস্তে পরাজিত হইয়া অধিকাংশই নানাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নরেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট অর্পণ করা হয়। বাকী জীবন তাহার নির্বাসনেই কাটে। সিপাহী বিদ্রোহ শান্ত হওয়ার পর ১৮৫৯ সনে বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ সরকার হইতে মহারাজা চন্দ্রকীর্তিকে পোশাক ও তরবারি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং মণিপুরের ৮ জন কর্ম্মচারীকে নানা পুরস্কার ও পদক দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ পুত্রদের সিংহাসন দখলের চেষ্টা

সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল হইতে রক্ষা পাইলেও মণিপুরের ভাগ্যচক্রে দুষ্ট গ্রহের কোপ প্রশমিত হইল না। বিভিন্ন রাজপুত্রদের রাজ্যলোভ সময়ে সময়ে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া গভীর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু মণিপুর সরকারের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গম্ভীরসিংহের অন্যতম বংশধর মাইপাক (Mypak) প্রথম ১৮৫৯ সনে এবং পরে ১৮৬২ সনে এই দুইবার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৮৬৪ সনে মারজিতের পুত্র কানাই সিং পুনরায় কাছাড় হইতে মণিপুর আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য তাহাকে

জিরি নদী পার হইতে দেয় নাই। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৮৬৬ সনে দেবেন্দ্র সিংহের অন্যতম পুত্র গোকুল সিং একশত অনুচর লইয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু মহারাজের সৈন্যের হস্তে তাহারা পরাজিত হয়। গোকুল সিং অবশেষে ১৮৬৮ সনে কুচবিহার রাজ্যে ধরা পড়িয়া ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কানাই সিং দুই বৎসর পূর্বেই ধরা পড়িয়া ছিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে হাজারিবাগ জেলে রাখা হয়। মণিপুর সরকার হইতে তাঁহাদের প্রত্যেককে মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইত। ১৮৬৬ সনে গোকুল সিংহের আক্রমণের পর ইংরেজ এলাকায় মণিপুরের উপর হামলা করিতে সক্ষম তেমন আর কোন রাজকুমার রহিলেন না। দেবেন্দ্র সিং ইতিপূর্বেই মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র নিরজিৎ সিং এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শৈকর সিংকেও (Shaikar Singh) ঢাকায় রাজবন্দী হিসাবে রাখা হইল। কানাই সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্জয় সিং (Durjai Singh) আগরতলায় ছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে মণিপুর সরকারের কোন অভিযোগ ছিল না।

কোহিমায় বিপন্ন ইংরেজ ঘাঁটি রক্ষায় মহারাজার সাহায্যঃ—

মণিপুর রাজ্য এবং নাগা পাহাড়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট ভৌগোলিক সীমা রেখা নাই। ১৮৪২ সনে ইংরেজ সরকারের পক্ষে লেপ্টেন্যান্ট বীগস্ (Lt. Biggs) এবং মণিপুর রাজ দরবারের পক্ষে পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন গর্ডন মণিপুর এবং নাগা পাহাড়ের মধ্যে আন্দাজমত একটি সীমা রেখা টানিয়া দেন। কিন্তু স্থানীয় নাগা সম্প্রদায় এই বীগস্-গর্ডন রেখার কোন তোয়াক্কা না রাখায়—ইহার অস্তিত্ব কাগজে

পত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল। ইংরেজ সরকার ও এ অঞ্চলে তাহাদের হুকুমৎ বজায় রাখিতে তেমন মনোযোগী ছিল না। ফলে অনবরত নাগাদের স্বেচ্ছাচরিতায় বিরক্ত হইয়া ১৮৫১ সনে বীগস্-গর্ডন রেখার অপর পারে ইংরেজ এলাকাধীন নাগা গ্রাম গুলির শাসন ভার সাময়িক ভাবে মণিপুর সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেয়। তাহা হইলেও এই বীগস্-গর্ডন-রেখা সম্বন্ধে মণিপুরের গোড়া হইতেই আপত্তি ছিল। মণিপুরের রাজারা প্রাচীন কাল হইতেই নাগা পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে—খাজনা আদায় করিতেন। সুতরাং এক্ষণে ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপর তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। অবশেষে পলিটিক্যাল এজেন্ট জনষ্টনের আমলে মণিপুরকে নাগা পাহাড়ের আরও কতক অংশ দিয়া খুশী করা হইল।

নাগা পাহাড়ে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য তখন সামাগুডতিংএ (Samagudting) একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট থাকিতেন কিন্তু তাহার শাসিত অঞ্চল প্রকৃত পক্ষে সামাগুডতিং এবং উহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অশাসিত অঞ্চলের নাগাদের সঙ্গে ছোট খাট ঘটনা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। ১৮৭৭ সনে মজুমা (Mozzuma) গ্রামের সঙ্গে যখন ঝগড়া বাধে তখন পলিটিক্যাল এজেন্ট জনষ্টন সাহেব মন্ত্রী বলরাম সিং সহ মণিপুর হইতে সৈন্য লইয়া—নাগা পাহাড়ের উক্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের সাহায্যের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। অর্ধেক রাস্তা যাইতে না যাইতেই মহারাজের নিকট হইতে খবর আসিল ব্রহ্মের

সামন্ত সুমজোক রাজা (Sumjuok Rajah) কাবো উপত্যকার সংলগ্ন মণিপুর রাজ্যের সীমান্ত রক্ষী কোঙ্গল থানা (Kongal Tannah) আক্রমণ করিয়া ৮ জন লোককে হত্যা করিয়াছে। এই ব্যাপারে সমস্ত মণিপুরে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মণিপুরের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্টের অন্যতম প্রধান কর্তব্য; সুতরাং জনষ্টন সাহেবের পক্ষে আর নাগা পাহাড়ের দিকে যাওয়া সম্ভব হইলনা। তিনি একাকী মণিপুরে ফিরিয়া আসিয়া থাঙ্গাল মেজরকে সঙ্গে লইয়া কোঙ্গাল (Kongal) ঘটনার তদন্তের জন্য যাত্রা করিলেন। তদন্তের পর ভারত সরকারকে তিনি জানাইলেন যে মণিপুরের উপর এইরূপ অবাঞ্ছিত আক্রমণের জন্য ব্রহ্ম সরকারই দায়ী। ইহার কোন প্রতিকার না করিলে মণিপুর সরকার ভারত সরকারের অগোচরে তাহাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থের চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তখন ইহার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আশ্রিত মণিপুর রাজ্যের রাজ দরবার ভারত সরকারের এইরূপ উদাসীনতাকে দুর্বলতা বলিয়া মনে করিয়াছিল *। ব্রহ্ম এবং মণিপুরের এই সীমানা সম্পর্কিত বাদ বিতণ্ডা ১৮৮১ সন পর্যন্ত চলিয়াছিল; অবশেষে ভারত সরকার এ সম্বন্ধে পাকাপাকি মীমাংসা করার জন্য জনষ্টন সাহেবকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া ঐ এলাকায় পাঠায়।

* '...Failure to do justice would eventually lead to underhand reprisals on the part of Manipur, as the Durbar could not understand our Govt. tolerating an attack of this kind on a *protected state* and naturally ascribed our forbearance to weakness.'

ব্রহ্ম সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও জনষ্টন সাহেব ১৮৮১ সনে সাফল্যের সহিত মণিপুর রাজ্যের পূর্ব সীমানা সুনির্দিষ্ট করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্ম সরকারও পরে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়।

এদিকে জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত সৈন্য নাগা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিয়াছিল তাহারা তাহার ফিরিয়া আসার পরও গণ্ডগোল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মণিপুর সীমান্তে ছিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী নাগাগণ ইংরেজের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া একবার মহারাজ চন্দ্রকীর্তির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিল। তখন পর্যন্তও তাহাদের ধারণা ছিল ব্রিটিশ এবং মণিপুর রাষ্ট্রের মধ্যে মণিপুরই অধিকতর বলশালী। মহারাজা তাহাদের এই আবেদন মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে যদি অবিলম্বে তাহারা ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ না করে তবে তাহদের বিরুদ্ধে মণিপুর হইতে আরও সৈন্য পাঠান হইবে। ফলে সেবারের মত নাগা বিদ্রোহ এইখানেই শেষ হইল।

১৮৭৮ সনে নাগা পাহাড়ের শাসনকর্তা দমন্ত সাহেব (Mr. Damant) সামাগুডতিং হইতে শাসন কেন্দ্র কোহিমাতে স্থানান্তরিত করেন। তাহার পর হইতেই সেখানকার আঙ্গামি নাগাদের (Angami Naga) সঙ্গে বিরোধ চলিতে থাকে। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে আঙ্গামিদের দ্বারা কোহিমায় ইংরেজ শাসন কেন্দ্র আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মণিপুরে খবর আসে। সেখানে তখন যথেষ্ট ইংরেজ সৈন্য ছিলনা, এবং রসদেরও অভাব ছিল; একথা জনষ্টন

সাহেব আগেই জানিতেন। সুতরাং উপরোক্ত সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া মহারাজের নিকট সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিলেন। ইতিমধ্যেই নাগা পাহাড়ের সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট কাওলে সাহেবের (Mr Cowley) চিঠি আসিয়া পৌছে। তাহাতে জানা যায় দমন্ত সাহেব হত হইয়াছেন, এবং বাকী সকলের অবস্থাও অবরুদ্ধ হওয়ায়—অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ; কখন কি হয় বলা যায় না ; অবিলম্বে উদ্ধার না করা হইলে স্ত্রী পুরুষ সমেত তাহাদের একটি প্রাণীও বাঁচিবে না। মহারাজা বিনা দ্বিধায় তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া বিপন্ন ইংরেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। পাঁচবার বন্দুকের আওয়াজের সঙ্কেত ধ্বনির সাহায্যে রণক্ষম যুবকদিগকে জড় করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে দেওয়া হইল। মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ শূরচন্দ্র তৃতীয় পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ (অপর নাম কোরং) এবং থাঙ্গাল মেজর মণিপুরী সৈন্য পরিচালনার জন্য সাহেবের সঙ্গে গেলেন। এজেন্সির (Agency) প্রয়োজনে মণিপুরে তখন কাছাড়ের ৫০ জন পুলিস এবং ৩৪ নং ব্রিটিশ আর্মির (34th B. I.) ৩৪ জন সিপাহী উপস্থিত ছিল। তাহাদিগকেও সঙ্গে লওয়া হইল। জনষ্টন সাহেবের বিবরণে দেখা যায় অভিযানের গোড়ার দিকে টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজরের পক্ষ হইতে আশানুরূপ সহযোগিতা তিনি পান নাই। যুবরাজ শূরচন্দ্র কিন্তু অচিরেই তাঁহার কর্তব্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে শূরচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত

হওয়ার পর ইংরেজ সরকারেব নিকট তাঁহার আবেদনে উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজর কতৃক উপরোক্ত আচরণের বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহারা সকলে মাঁথি ফুম (Mythe phum) আসিয়া টের পাইলেন,—ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নাগাদের এই গণউত্থানের ফলে মণিপুরের নাগাদের মধ্যেও ইংরেজ বিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়াছে; এই অবস্থায় রাজধানী হইতে আরও সৈন্য আসিয়া না পৌছা পর্যন্ত তাঁহারা জনষ্টন সাহেবের কথা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে ইতস্তত করিয়াছিলেন। এদিকে অবিলম্বে কোহিমায় পৌঁছিতে না পারিলে যে উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়া তাহা হয়ত বিফল হইবে। নাগাদের হস্তে বন্দী সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ পলাইয়া আসিয়া অবরুদ্ধ ইংরেজ ঘাটির সঙ্কটজনক অবস্থার কথা জানাতে জনষ্টন সাহেব টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজরের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শূরচন্দ্র সহ যথা সময়ে কোহিমায় পৌছিয়া অবরুদ্ধ ইংরেজ ঘাঁটির সৈন্য এবং কর্মচারীদিগকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজর অবশেষে মত পরিবর্তন করিয়া জনষ্টন সাহেবের পৌছার পর সেইদিনই কোহিমাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের আগমনের ফলে নাগারা একেবারে দমিয়া গেল। সুতরাং মতানৈক্যবশত উপরোক্ত সামান্য অপ্রিয় ঘটনাটি বাদ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় এই যুদ্ধে মণিপুরী সৈন্যের সাহায্য না পাইলে শুধু যে অবরুদ্ধ ইংরেজ স্ত্রী পুরুষের জীবন নষ্ট হইত তাহা নহে—আসামের সমস্ত উপজাতীয় অঞ্চল হইতেই বৃটিশের তল্পিতল্পা গুটাইতে হইত।

মহারাজ চন্দ্রকীর্তির কৃপায় এতদঅঞ্চলে সেই ঘোরতর দুর্দিনে ইংরে-জের ধন মান প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল।

গিরিজনদের উপর মণিপুর সরকারের প্রভাব বিস্তার

মণিপুরেব সৈন্য বিভাগে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে গিরিজনদের উপর মণিপুব সরকারের প্রভাব নাম মাত্রই ছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন উপজাতি নিজেদেব মধ্যে প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি করিত। উপত্যকা অঞ্চলেও যে সময় সময় তাহাদের দৌরাত্ম্য চলিত না এমন নয়, তবে সেখানে অশ্বারোহী মণিপুরী সৈন্য দর নিকট তাহারা ততটা পারিয়া উঠিত না। তাহা ছাড়া অন্যান্য পার্বত্য জাতিদের মত তাহারা ও নিজ নিজ এলাকা হইতে বেশী দূরে যাইতে সাহস করিত না। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে তাহারা একরূপ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই সব কারণে রাস্তাঘাট অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল থাকায় বাহি-রের সঙ্গে মণিপুরেব যোগাযোগ খুব সহজ ছিল না। এমন কি মণিপুর হইতে কাছাড়ে যাইতে হইলে ও বেশ বড় একটি সশস্ত্র বাহিনী সঙ্গে না থাকিলে নিরাপদে পৌছার সম্ভাবনা কম ছিল। ব্রহ্মদেশের সৈন্য মণিপুর দখল করার সময়-ও তাহারা গিরিজনদিগকে অপ্রয়োজনে ঘাটাইতে যায় নাই। ইহাদের স্বভাব তাহাদের আগেই জানা ছিল। নাগারাও অবশ্য তাহাদের ভয়ে দূরে দূরেই থাকিত। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে তাহাদের এই ভয় কাটিয়া গেল। সুযোগ মত তাহারা পশ্চাদপসরণরত ব্রহ্মের সৈন্যদিগকে নাস্তানাবুদ করিতে ছাড়ে নাই। ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অব্যবহিত পরই মহারাজা গম্ভীরসিং আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই কাবুই তাঙ্খুল, আঙ্গামি

প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিদিগকে কতকটা সংযত করিতে সমর্থ হইলেন। পরবর্তী মহারাজা নরসিং এবং চন্দ্রকীর্তির আমলে রাজ্যের গিরিজনদের মধ্যে মণিপুর সরকারের প্রভাব আরও দৃঢ় হয়।

চাষাদ কুকীদের বিদ্রোহ

১৮৭৯ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজধানীতে খবর আসিল, রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তবর্তী চাষাদ গ্রামের দুর্ধর্ষ কুকীদের নেতা তোংঘু (Tonghoo) সুমজোকরাজার (Sumjak raja) প্ররোচনায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পার্শ্ববর্তী তাংখুল গ্রাম চীংসও (Chingsow) এর উপর হামলা করিয়া জিনিষপত্রসহ ৪৫জন লোকের মাথা কাটিয়া লইয়া যায়। মণিপুরের মহারাজা সমস্ত প্রজাদের ধন-প্রাণের রক্ষক। সুতরাং চাষাদ গ্রামের এইরূপ স্বেচ্ছাচার বন্ধ করিয়া রাজ্যে শান্তি রক্ষা করিতে মণিপুর সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মহারাজের অনুরোধে জনষ্টন সাহেব একদল মণিপুরী সৈন্য সহ উপদ্রুত অঞ্চলে যাইয়া শান্তি স্থাপন করিয়া চাষাদ গ্রামের কুকীদিগকে বশে আনেন। তংঘু মণিপুরের শাসন মানিয়া লয়। ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত ইহারা মণিপুরের অন্যতম শান্তিপ্রিয় এবং অনুগত প্রজা হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ১৮৯১ সনের রাষ্ট্র বিপ্লবের পর ইংরেজ সরকারের চর মহারাজ কুলচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার জন্য সমস্ত মণিপুর পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল তখন পরিণামের কথা না ভাবিয়া এই চাষাদ গ্রামের কুকীরাই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া-

মণিপুরের মহারাজের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল।

১৮৭৯ সনের চাষাদ কুকীদের এই বিদ্রোহ আজ হইতে প্রায় ৭৪ বৎসর আগের ঘটনা। এর মধ্যে হইতে মণিপুর রাজ্যে কত অদল বদল হইয়াছে ; গৃহাং, চাষাদ হুন্দুং (Hoondoong) গমনং সাংশাকের উপর দিয়া—জাপান, আজাদ হিন্দ এবং ইংরেজ আমেরিকার ফৌজ বহুবার যাতায়াত করিয়াছে, দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়া মটর রাস্তা তৈরী হইয়াছে, যুদ্ধের সময় কত ট্যাঙ্ক চলিয়াছে, আকাশে কত বোমারু বিমান উড়িয়াছে, চাষাদে সীমান্তরক্ষী সৈন্যর ক্যাম্প বসিয়াছে —কিন্তু জনষ্টন সাহেব বর্ণিত হুডুংএর সেই তাংখুল গ্রাম, সেই মনোহর 'ফার' বনের মধ্য দিয়া চাষাদের আঁকা বাঁকা পথ, কোথাও কোথাও দুই পাশে দীর্ঘ ওক গাছেব সারি ; মাঝে মাঝে ঝুম চাষের জন্য অর্ধ দগ্ধ অরণ্য, —এখনও সেই বর্বর যুগের বীরত্বের কাহিনী, প্রতিদিন-কার নানা সুখ দুঃখের ঘটনা বহুল মানুষের ইতিহাস আধুনিক যুগের সভ্যতাভিমানী লোকের ঘৃণিত লোভ এবং জিঘাংসার নীরব সাক্ষ্য বহন করিতেছে। চাষাদে সেই কুকী গ্রামটি এখনও আছে, তবে আগের মত তেমন জনবহুল নয়,—অনেকে খৃষ্টান হইয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছে, যুদ্ধের সময় যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে ফিরে নাই। বিদ্রোহী নেতা তংখুর বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে কুলাকপার (গ্রামের নেতা বা রাজা) পদ অধিকার করিয়া আসি-তেছে, কিন্তু কুকীদের সেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতি আর নাই ; তাহারা এখন শান্ত এবং নিরীহ ; মাথা কাটার কথা মনে করাইয়া দিলে লজ্জিত হয়।

গত ভারতীয় পার্লামেন্টের এবং মণিপুর ইলেক্টোরাল কলেজের (electoral college) নির্বাচন উপলক্ষে সেখানে যখন যাই, তখন অতিথির প্রতি তাহাদের কত আদর আপ্যায়ন ; অথচ তথাকথিত সভ্য মানুষের সঙ্গে তাহাদের কতটুকুই বা যোগাযোগ, আর কি-ই-বা পাইয়াছে তাহাদের কাছ হইতে। ইম্ফাল, পায়ে হাঁটা পথে ৪।৫ দিনের রাস্তা কালে ভদ্রে যে এক আধখানা জীপ-গাড়ী আশে পাশে আসে- তাহাও তাহাদের জন্য নয়। বাহিরের লোকের মধ্যে সেখানে আছে মাত্র আসাম-রাইফেলের ৫০।৬০ জন নেপালী সৈন্য। ইহাদের আচরণ ত সকলেরই জানা। তথাপি অপর সকলের মত চাষাদের লোকেরাও হানাহানির চেয়ে নির্বাচনের উপ-যোগিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে। মৃত ছাড়া আর সমস্ত স্ত্রী পুরুষ ভোটারই নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে আসিয়া ভোট দিয়া গেল, কোন গণ্ডগোল চীৎকার বা জাল জুয়াচুরি কিছুই দেখা গেল না। অথচ কংগ্রেসী, সমাজতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, সাম্প্রদায়িক-কতাবাদী কোন মত বা দলের প্রার্থীর বাক্স সেই কেন্দ্রে না ছিল ? নির্বাচনের পর দেখা গেল সমাজতন্ত্রবাদী প্রার্থীরা বেশীর ভাগ ভোট পাইয়াছেন। মণিপুরে এমন কি ভারতের অন্যত্র এরূপ নির্বাচক মণ্ডলী আর কয়টি আছে বলা কঠিন। তাহাদের এই গুণ আমরা উপস্থিত কয়জন ছাড়া আর কাহার চোখেই বা পড়িয়াছে বা পড়িবে, এবং কেই-বা ইহার মর্যাদা দিবে ? নির্বাচন শেষ হইয়াছে ত লেঠা চুকিয়াছে। খবরের কাগজ, পুরস্কার মেডেল, বাহাবা এ সবই ত তথাকথিত বাবু ভাইয়াদের জন্য। রাজ নৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ না থাকিলে নিছক গুণের আদর করার

সময় কয়জনের আছে? চাষাদ কুকীদের সারল্যে এবং আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার লেখা পাঠের ধৈর্য এবং সময় খুব কম লোকেরই হইবে জানি—এবং আমার কলমের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাদের ঋণ শোধ করার চেষ্টাও বৃথা। সভ্য জগৎ আজ আতিথেয়তা ভুলিয়া গেলেও ইহাদের কাছে তাহা নিতান্ত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি শুধু আমার মুষ্টিমেয় পাঠকদের কাছে এই কথাটি জানাইতে চাই।

মহারাজাকে কে-সি-এস-আই উপাধি প্রদানঃ—

১৮৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে জনষ্টন সাহেব নাগা পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া ইম্ফালে চলিয়া আসেন। সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় সেখানে ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু লুসাই সীমান্তে ইংরেজ এলাকায় হাঙ্গামা বাধায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল। মেরমা (Merma) নামক উপজাতির লোকেরা কাছাড়ে বালাধন চা ফেক্টরী আক্রমণ করিয়া একজন সাহেব কর্মচারী এবং কতিপয় কুলিকে নিহত করায় অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। জনষ্টন সাহেব মণিপুরের রাজ দরবারের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে ২০০ মণিপুরী সৈন্য কাছাড়ে জিলা সরকারের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৮০ সনের ২০ শে ফেব্রুয়ারী আসামের চীফ কমিশনার স্যার ষ্টুয়াট বেইলি (Sir Stuart Bayley) ইংরেজ সরকারের সহিত মহারাজা চন্দ্রকীর্তির বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া পদক দেওয়ার জন্য মণিপুরে আসেন। নাগা পাহাড়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্কট জনক মুহূর্তে মণিপুরের মহারাজের

সাহায্যের কথা প্রত্যক্ষদর্শী জনষ্টন সাহেব কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন *। চীফ কমিশনারের সম্মানার্থ যথাবিধি দেখা সাক্ষাৎ ও নানা অনুষ্ঠানের পর নির্দিষ্ট দিনে রাজ দরবারে বেইলি সাহেব মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তিকে তারকা এবং কে, সি, এস, আই উপাধি (Star and badge of a K. C. S I.) প্রদান করেন। পলো খেলা নৃত্য গীত ইত্যাদি দেখিয়া ও নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া ৫ দিন পর সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি আসামে ফিরিয়া যান। মণিপুরের জনসাধারণ যে ইহাতে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিল সমসাময়িক মণিপুরী গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

---

*"........it is difficult to over-estimate our obligation to the Maharajah, for his loyal conduct during the insurrection and subsequent troubles. According to his own belief, we had deprived him of territory belonging to him, and which he had been allowed to claim as his own. The Nagas asked him to help them, and promised to become his feudatories, if only he would not act against them. The temptation must have been strong, to at least serve us as we deserved, by leaving us in the lurch to get out of the mess, as best as we could. Instead of this, Chandra Kirtee Singh loyally and cheerfully placed his resources at our disposal, and certainly by enabling me to march to its relief, prevented the fall of Kohima, and the disastrous results which would have inevitably followed." James Johnstone.

দৈব দুর্বিপাক

১৮৮০ সনের জুন মাস হইতে পর পর দৈব-দুর্বিপাকে মণিপুর রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। ৩০শে জুন প্রবল ভূমিকম্পের দ্বারা ইহার প্রথম পর্ব আরম্ভ হয়। মণিপুরের অধিকাংশ বাড়ীঘর তখন বাঁশ এবং খড়ের তৈরী হইলেও ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম হয় নাই। লাংথাবালে গম্ভীর সিংহের রাজ প্রাসাদ এবং পলিটিক্যাল এজেণ্টদের পুরাতন রেসিডেন্সী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ভূমিকম্পের পর দেখা দেয় ব্যাপক কলেরা। ইহাতে রাজ্যের বহু লোক এমনকি রাজপরিবারেরও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সদস্যদের অনুপস্থিতিতে রাজ-দরবারের অধিবেশন অনেকদিন বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার পর আর বাজার বসিত না। নদীর ধারে সারি সারি চিতা—দিবারাত্র জ্বলাই থাকিত। সমস্ত উপত্যকাভূমি মহামারীর কবলে পতিত হইল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মণিপুরীগণ এই ঘোর দুঃসময়ে ধৈর্য সহকারে যে কর্তব্যবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহা সচরাচর অনুরূপ অবস্থায় অন্যান্য সমাজে দেখা যায় না। মহামারীর সময় স্বভাবতই লোকে রুগ্ন দিগকে ফেলিয়া পলাইয়া যায়; মৃতের সৎকার দূরে থাক বুকফাটা আর্তনাদ করিলেও শয্যাগত রোগীর মুখে একবিন্দু জল দেওয়ার জন্য কেহ আগাইয়া আসে না। কিন্তু এই দুরারোগ্য সংক্রামক রোগের স্পর্শে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও প্রতিবেশীরা কেহ ভয়ে পলাইয়া গেল না। সেবা এবং সৎকারের জন্য কোন সমস্যা দেখা দিল না।

মহামারীর প্রকোপ কমিতে না কমিতেই মহারাজা স্বয়ং

কর্ণমূলে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া দাঁড়াইল। মণিপুরে মহারাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হইল না। এক পক্ষে মহারাজের জ্যেষ্ঠ চার পুত্র, অপর পক্ষে নরসিংহের বংশধরগণ প্রকাশ্যেই তৈরী হইতে লাগিলেন। মহারাজের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই অস্ত্রের ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইবে। রাজ্যে পুনরায় রক্তের স্রোত বহিবে। রুগ্ন চন্দ্রকীর্তির নিকট এই আশঙ্কা রোগ যন্ত্রণার চেয়েও বেশী পীড়া দিতে লাগিল। জনষ্টন সাহেব আসন্ন রক্তপাত ঠেকাইবার জন্য থাঙ্গাল মেজরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কিছুদিনের জন্য সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র তাহার রেসিডেন্সীতে আনাইয়া রাখার সঙ্কল্প করিলেন, এবং যুবরাজ শূরচন্দ্রকে মহারাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই রেসিডেন্সীতে চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। এই সব ব্যবস্থা চলিতে থাকাকালে মহারাজের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। তিনি তখন যুবরাজকে ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সম্মত করাইতে জনষ্টন সাহেবকে অনুরোধ করেন।—*

জনষ্টন সাহেবের ইচ্ছা ছিল বরাবরের জন্য মণিপুরের সিংহাসনে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। মণিপুরের রাজশাসন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সমস্ত রাজপুত্রেরই - অর্থাৎ প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র, দ্বিতীয়ের মৃত্যুর পর তৃতীয়,

*"He begged me to write to the Govt. of India and request that the Jubraj should be acknowledged by them as his successor," James Johnstone.

এইরূপে সকলেরই সিংহাসনে বসিবার অধিকার ছিল। কিন্তু চন্দ্রকীর্তি প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে যাইতে সম্মত হইলেন না। ইংরেজ সরকারও তখন চন্দ্রকীর্তির ইচ্ছাতেই সায় দেয়।

১৮৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মহারাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পুনরায় রাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। মণিপুরের আকাশ হইতে কালবৈশাখীর ঘন কাল মেঘ কাটিয়া গেল। মণিপুরীদের শান্তির নীড় হইতে দুশ্চিন্তা দূর হইল। এই সময় জনষ্টন সাহেব একদিন সম্রাজ্ঞী মহারাণীর সইকরা মহারাজা চন্দ্রকীর্তিসিংকে নাইট-কমাণ্ডার- অব-দি ষ্টার-অব-ইণ্ডিয়া, (Knight Commander of the Star of India) পদে নিয়োগপত্র হাতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। মহারাজ সানন্দে এবং সসম্ভ্রমে উহা গ্রহণ করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহার অকৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। *

ইম্ফাল-মাও পথ

মণিপুর উপত্যকা হইতে রাজ্যের উত্তর সীমান্তবর্তী শাসনকেন্দ্র মাও পর্য্যন্ত তখন কোন ভাল রাস্তা ছিল না। জনষ্টন সাহেব যখন

*"......I visited him, that I might congratulate him on his recovery, and present him with Her Majesty's warrant, appointing him a Knight Commander of the Star of India. The paper bearing the Queen's signature were received with a salute of thirty one guns, and the Maharajah rose to take it from my hand, and at once placed it on his forehead, making an obeisance." James Johnstone

কোহিমা উদ্ধারে যান তখন তাহাকে পায়ে হাঁটা দুর্গম পথে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি ইম্ফাল হইতে মাও পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী চলাচল করিতে পারে এমন একটি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মহারাজকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী করিয়া তুলেন। প্রথমে ইহার উপযোগিতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছিল; অবশেষে জনষ্টন সাহেবের দৃঢ় সঙ্কল্পই জয়ী হইল। লেফ্টেনেণ্ট রবান সাহেবের (Lt. Raban R. E.) তত্ত্বাবধানে এবং মণিপুরীদের সাহচর্যে ১৮৮১ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ এবং ১৮৯১ সনে মণিপুরে রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। আগে মণিপুরের ব্যবসা বাণিজ্য, সামরিক এবং রাজনৈতিক কাজ কর্ম, তীর্থ পর্যটন সমস্তই চলিত কাছাড়ের পথে। কিন্তু নূতন রাস্তাটি অধিকতর সুগম হওয়ায় লোকে ক্রমশ ঐ পথ ধরিল। বর্তমান সময়ে কাছাড়ের পথ একেবারে পরিত্যক্ত; ইম্ফাল-মাও পথ ক্রমশ উন্নত এবং প্রসারিত হইয়া ভারতের অন্যতম প্রধান ইম্ফাল-ডিমাপুর রাজপথে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত আদান-প্রদান চলা-ফেরা, ভাব ও সংস্কৃতির বিনিময় বহুদিন যাবৎ একমাত্র এই পথেই চলিয়া আসিতেছে। কোন গৃহের উত্তর দরজা খুলার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আলো হাওয়া একমাত্র উত্তরের খোলা দরজা দিয়াই প্রবেশ করে। সুতরাং নূতন দিকে নূতন পথ খুলায় অলক্ষিতে মণিপুরীদের চিন্তা এবং কর্মেও

যে তাহার কিছুটা প্রভাব দেখা দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

থাঙ্গাল মেজরের প্রাধান্য

১৮৮১ সনে জনষ্টন সাহেবের অবর্তমানে এরিংঘা (Erengha) নামক জনৈক অখ্যাত রাজকুমার সিংহাসন দখলের এক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া মহারাজের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মেলাইরংবার পর রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বহুদিন পর পুনরায় মণিপুরে এই চরম দণ্ডের প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৮৮২ সনের জানুয়ারী মাসে জনষ্টন সাহেব দীর্ঘ দিনের ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। তাহার অবর্তমানে এবং মহারাজের অসুস্থতার সুযোগে রাজসরকারে থাঙ্গাল মেজরের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি হইলেন রাজ্যে সর্বেসর্বা। জনষ্টন সাহেব ব্যতীত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। ১৮৮৪ সনের অক্টোবর মাসে তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া থাঙ্গাল মেজরের বিরুদ্ধে বহুলোকের বহু অভিযোক শুনিতে পাইলেন। নিজেও তাহার ঔদ্ধত্যের নানা পরিচয় পাইলেন। মন্ত্রী বলরামসিং এবং যুবরাজ শূরচন্দ্র থাঙ্গাল মেজরের প্রতিপক্ষ ছিলেন।

ইহাতে জনষ্টন সাহেবের অনেক সুবিধা হইল। সুমজোক রাজা কর্তৃক কোঙ্গল থানা আক্রমণের কোন সুবিচার না হওয়ায় থাঙ্গাল মেজর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল মণিপুরের কিছু লোক ব্রহ্মের এলাকায় হানা দিয়াছে। থাঙ্গাল

ইহা যে থাঙ্গাল মেজরের কীর্তি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। জনষ্টন সাহেব মন্ত্রী বলরাম সিংকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং ঘটনার তদন্ত করিয়া মহারাজের নিকট তাহার বিরুদ্ধে থাঙ্গাল মেজরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে 'আয়া-পুরেলে'র পদ হইতে অপসারিত করিতে অনুরোধ করেন। গোড়ার দিকে নানা হুমকি দেখাইলেও অবশেষে বেগতিক দেখিয়া থাঙ্গাল মেজর মহারাজের নির্দেশ মত পদত্যাগ করিয়া জনষ্টোন সাহেবের নিকট নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন। তাঁহার এইরূপ পতনে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হইয়াছিলেন যুবরাজ শূরচন্দ্র এবং বলরাম সিং। তাঁহারা তাঁহার প্রতাপে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিরক্তিকর ঘটনার এইখানেই শেষ হয়।

২য় ব্রহ্মযুদ্ধ

১৮৮৫ সনের ২৫শে নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য উত্তর ব্রহ্ম আক্রমণ করিলে চীন্দুইন অববাহিকার বনে বোম্বে-বার্মা কর্পোরেশনের (Bombay Burma Corporation) কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য জনষ্টন সাহেব প্রায় দুই হাজার মণিপুরী সৈন্য লইয়া কেণ্ডেট (Kendat) প্রদেশ দখল করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ২০ দিনের দিন রেঙ্গুন হইতে ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক সম্রাট থীব (Thibaw) সহ রাজধানী মান্দালয় সহর হস্তগত হয়। সুতরাং যুদ্ধ অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়।

এলাকায় অরাজকতা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—যাহা অন্য উপায়ে সম্ভব ছিল না। তদানীন্তন ভাইসরয় (Viceroy) লর্ড ডাফরিণ (Lord Dufferin) তাহাদের এই সহযোগিতা এবং বীরত্বের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

জনষ্টন সাহেবের শেষ বিদায়

১৮৮৬ সনের মার্চ মাসে জনষ্টন সাহেব মণিপুর হইতে শেষ বিদায় লইয়া যান। তাহার পরও একবার তাঁহাকে মণিপুরে পাঠানর কথা হইয়াছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁহার আসা সম্ভব হয় নাই। জনষ্টন সাহেব তাঁহার কার্যতৎপরতায় এবং ব্যবহারে মণিপুরের সকল শ্রেণীরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ছুটির পর পুনরাগমনের সময় প্রত্যেক বারই তিনি বহু লোকের দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেন। রাজ্যের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ এবং সাহচর্য ছিল অপরিহার্য। সমস্ত বাধা বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মণিপুরের সেবা ও উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজের সঙ্গে মণিপুরের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার সময়ও তিনি মণিপুরের স্বার্থ সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ ছিলেন, এমনকি তাহার জন্য ইংরেজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া হইলেও অপরাপর রাষ্ট্রের লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পর্যন্ত পশ্চাদপদ হন নাই। নাগাপাহাড়ে প্রথমবার যখন ইংরেজের সঙ্গে নাগাদের গোলমাল বাধে তখন তিনি সেখানে না যাইয়া মণিপুরের থানা আক্রমণকারী সুমজোক রাজার বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কতিপয় মণিপুরী কাণপুরে যাইয়া কার্পেট বয়ন শিখিয়া আসে। তিনি স্বয়ং ইম্ফালে

একটি উন্নত ধরণের মৃৎশিল্প স্থাপন করেন এবং মণিপুরী রৌপ্যকারদিগকেও উন্নত ধরণের জিনিষ তৈরী করিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। নানা প্রকার লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দানের প্রথা তিনি রহিত করেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা তখন সফল হয় নাই। তাহার গ্রন্থে অনমুকরণীয় সহজ সুন্দর ভাষায় মণিপুর সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম মূল্যবান দলিল হিসাবে সর্বকালে গ্রাহ্য হইবে। বস্তুত সমসাময়িক মণিপুরকে জনষ্টন সাহেব হইতে পৃথক ভাবে ভাবা যায়না। মণিপুরে তখন এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই যাহার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন না। ভারতের অপরাপর ইংরেজ শাসকদের চেয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি লোকের যেটুকু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে এই জনষ্টন সাহেবের মত কতিপয় মহানুভব কর্মচারীর দান। তিনি উপস্থিত থাকিলে মণিপুরে ১৮৯১ সনের শোচনীয় দুর্ঘটনা, হয়ত ঘটিবার সুযোগই পাইত না *

মহারাজা চন্দ্রকীর্তির মত সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান রাজা মণিপুরে

*"Oh! for a moment of colonel Johnstone's presence at such a crisis" wrote a British official from Manipur, to the Pioneer, in 1891. "One strong word with the ominous raising of the forefinger would have paralyzed the treacherous rebel koireng (Senaputtee) from perpetrating this outrage."

E. D.

খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন উচ্চতায় পাঁচ ফুট ৬ ইঞ্চি, দীর্ঘ বাহু, শক্ত গড়ন, অংগয়াবব ইন্দোচৈনিক ধাজ, শান্ত মুখমণ্ডল সব কিছু মিল ইয়া তাহার ব্যক্তিত্বে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত। স্কুল কলেজের সাধাবণ শিক্ষা না পাইলেও তাঁহাব রুচি অতিশয় মার্জিত ছিল এবং নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তিনি সর্বদাই নিজ জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ কবিতে চেষ্টা কবিতেন। যন্ত্র বিজ্ঞানে তাঁহাব একটা সাধারণ ঝোঁক ছিল। একটি গবেষণাগার নির্মাণ কবিয়া তিনি তাহাতে নানা বিষয়েব পরীক্ষা করিতেন, এমনকি শারীবস্থান (anatomy)-ও বাদ যাইত না। তিনি তাঁহার নিজস্ব কারখানায় কাঁচ তৈরী করিতেন ; এবং একবাব তাহাব নির্দেশমত একটি নিখুঁত পেট্রল-ল্যাম্প তৈরী করাইয়া জনষ্টন সাহেবকে দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকিলেও রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। জনষ্টন সাহেব একবার মহারাজের নিকট নিজের ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু চা গাছ রোপণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাজের মনে দুশ্চিন্তা ঢুকিয়া গেল। ইংরেজগণ যে চা-চাষের জন্য ১৮৪০ সনে মুত্তুক (Muttuk Country) দখল করিয়াছিল একথা তিনি জানিতেন। ভাল চা উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া ভবিষ্যতে তাহারা মণিপুর রাজ্যও যে খাসে আনিতে চাহিবেনা একথা কে বলিতে পারে। মহারাজ জনষ্টন সাহেবকে তাহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে বিনামূল্যে ভাল চা পাঠানর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাজ্যে বিদ্রোহ এবং অশান্তি দমনে তিনি যেমন দৃঢ় ছিলেন তেমনি প্রজাদের অসুবিধা দূর করিতেও সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান প্রজাদিগকেও পূর্বে হিন্দুদের মত মহারাজার সম্মুখে আভূমিপ্রণত হইয়া সম্মান দেখাইতে হইত, কিন্তু ইহা তাহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে এই প্রথা হইতে মুক্তি দিয়া শুধু 'সেলাম' করিতে বলিলেন। মুসলমান সমাজের নেতাকে রাজ-সরকার হইতে 'নবাব' উপাধি দেওয়া হইল। অথচ তাহাদের সংখ্যা তখন ৫ হাজারের বেশী ছিলনা। মহারাজা জনষ্টন সাহেবের অনুরোধে গো-হত্যা, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের নিয়ম তুলিয়া দেন এবং চক্ষু উৎপাটন, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা (Principle of retaliation) ইত্যাদি নৃশংস উপায়ে শাস্তি দেওয়ার প্রথাও রহিত করেন। পূর্বে কাছাড় হইতে ৮ দিন অন্তর মণিপুরে ডাক আসিত, ক্রমশ এই ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া ২ দিন অন্তর চিঠি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মহারাজা শ্রীহট্টে এবং শিলচরে রাজভবন তৈরী করাইয়াছিলেন। মহারাজ জননী কুমুদিনী দেবী চন্দ্রকীর্তির সঙ্গেই মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেবের (R. Brown) বিবরণে দেখা যায় তিনি ১৮৭৩ সন পর্যন্তও জীবিত ছিলেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি ১৮৮৬ সনের গ্রীষ্মকালে ৩৫ বৎসর রাজত্ব ভোগের পর প্রায় ৫৪ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

চন্দ্রকীর্ত্তির মত সর্বগুণসম্পন্ন শাসক এ অঞ্চলের ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। কিন্তু তথাপি ইংরেজের সঙ্গে তাঁহার যে সমস্ত চুক্তি হয়াছিল এবং তিনি তাহাদের উপর যতটা নির্ভরশীল হইয়া

পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোন স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা বজায় থাকে না। ইংরেজের নিকট হইতে পদবী গ্রহণ, পররাষ্ট্রীয় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলা, প্রতি ব্যাপারে পলিটিক্যাল এজেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা, এমনকি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট পূর্বাহ্ণেই অনুমোদন লাভের প্রার্থনা করা ইত্যাদি কোন স্বাধীন রাজার পক্ষেই মর্যাদা দূরস্থান স্বাধীনতার-ও পরিচায়ক নহে।

তৎকালীন মণিপুর রাষ্ট্রে নিযুক্ত ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টদের অভ্যর্থনার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইত এবং রাজদরবারে তাহাদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাহাদিগকে মণিপুর সরকারের ইংরেজ উপদেষ্টা (Advisor) এবং পরিচালক মনে করিলে কোন ভুল হইবে না। পলিটিক্যাল এজেন্টগণ যখন মণিপুরে অসিতেন তখন রাজ্যের একজন মন্ত্রী জিরিঘাট হইতে তাহাকে পথ প্রদর্শনের জন্য সঙ্গে থাকিতেন। রাজধানীর প্রবেশ মুখে মহারাজা তাঁহার পুত্রগণসহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন। আনুসঙ্গিক আরও অনেক অনুষ্ঠানও সেই সঙ্গে পালিত হইত। *

পাশাপাশি ব্রহ্মরাষ্ট্র তখন ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে নগ্ন পদে রাজ

* "………at the entrance of the capital, I was met by the Maharajah himself, surrounded by all his sons. A carpet was spread with chairs for him and myself, we both of us having descended from our elephants, advanced and met in the centre of the carpet, and having made our salutations (a salute of eleve n guns was fired in my honour), we sat and

দরবারে প্রবেশ করিয়া নতজানু হইয়া রাজাকে সম্মান দেখাইতে হইত।*

এককালে প্রাচ্যদেশে সর্বত্রই এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত নানাদিক হইতে বিচার করিয়া মাহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির আমলের মণিপুরকে স্বাধীন রাজ্যের পর্যায় ভুক্ত করা চলে না। ব্রিটিশ ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দেশীয় রাজ্যের সঙ্গেই ইহার একমাত্র তুলনা চলে।

talked for two minutes. We then mounted the Maharajah's elephant being driven by his 3rd son ; and we rode together through the great bazar, till our roads diverged at the entrance to the fortified enclosure to the place, when we took leave of each other······

After a day's rest I paid a visit to the Maharajah, having first stipulated as to my proper reception. I was received by the Jubraj (heir apparent) at the entrance to the private part of the palace, and by the Maharajah a few paces from the entrance to the Durbar room (hall of reception), and conducted by him to a sit opposite to his own, with a table between us, his sons and officials being seated on either side. I read the Viceroy's letter, informing the Maharajah of my appointment ········I took my leave and was escorted back to the place where I was met on my arrival." Johnstone.

* "According to the Burmese custom the British Resident, when attending court had to remove his shoes and kneel before the King"... Page 838. Advanced History of India.

(এগার)

পলিটিক্যাল এজেন্সী

১৮৩৫ সনে মণিপুরে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্সী স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ও কর্তব্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৫১ এবং ১৮৫২ সনে ভারত সরকারের ঘোষণা দ্বারা এবং গর্ডন, কুলক ও জনষ্টন প্রমুখ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মচারীদের কাযের ফলে পলিটিক্যাল এজেন্টের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহাদের আমলে মণিপুরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই যাহার সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন যোগাযোগ ছিলনা। ১৮৪৪ সনে গর্ডন সাহেবের মৃত্যুর পর সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব (Mr. Culloch) সেই পদে উন্নীত হন। পূর্ব অধ্যায়ে গর্ডন সাহেব এবং কুলক সাহেবের প্রথমবার কার্য সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে। কুলক সাহেব ১৮৬১ সন পর্যন্ত কৃতিত্বের সহিত কর্তব্য পালন করিয়া প্রথমবারের মত অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ভারত সরকারের সিভিল ফাইনান্স কমিশনের (Civil Finance Commission) সভাপতি স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্সী লোপ করার উপদেশ দেন। এই কথা চাপা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রজাগণ তল্পিতল্পা গুটাইতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্ম-দেশের সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যে সমস্ত নাগা এবং কুকি পলিটিক্যাল এজেন্টদের আশ্বাসে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া উপত্যকাতে বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়াছিল তাহাদিগকে

ধরিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হইল। ফলে ভারত সরকার টেম্পল সাহেবের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া ডাক্তার ডীলনকে (Dr. Dillon) ১৮৬২ সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠায়। কিন্তু এই পদে ডীলন সাহেব সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মণিপুর সরকারের সঙ্গে তাহার খিটিমিটি লাগিয়া গেল। পর বৎসর মহারাজা তাহার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নিকট কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। তদানীন্তন সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল ডীলন সাহেবের অযোগ্যতার খবর রাখিতেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন তদন্ত না করিয়াই ১৮৬৩ সনে তিন দিনের নোটিশে তাঁহাকে বদলি করা হয়। অতঃপর কিছুদিনের জন্য উক্ত পদ খালি থাকা অবস্থায় ১৮৬৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মণিপুরের মহারাজা ভারত সরকারের নিকট মণিপুরে পুনরায় একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করেন। মণিপুর রাজ্যে প্রজাদের শান্তি এবং রাজার সিংহাসন নিরাপদ রাখার জন্য পলিটিক্যাল এজেন্টের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। *

* "The past history of the country shows that……… peace, order and comparative prosperity reigned while the British Agent was present Lastly but not least both the chief himself and his people desire to have a British Agent amongst them, they have told Capt. Stewart that the presence of one is equal to a brigade as regards the security of the country.

Political Agent, April 1864 letter No. 108

এবং যে কেহ দ্বারা সেই কাজ চলিবে না ;—ইত্যাদি নানা দিক ভাবিয়া ভারত সরকার অবশেষে কুলক সাহেবকে পুনরায় উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। কূলক সাহেবের পুনরাগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তিনি শীঘ্রই পলিটিক্যাল এজেন্সীর মর্যাদা ফিরাইয়া আনেন। ১৮৬৭ সনে মণিপুর হইতে তাহার শেষ বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত এজেন্সীর কাজকর্ম নির্বিবাদেই চলে। কুলক সাহেবের অবসর গ্রহণের পর হইতে ১৮৭৬ সনে জনষ্টন সাহেবের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই ৯ বৎসরের মধ্যে মণিপুরে যে সমস্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত যোগ্যতার অভাবে মণিপুর সরকারের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৭২ সনে মণিপুর সরকার পলিটি-ক্যাল এজেন্ট কর্ণেল টমসনের (Col. Thomson) বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ আনেন। কিন্তু তদন্তকারীদের নিকট উহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। পুনরায় ১৮৭৬ সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট ডাঃ ব্রাউনের বিরুদ্ধে আসামের চীফ কমিশনার কর্ণেল কীটিংসের নিকট নানা অভিযোগ করা হয়। অনেক চিঠি লেখা-লেখির পর দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল শীয়ারকে (Col. Shere) তদন্তের জন্য পাঠান হয়। তদন্ত চলিতে থাকা কালেই ডাঃ ব্রাউনের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতে তদন্তের পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নাই। কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবারেও মণিপুর সরকার তাহাদের অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারায় ভারত সরকার পলিটিক্যাল এজেন্টদের প্রতি এইরূপ প্রতিকূল

আচরণের যথেষ্ট নিন্দা করে। (*) পরবর্ত্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন ডুরাণ্ডের (Capt. Durand) বিবরণে দেখা যায় মণিপুর সরকার ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করে নাই। মণিপুরের মত জায়গায় মহারাজার সঙ্গে মতদ্বৈধ হইলে পলিটিক্যাল এজেন্টের জীবন দুর্বিষহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মহারাজের এক ইঙ্গিতে তাহার রসদ এমনকি ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যেমন পলিটিক্যাল এজেন্টের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল তেমনি মহারাজার স্বার্থের জন্য তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন ছিল। মহারাজা চেষ্টা করিতেন পলিটিক্যাল এজেন্টের সাহায্যে ভারত সরকারের নিকট হইতে নানা স্বার্থ আদায় করিতে। পলিটিক্যাল এজেন্ট তাহাতে সম্মত না হইলে তাহার উপর নানা ভাবে চাপ দিতে চেষ্টা করিতেন। †

(*) "A severe reproof was in consequence transmitted from the Govt of India to the Raja"

History of Political Agency—C. B. Allen C. S.

† "The Political Agent is dependent on the will and pleasure of the Maharaja for everything. His very word and movement are known to the Maharaja. He is in fact a British Officer under Manipur surveillance. If the Maharaja is not pleased with the political Agent he cannot get anything, he is ostracised, from bad coarse black atta which the Maharaja sells him as a favour, the dhobi who washes

১৮৭২।৭৩ সনে মণিপুর রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত নির্ধারনের সময় মহারাজের এই মনোভাব অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করে। কিন্তু অবশেষে ইংরেজ সরকারের দৃঢ়তায় মহারাজকে সংযত হইতে হয়। (*)

কুলক সাহেবের অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকারের নিকট মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্সী একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই আদিম জাতি পরিবেষ্টিত দুর্গম রাজ্যে কোন উপযুক্ত লোক এই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেখানে যাইতে সম্মত হন না। ইহাতে ৯ বৎসর পর্যন্ত ভারত সরকারকে নানা ঝামেলা পোহাইতে হয়। অবশেষে ১৮৭৬ সনের শেষভাগে জনষ্টন সাহেব এই পদ গ্রহণ

---

his clothes, and the Nagas who work in his garden; he cannot purchase anything at any price. The court is almost openly hostile, though they have pliancy enough to pretend to a great regard for the Political Agent and the Sirkar" (Precis of correspondence regarding Manipur affairs, by J. Clark, P. 23)

*"In 1872-73, the Raja again adopted a most unseemley attitude, when steps were being taken for the demarcation of the boundary between Manipur and the Naga Hills. Every obstruction possible was offered, and the Raja even had the effrontery of expressly 'forbid' the Political Agent to enter the eastern portion of his territories. The Maharaja was sternly called to account by the Supreme Govt. and was required to submit an ample apology for his improper conduct."

History of Political Agency—B. C. Allen C. S.

করিতে রাজী হওয়ায় ভারত সরকারের দুশ্চিন্তা দূর হয়।* শাসন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও আদিম এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা দ্বারাই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কেওঞ্ঝরে (Keonjhur) থাকাকালে তিনি প্রায় দুই হাজার আদিম জাতীয় নগ্ন লোককে কাপড় পরার অভ্যাস করাইয়াছিলেন। সেখানে তাহারই স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা নয় শতের কোঠায় আসিয়া দাঁড়ায়। সেখানকার রাজার সঙ্গে প্রজাদের যে বিরোধ চলিতেছিল—তাহার চেষ্টায় অচিরেই তাহা নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি ফিরিয়া আসে। বস্তুতঃ ভারতের আদিম জাতি-সমূহের ইতিহাস কোন কালে লেখা হইলে জনষ্টন সাহবের নামও তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। ভারতে দেশীয়রাজ্য ইংরেজ প্রতিনিধির পদেই তিনি বেশী সময় নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালীন অমলাতন্ত্রের নানা দোষক্রটী তাহার চোখে পড়ে। প্রাচ্য দেশের শাসন ব্যবস্থা কোনকালেই ইউরোপীয় আমলাতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইত না। এখানে ব্যক্তির সৎ অথবা অসৎ ইচ্ছার উপর প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিত।

* "Manipur, to which Colonel Johnstone was appointed in 1877, was called by one of the Indian Secretaries the Cinderella among political agencies. 'They'll never" he said, 'get a good man to take it', 'well' was the reply, 'a good man has taken it now'.

Introduction by the Editor of Johnstone's My experiences in Manipur and the Naga Hills.

ইহাতে সদিচ্ছাপ্রণোদিত শাসকের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু আমলাতন্ত্রের নিয়মানুসারে স্থানীয় কর্মচারীর কোন স্বাধীনতা থাকে না। তাহাকে কেন্দ্রে অবস্থিত উপরওয়ালার হুকুম তামিল করিতে হয়। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না থাকায় তাহাদের নির্দেশ সবসময় জনস্বার্থের উপযোগী নাও হইতে পারে। অপরপক্ষে ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে আমলাতন্ত্র বিশেষ উপযোগী হইলেও তাহাদের বিজীত সাম্রাজ্যের প্রজাগণ ইহার সুফলের চেয়ে কুফলের ভাগী হয় বেশী। বিদেশী শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় শান্তিতে সাম্রাজ্য ভোগ করা। সেইজন্য তাহারা জনমতের ভয়ে কোন প্রকার কুপ্রথা লোপের চেষ্টা অথবা সমাজসংস্কার হইতে বিরত থাকে। সতীদাহের মত নৃশংস কুপ্রথা নিবারণ করিতেও আমলাতান্ত্রিক সরকারের অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। অথচ গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে রাতারাতি হুকুম জারি করিয়া একদিনে এই সমস্ত কুপ্রথা বন্ধ করিতে পারিতেন; তখনকার দিনে তাহার আদেশ অমান্য করিতে কেহ সাহসী হইত না।*

জনষ্টন সাহেবের নিয়োগের পূর্বে দীর্ঘ ৯ বৎসর পলিটিক্যাল এজেন্টদের সঙ্গে মহারাজের কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা পূর্বেই বলা

* "Take, for instance the case of Sattee, or widow-burning. It was argued for years that we could not put it down without causing a rebellion. What are the facts? A Governor-General, blessed with moral courage in a great degree, determined to abolish the barbarous custom, and his edict was obeyed without a murmur." Johnstone

হইয়াছে। তিনি আসিয়া দেখেন পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য মণিপুর সরকারের গুপ্তচর রহিয়াছে। সব সময় এইরূপ সন্দেহভাজন হইয়া থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকর হইলেও তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। নিজের পদমর্যাদা পুরাপুরি বজায় রাখিয়া তিনি কাজকর্ম চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সরকারী বে-সরকারী যে কোন লোক তাহার সঙ্গে অবাধে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পাইত। কোন কাজ করার পূর্বেই সর্বদা তিনি যুক্তিতর্কের দ্বারা মহারাজকে বুঝাইয়া স্বমতে আনয়ন করার চেষ্টা করিতেন কখনও নিজের ইচ্ছাকে গায়ের জোরে চাপাইতে যান নাই। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার সহৃদয়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া পলিটিক্যাল এজেন্ট সম্বন্ধে মণিপুর সরকারের সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়া যায়।

জনষ্টন সাহেব অত্যন্ত সহৃদয় এবং অমায়িক হইলেও নিজের পদমর্যাদা অথবা কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তৎকালীন ভারতীয় চরিত্রের দোষক্রুটী তাহার অগোচর ছিল না। তিনি ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন যে পদস্থ লোক যদি আচারে ব্যবহারে অপর সকল হইতে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে না পারেন তবে দেশী-লোক ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করে না। এই অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিতেও নানা অসুবিধা হয়। সেইজন্য তিনি নিজে কোন খেলায় যোগ দিতেন না। মহারাজা একসময় থাঙ্গাল মেজর, বলরাম সিং এবং রমা সিং মেজরকে জেনারেলের পদে উন্নীত করেন। কিন্তু জনষ্টন সাহেবের

পদমর্যাদা তখন লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেলের (Lieutenant Colonel) উপর ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত মণিপুরী কর্মচারীদের উদ্দেশ্য যে তাঁহাকে তাহাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা ইহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্য দৃঢ়তার সহিত নিজের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য তাহাদের এই পদোন্নয়ন উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গে আগের মতই ব্যবহার চালাইয়া গেলেন। অপর পক্ষে জনষ্টন সাহেবের স্বীকৃতি লাভ না করায় তাহাদের এই নূতন পদবী বিশেষ জনপ্রিয় হইল না। গাঁয়ে না মানিলে যেমন আপনি মোড়ল সাজিয়া বেশীদিন থাকা চলে না, তেমনি একবার মোড়ল সাজিলে মোড়লি ছাড়িতেও আত্মসম্মানে বাধে, জেনারেলগণ তখন অগত্যা সুর নরম করিয়া জনষ্টন সাহেবকেই ধরিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামের চীফ কমিশনারের নিকটও লেখালেখি আরম্ভ করিলেন। মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে আসামের চীফ কমিশনারের অধীনে না হইলেও এতদঞ্চলে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সমস্ত নির্দেশ চীফ কমিশনারের মারফতই যাইত। সেইজন্য মণিপুরের ব্যাপারে তাহার অনেক হাত ছিল। পলিটিক্যাল এজেণ্টগণও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতেন। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে জনষ্টন সাহেব চীফ কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলিকে (Sir Steuart Bayley) নিজের অভিমত জানানোর ফলে তিনি এ সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। জনষ্টন সাহেব অবশ্য একটি সর্তে তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে যদি তাহারা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া দেখাইতে

পারেন তখন তিনিই অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে জেনারেল হিসাবে সম্বোধন করিয়া সম্মানিত করিবেন। এদিকে জনষ্টন সাহেব মণিপুরে আসিয়াও ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এদেশের লোকের মনোভাব সর্বজনবিদিত। নানারকম প্রতিবন্ধকতায় গোড়ার দিকে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তবু তিনি হাল ছাড়িলেন না। অবশেষে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে থাঙ্গাল, বলরাম সিং এবং রমা সিং যখন তাহার নিকট হাঁটাহাটি করিতেছিলেন তখন তিনি পুনরায় রাজ দরবারে ইংরাজী বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। বলাবাহুল্য অন্যান্য বারের মত এবারেও ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উঠিল। তিনিও ছাড়িবার পাত্র নন ! থাঙ্গাল, বলরাম সিং, রমা সিং সকলেই তখন মন্ত্রী ছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, যদি তাঁহারা ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে মহারাজের সম্মতি আদায় করিতে পারেন তবে তিনি তাঁহার পুর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহাদিগকে জেনারেল বলিয়া সম্বোধন করিবেন। দুই এক দিনের মধ্যেই মহারাজের সম্মতি পাওয়া গেল। এইরূপে জনষ্টন সাহেবের চেষ্টায় ১৮৮৫ সনে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় (Middle English School) স্থাপনের ফলে মণিপুরে আধুনিক শিক্ষার বীজ রোপিত হইল।

মানব সমাজে যে সমস্ত পরিবর্তন আগে হইতে ভাবা যায় না, কেবলমাত্র রাজশাসনের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না, অথবা শাসনযন্ত্র যাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না—সেই অসম্ভব যুগান্তকারী

শক্তি নিহিত থাকে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটী সত্ত্বেও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি রাজনৈতিক জীবনে আমাদিগকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিকতার পথে পরিচালিত করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্বন্ধেও সচেতন হইতেছি। ইউরোপীয় সমাজচেতনা আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনকেও প্রভাবিত করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের অন্তরের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির গোড়ায় আঘাত করিয়া আমাদিগকে যুক্তিবাদী করিয়া তুলিতেছে। কূপমণ্ডুকতা দূর হইয়া মনের মধ্যে মুক্তির দরজা খুলিয়া যাইতেছে। পুরুষকারের আঘাতে অদৃষ্টবাদের কারাপ্রাচীরে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরায় আমাদের সুপ্ত কর্মশক্তি জাগ্রত হইয়া পুনরায় নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর রাষ্ট্র, সমাজ ধর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত আন্দোলন ও পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কোনটাই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবমুক্ত নয়।

গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর মণিপুর বাংলা ভাষার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালীমনীষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা স্থাপনের পর স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। অবশ্য তখন এ সমস্ত পরিবর্তনের কথা কেহ ভাবে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মণিপুরের রাজতন্ত্র আজ অচল। স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবী ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। গোঁড়া বৈষ্ণবের ছেলে পরম উৎসাহে জীবদেহে অস্ত্র সঞ্চার করিয়া প্রাণিবিদ্যার চর্চা করিতেছে।

জনষ্টন সাহেবের আমলে মণিপুরে বিটিশ-প্রজাদের বিচারের অধিকার সম্পর্কে একটি মূলনীতিগত প্রশ্ন ওঠে। মহারাজা স্বয়ং সেই অধিকার দাবী করেন। জনষ্টন সাহেবের ইহাতে আপত্তি ছিল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের নজির * দেখাইয়া ব্রিটিশ প্রজাদের বিচারের অধিকার নিজেই গ্রহণ করেন। জনষ্টন সাহেবের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অপরিহার্য হইলেও মণিপুরের মন্ত্রী এবং উচ্চতম রাজপুরুষগণ ইহাতে স্বস্তি বোধ করিতেন না। প্রায় সময়ই তাঁহারা পরোক্ষে পলিটিক্যাল এজেন্টের সম্বন্ধে নানা অবজ্ঞাসূচক উক্তির সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করিতেন। জনষ্টন সাহেব ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া চলিতেন।

জনষ্টন সাহেবের বিদায়ের পর পলিটিক্যাল এজেন্ট পদের জন্য পুনরায় সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগ মণিপুর সরকারের প্রকৃতি এবং মণিপুরের সমস্যা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত থাকিলেও পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উক্ত পদে নিয়োগের জন্য কর্মচারীদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুযোগ্য কর্মচারীগণও মণিপুরে আসিতে নারাজ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কখনও

* "Judging by the decision of the High Court of Calcutta that all the descendants of European British subjects were European British subject. I insisted on all descendants of British subjects being considered as such, and subject to my jurisdiction". —Johnstone.

আসিতে সম্মত হইলেও তাহাদিগকে বেশী দিন সেখানে রাখা হইত না। জনষ্টন সাহেবের পরবর্ত্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর ট্রটার (Major Trotter) সুযোগ্য ব্যক্তি হইলেও ৬ সপ্তাহের মধ্যেই এক দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৮ সনে শ্রীহট্টের একজন অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ নূতন কর্মচারী (Junior Officer) মিষ্টার গ্রীমউডকে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত করিয়া মণিপুরে পাঠান হয়। অল্পদিন হয় তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন; সুতরাং মণিপুরের অবস্থা সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকার কথা নয়। কিন্তু এইরূপ আশাতিরিক্ত পদোন্নতির লোভে তিনি সানন্দে এই পদ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মণিপুরে আসিয়া ১০। ১১ মাস থাকার পর যখন মণিপুরী সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার মোটামুটি ধারণা হইল তখনই তাঁহাকে শিলংএ বদলি করা হয়। তখন অনেক প্রবীণ (Senior) কর্মচারী ছুটির শেষে ফিরিয়া আসিয়া নিয়োগের অপেক্ষায় ছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত স্থলাভাবে তাহাদিগকে কাজ দেওয়া দুষ্কর হয়। মিষ্টার হীথ (Mr. Heath), মিষ্টার গ্রীমউডের (Mr. Grimwood) চেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন —সুতরাং গ্রীমউডকে বদলি করিয়া মিষ্টার হীথকে পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ দেওয়া হয়। মিষ্টার হীথ তখন অসুস্থ ছিলেন এবং মণিপুরে আসাও তাহার মনঃপূত ছিল না;—কিন্তু অন্যত্র তাহার উপযুক্ত কোন পদ খালি না থাকায় অগত্যা তাহাকে মণিপুরেই আসিতে হইল। ভারত সরকার যে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্টের নিয়োগ এবং বদলি সম্বন্ধে মণিপুরের দিকে দৃষ্টি না দিয়া ইংরেজ

কর্মচারীদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অধিকতর সচেষ্ট ছিল তাহা উপরোক্ত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মণিপুরের রেসিডেন্সীতে (Residency) নিঃসঙ্গ অবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই মিষ্টার হীথের মৃত্যু হয়। তখন মিষ্টার গ্রীমউড ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসে পুনরায় পলিটিক্যাল এজেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়া মণিপুরে আসেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের এইরূপ অবিবেচকতার ফল ফলিতে বেশী দেরী হইল না। অনুপযুক্ত লোকের উপর দায়িত্ব অর্পণ এবং ঘন ঘন নিয়োগ বদলীর ফলে মণিপুরের রাজপরিবারে পুনরায় গৃহবিবাদ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে মুকুলিত ও পল্লবিত হওয়ার অবকাশ পায়। ১৮৯১ সনের 'মণিপুর যুদ্ধ' (Manipur War) ইহারই শোচনীয় পরিণতি। পররাষ্ট্র বিভাগ গোড়া হইতেই সাবধান হইলে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার কোন সুযোগই হইত না।

রেসিডেন্সী (Residency):—

জনষ্টন সাহেবের আগমনের সময় পর্যন্ত পলিটিক্যাল এজেণ্টগণ রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী একটি ভাড়া করা কাঁচা বাড়ীতে বাস করিতেন। বাড়ীটি নানা দিক দিয়া পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। ইহার প্রাঙ্গণে আম্রকানন এবং অন্যান্য বৃক্ষ থাকিলেও চারিদিকে ডোবা এবং নোংরা বস্তি মিলিয়া একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। জনষ্টন সাহেবের পূর্ববর্তী একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট রাজপ্রাসাদ হইতে দেড় মাইল দূর চীংমাইরংএর (Chingmai-

roong) নিকট ভারত সরকারের নিজস্ব রেসিডেন্সী নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়া সরকার হইতে এই ব্যাপারে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু মণিপুরের মহারাজা পলিটিক্যাল এজেন্টের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল থাকায় * রাজপ্রাসাদ হইতে এত দূরে 'রেসিডেন্সী' নির্মাণের প্রস্তাবে রাজদরবারে আপত্তি উঠিল। জনষ্টন সাহেব আসার পর পুনরায় তিনি উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু মহারাজা এবারেও এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন। † অবশেষে তিনি রেসিডেন্সী নির্মাণে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে এবং নিকটস্থ নোংরা বস্তীগুলি দূরে সরাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হাওয়ায় জনষ্টন সাহেব পুরাতন স্থানেই নূতন পাকা রেসিডেন্সী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। পলিটিক্যাল এজেন্সীর হেডক্লার্ক বাবু রুসনীলাল কুণ্ডুর (ওরফে রসিকলাল কুণ্ডু) তত্ত্বাবধানে আধুনিক ধরণের এক বৃহৎ রেসিডেন্সী তৈরী করা হয়। নূতন ভবনের সম্মুখস্থ পুরাতন জলাশয়টি সংস্কার করাইয়া তাহার মধ্যস্থ দ্বীপে, এবং উদ্যানে ও রাস্তার দুই পার্শ্বে ঝাউ, দেবদারু এবং অন্যান্য নানা জাতীয় বিদেশী গাছ রোপণ করা হয়। রসিকলাল কুণ্ডু

---

* "……in Manipur, the representative of the Government of India was regarded by the Maharaja as a powerful prop and support in case of his throne being attacked, as was constantly the case in former years". Johnstone

† "He said 'where you are now, I can call to you, but if you go to a distance, I shall be cut off entirely".

Johnstone.

তৎকালে পলিটিক্যাল এজেন্সীর একজন সুযোগ্য বাঙ্গালী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার মণিপুরী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বংশধরগণ বর্তমানে সমৃদ্ধিশালী মণিপুরী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য। রেসিডেন্সী গৃহ নির্মাণ একটি অতি সামান্য ঘটনা হইলেও এই উপলক্ষে মহারাজের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায়না।

বার

মহারাজ শূরচন্দ্র (১৮৮৬ ১৮৯০)

মহাবাজ চন্দ্রকীর্তি আট স্ত্রী এবং ১০ পুত্র রাখিযা ১৮৮৬ সনের গ্রীষ্মকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। যে স্ত্রীর গর্ভে যে যে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুব পূর্বেই তাঁহাদিগকে যে সমস্ত পদে নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রথমা রাণীর গর্ভে—

১। শূরচন্দ্র (মহারাজ)।

২। ভৈরবজিৎ বা পাক্কাম্বা (শগোল হঞ্জবা পদ—অশ্বাধ্যক্ষ)।

৩। কেশরজিৎ (শামু হঞ্জবা পদ—অর্থাৎ গজাধ্যক্ষ; মহারাজের সৈন্য বিভাগে তখন ৬০টি গজ ছিল)।

৪। পদ্মলোচন বা গোপালম্বা (দোলাইরোই হঞ্জবা পদ—অর্থাৎ শিবিকাধ্যক্ষ)।

দ্বিতীয়া রাণীর গর্ভে—কুলচন্দ্র (যুবরাজ পদ); গান্ধার সিং।

তৃতীয়া রাণীর গর্ভে—টিকেন্দ্রজিৎ বা কৈরেং সিং (সেনাপতি পদ)

চতুর্থী রাণীর গর্ভে- ঝালকীর্তি সিং (প্রধান সেনাপতি পদ)

পঞ্চমী রাণীর গর্ভে - অঙৌম্বা (তুমুলম্বীগী অফিসার পদ—মণিপুব-ব্রহ্ম পথের অধ্যক্ষ)

ষষ্ঠী রাণীর গর্ভে—জিল্লাঙম্বা (নাবালক থাকায়—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকেও কোন উচ্চপদ দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল)

সপ্তমী এবং অষ্টমী রাণী—নিঃসন্তান ছিলেন।

চন্দ্রকীর্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র বড়া চাওবা ও কনিষ্ঠপুত্র মেকজিন সিং সদলবলে রাজধানী আক্রমণ করেন। পিতৃশোকে কাতর টিকেন্দ্রজিৎ শামুহঙ্গবাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। নরসিংহের পুত্রদ্বয় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। শূরচন্দ্রের যথাবিধি রাজ্যাভিষেকের পর ৪ মাস শান্তিতেই কাটে। ইতিমধ্যে ঝালকীর্তির মৃত্যু হওয়ায় টিকেন্দ্রজিৎকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। নরসিংহের পুত্রদের অর্থবল, জনবল এবং প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। তাহারা দুই হাজার সৈন্য ও তদনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনরায় রাজধানীর উপর অতর্কিতভাবে হামলা করে। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হন। তুমুল সংগ্রামের ফলে সরকারী সৈন্যের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। মহারাজা পলিটিক্যাল এজেণ্ট মিষ্টার প্রিমরোজের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন করেন। অনেক বিবেচনার পর মাত্র একশত সিপাহী টিকেন্দ্রজিতের সাহায্যার্থ পাঠান হইল। আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় মহারাজের পক্ষের লোকজনদের মনে অত্যন্ত নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সৈন্যদলের মধ্যে সাহস ও উদ্যম ফিরাইয়া আনিয়া অমিতবিক্রমে বিপক্ষের উপর আক্রমণ চালান। অবশেষে বড়াচাওবা ও মেকজিন উভয়ে পরাজিত এবং বন্দী হইয়া ইংরেজের হস্তে অর্পিত হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে মাসিক ৬০৲ টাকা এবং কনিষ্ঠকে মাসিক ২০৲ টাকা হারে ভাতা দিয়া হাজারিবাগে নজর-বন্দী অবস্থায় রাখা হয়।

বড়াচাওবার আক্রমণের এক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রকীর্তির আমলের পরলোকগত মন্ত্রী ভুবন সিংহের পুত্র ওয়াংখৈরাকপা সহসা একদিন সদলবলে রাজধানী আক্রমণ করে। টিকেন্দ্রজিৎ দোলাই-রোই হজুবাকে সঙ্গে লইয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু ইংরেজের নিকট হইতে তখন কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। টিকেন্দ্রজিৎ কৌশলে বিপক্ষের বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলিয়া পরাজিত করেন। ওয়াং-খৈরাকপা পুত্রগণসহ যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপ সাফল্যের জন্য মহারাজা এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট টিকেন্দ্রজিৎকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

ইংরেজের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় মণিপুর সরকার, পলিটিক্যাল এজেন্ট ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। ছোটখাট ঘটনার মধ্যে এই বিরক্তির আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে। এক সময় পলিটিক্যাল এজেন্সীর কতিপয় প্রহরী কোন নিমন্ত্রণসভায় মণিপুরীদের দ্বারা প্রহৃত হয়, আর এক সময় কতিপয় লোক সরকারী ডাকপিয়নের নিকট হইতে ডাকের থলি ছিনাইয়া লয়। এই সব ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় পলিটি-ক্যাল এজেন্সীর প্রভাব তখন একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে যোগ্য লোক এবং তাহার সমর্থনে ছোট একটি বাহিনী থাকিলে এজেন্সীর প্রভাব এই ভাবে ক্ষুণ্ণ হইত না।

১৮৮৭ সনে মণিপুর সরকার আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন

হয়। রাজ্যের সীমান্তবাসী,—কুকিদের দলপতি তমহুর সহিত একজন রাজকর্মচারীর মতান্তর ঘটে। কর্মচারীটি কিছু অসঙ্গত পার্বণী চাওয়াতেই ইহার সূত্রপাত হয়। তমহু সেই কর্মচারীকে তাহার এলাকায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। তাহা সত্ত্বেও সে পূর্বের মত সেখানে যাতায়াত করিতে থাকে। তমহু তখন তাহার বিরুদ্ধে মহারাজের নিকট নালিশ জানায়। কিন্তু যথাবিধি নিদর্শন এবং সাক্ষী দ্বারা অভিযোগ প্রমাণ কবিতে না পারায় উক্ত কমচারীকে কোন শাস্তি দেওয়া গেল না। তমহু ক্ষুব্ধচিত্তে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চায়েতের দ্বারা মহারাজকে স্পষ্টভাবে এই কথা জানাইয়া দিল যে, যে পর্যন্ত উক্ত কর্মচারীকে স্থানান্তরিত করা না হয় সেই পর্যন্ত কুকি-গণ রাজকর অথবা কোন ব্যাগার দিবে না। মহারাজা নানাভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তখন সৈন্য পাঠাইলেন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে চতুর্দিকে কুকিদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এই বাহিনী পরাজিত হয়। রাজসৈন্যের এইরূপ পরাজয়ে তমহুর স্পর্ধা আরও বাড়িয়া যায়। তাহাকে সহজে দমন করা যাইবে না দেখিয়া মহারাজ সেনাপতি টিকেন্দ্র-জিৎকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ বহু সৈন্য লইয়া সমগ্র বিদ্রোহী অঞ্চল ঘেরিয়া ফেলিলেন। কুকিগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। তমহুকে বন্দী অবস্থায় রাজধানীতে আনা হইল। এই ব্যাপারে টিকেন্দ্রজিতের খ্যাতি আরও বাড়িয়া গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ তমহু কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার না করায় তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত কুকি নেতার নিকট কারা-

গারের বন্দীজীবন অল্পদিনের মধ্যেই দুর্বিষহ বোধ হইতে লাগিল; সে তখন মহারাজের নিকট কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাহিয়া মুক্তির প্রার্থনা জানাইল। মহারাজা ইতিপূর্বেই অভিযুক্ত কর্মচারীটিকে অপসারিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তৎহুর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন।

কুকিযুদ্ধের প্রায় এক বৎসর পর ১৮৮৮ সনে যোগীন্দ্রসিং নামক এক ব্যক্তি কাছাড় প্রবাসী পাঁচশত মণিপুরী সংগ্রহ করিয়া মণিপুরের সিংহাসন অধিকার করার জন্য অগ্রসর হইতেছিল সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বাধা দেয়। যুদ্ধে যোগীন্দ্র নিহত হয়।

মহারাজের সহোদর ভ্রাতা পাকাস্নার সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের বাল্যকাল হইতেই কোন সদ্ভাব ছিল না। টিকেন্দ্রজিৎ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর পাকাস্নাকে তাঁহার অধীনে কাজ করিতে হয়। ইহা তাঁহার পক্ষে আরও মনোবেদনার কারণ হয়। বড়াচাওবা, ওয়াংখৈরাকপা এবং অবশেষে দুর্দান্ত কুকিদিগকে কৃতিত্বের সহিত পরাজিত করিয়া বারবার মণিপুরের সিংহাসন বিপন্মুক্ত করিতে সমর্থ হওয়ায় রাজদরবারে এবং প্রজাদের মধ্যে তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। ইহাতে পাকাস্নার অন্তরে ঈর্ষার অনল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি হইতেছেন মহারাজের সহোদর ভ্রাতা, সেইজন্য তিনি অপরাপর বৈমাত্রেয়দের চেয়ে অধিকতর সম্মান এবং খাতির পাইতে আশা করিতেন। পদমর্যাদায় যুবরাজ কুলচন্দ্রের স্থান ছিল মহারাজের নীচেই।

সেই জন্য তাঁহার প্রতিও তিনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন কিন্তু লেখাপড়ায় এবং বৈষয়িক বুদ্ধিতে তিনি অপরাপর ভ্রাতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট অহঙ্কার ছিল। কথায় বার্তায় চাল-চলনে তাহার এই বিকৃত মনোভাব সর্বদাই লোককে পীড়া দিত। টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে পাকাস্নার মন কষাকষির আরও একটি কারণ ছিল। তাঁহারা উভয়ে মাইপাকপী নামক এক ধনাঢ্য স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর সুন্দরী কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রণয় লাভের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মাইপাকপী তখন ষোড়শী যুবতী; লম্বা এবং নিখুঁত গড়ন, সোনার বরণ তন্বী, ঘন এবং দীর্ঘ ভ্রমর কালো কেশ, সব কিছু মিলিয়া মণিপুরের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। নানারকম স্বর্ণালঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র পরিয়া থাকায় তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত। মাইপাকপী নৃত্যকলায়ও পারদর্শী ছিল। তাহার পিতা রাজদরবারে একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন।

পাকাস্না কোন রকমেই টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া নিজের সহোদর ভাইদিগকে তাঁহার দলে আনিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশরজিৎ ও গোপালস্নাকে পক্ষে আনিতে বেশী দেরী হইল না। মহারাজা শূরচন্দ্র ধার্মিক এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এই সব পারিবারিক কলহের উর্ধ্বে থাকায় পাকাস্না তাঁহার নিকট নিজের অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেন না। পাকাস্নার তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া টিকেন্দ্রজিৎও বসিয়াছিলেন না। কুলচন্দ্র এবং টিকেন্দ্রজিৎ বৈমাত্রেয় হইলেও দুই সহোদরা ভগ্নীর গর্ভজ সন্তান। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ

সদ্ভাব ছিল। অপরাপর বৈমাত্রেয় ভাইগণও পাকাস্নার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত থাকায় টিকেন্দ্রজিতের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের দুঃখকষ্ট এবং মনোবেদনা লাঘবের জন্য তিনি সর্বদাই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ফলে দলাদলিতেও টিকেন্দ্রজিৎ পাকাস্নার উপর দিয়া গেলেন। সুতরাং এই উপায়ে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা কম দেখায় —পাকাস্না তখন অন্য পথ ধরিলেন; তিনি মহারাজের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য রাজকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। লেখাপড়া জানা থাকায় এই কাজে অতি সহজেই তিনি মহারাজের আস্থাভাজন হইয়া উঠিলেন। লোকেও তখন তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতে লাগিল। মহারাজা রাজকার্যে পাকাস্নার বুদ্ধি এবং নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। এতদিন পর যুবরাজ এবং সেনাপতিকে জব্দ করার সুযোগ আসিল। বিচার বিভাগের উপর কর্তৃত্বভার ছিল যুবরাজের হাতে। পাকাস্না তাঁহার কার্যের নানা ক্রটি বিচ্যুতি ধরাইয়া দিয়া এই বিষয়ে তাঁহার অযোগ্যতা সম্বন্ধে মহারাজার মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। এই ব্যাপারে পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রীমউড সাহেবও পাকাস্নাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজা তখন স্বতন্ত্র বিচার সচিবের পদ সৃষ্টি করিয়া পাকাস্নাকে বিচার বিভাগের ভার দেন। এইভাবে পদচ্যুত হওয়ায় যুবরাজ কুলচন্দ্র যথেষ্ট মর্মাহত হইয়াছিলেন। যুবরাজকে এইভাবে কাবু করার পর পাকাস্না টিকেন্দ্রজিতের প্রতি মনোযোগ দিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নানা কাহিনী

মহারাজের কানে লাগাইয়া তাঁহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমাগত এইরূপ বিষ ঢালার ফলে মহারাজার মনও বিষাক্ত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ মহারাজের পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়ায় টিকেন্দ্রজিৎকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সমস্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে সংহতি আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন অনিষ্ট হইলে টিকেন্দ্রজিৎ তাহা নিজেরই ক্ষতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সর্বকনিষ্ঠ রাজভ্রাতা জিল্লাঙম্বা টিকেন্দ্রজিতের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সেইজন্য পাকাসনা তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেন। আদালতে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার বিবৃতিতে বলেন—"আমাদের পিতার মৃত্যুর সময় সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমার জিল্লাঙম্বার বয়স ৯। ১০ বৎসর মাত্র ছিল। রাজকীয় কোন পদ বা সম্মান তাহাকে প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার বয়স বাড়িতেছে আনুষঙ্গিক খরচপত্র বাড়িয়াছে কিন্তু মহারাজ শূরচন্দ্র তাঁহার মাসহারা বাড়াইয়া দেন নাই। নানা সময়ে তাঁহাকে নানারূপে অত্যাচরিত ও অপমানিত করা হইয়াছে। মণিপুর রাজবংশধরগণ বাড়ীর বাহির হইলে বা কোথাও গেলে, শিঙ্গা বাজাইবার রীতি আছে। জিল্লাঙম্বা একদিন বাহিরে যাইবার সময় শিঙ্গা বাজিতেছিল। 'এইরূপ শিঙ্গা বাজান অপরাধ হইতেছে—মহারাজের অপমান করা হইতেছে' ইত্যাদি রূপ বলিয়া পাকাসনা তাহা বন্ধ করিলেন। মহারাজও তাহা একেবারে রহিত করিবার আদেশ দিলেন। এই প্রচলিত সম্মান ও সম্ভ্রমের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায় জিল্লাঙম্বার মনে দারুণ কষ্ট হইল, কিন্তু তিনি এই

লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেছিলেন।" (বঙ্গানুবাদ)। টিকেন্দ্রজিতের সহিত ভাব থাকার অপরাধে পাকাস্না অঙোস্নার উপরও নানারূপ ছল-চাতুরী প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। টিকেন্দ্রজিতের বিবৃতিতে দেখা যায়—"পাকাস্না মহারাজ শূরচন্দ্রকে হঠাৎ মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে অঙোস্না গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করিতেছে। মহারাজও সে বিষয়ের সত্যাসত্যের কোন তদন্ত না করিয়াই একেবারে হুকুম দিলেন যে, ২০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে অঙোস্না ও জিল্লাঙম্বাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরস্ত্র করা হইবে। কার্যোদ্ধার করিবার জন্য পাকাস্না গুপ্তভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারা মর্মাহত হইলেন এবং এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃসিংহাসন সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইলে যে লোক দেখান বিচার হইত, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি চিরনির্বাসন বা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, ইহা নিশ্চয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা উভয়ে একত্রে ২২শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে রাজবাটি আক্রমণ করিলেন এবং বন্দুকাদি চালাইতে লাগিলেন।...আমি রাজপ্রাসাদে পৌঁছিবার পূর্বেই প্রজাবর্গের সম্মিলিত হইবার চিরপ্রচলিত সঙ্কেত ৫টি তোপ দাগা হইয়াছিল। মহারাজার পলায়নের কথা সকলেই বলিতেছিল।...... কিন্তু সেই দুইজন রাজকুমার বা আমি কেহই রাজা হইতে চাহি নাই, যুবরাজ কুলচন্দ্রকে রাজপদাধিকারী করিয়া

যুক্তি ধার্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সে রাত্রে যুবরাজকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না এবং মহারাজা ও তাঁহার সহোদর তিন ভ্রাতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে জানা গেল যে যুবরাজ কুলচন্দ্র কয়েকজন অনুচরসহ, বিষেণপুরের দিকে গিয়াছেন এবং মহারাজা তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত রেসিডেন্সীতে আশ্রয় লইয়াছেন। এই সকল বিবরণের উল্লেখ করিয়া আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট… তারে সংবাদ পাঠান হইল। পরদিন পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট উত্তর আসিল। তদনুসারে গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি সাহেব যুবরাজকে রাজ-অছি (R-gent), আমাকে যুবরাজ, অঙৌম্বাকে সেনাপতি, জিল্লাঙম্বাকে শামুহুঙবা বলিয়া স্বীকার করিলেন।" (বঙ্গানুবাদ)।

টিকেন্দ্রজিতের পরামর্শে ও সহযোগিতায়ই যে শূরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত (coup) হইয়াছিলেন একথা সহজেই অনুমান করা যায়। টিকেন্দ্রজিৎ কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিবরণের সঙ্গে এইটুকু যোগ করিয়া লইলে মিষ্টার গ্রীমউড ও তাহার পত্নীর বিবরণের সঙ্গে উহার বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মহারাজা এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হাওয়ারফলে ভয়ে বিচলিত হইয়া তাঁহার সহোদরগণের সঙ্গে রেসিডেন্সীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে আসিয়াও তাঁহারা লোক সংগ্রহ করিয়া সেনাপতিকে আক্রমণের চেষ্টায় ছিলেন* কিন্তু রেসিডেন্সীর প্রাঙ্গণের মধ্যে তাঁহাকে অস্ত্রধারী লোকজন একত্র

---

* (Ref. ২৩।৯।৯০ তারিখ পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট হইতে আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট তার সংবাদে প্রকাশ)।

করিতে দেওয়া হয় নাই (পলিটিক্যাল এজেন্টের তার সংবাদে প্রকাশ)। পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ গ্রীমউড ২৫শে সেপ্টেম্বর আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট এক চিঠিতে উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ জানাইয়াছিলেন :—

"কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা মহারাজা করেন নাই। কিন্তু দোলাইরোইহনজাবা এবং জিল্লাসিং বলেন যে, তাঁহাদিগকে দেশান্তরিত করা বা অন্যরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। মৈ সংযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক জিল্লাসিং, মহারাজের খাসমহল হঠাৎ আক্রমণ করেন। অবিরত বন্দুক ও গুলী চলিতে থাকে। তাহাতে কেহ আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও প্রাণভয়ে মহারাজা সত্বর পলায়ন করেন; তৎপরে সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, সকল দ্রব্য অধিকার করিলেন এবং আক্রমণ নিবারণের সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন।"

"দিবালোক প্রকাশ হইবামাত্রই, আমি জানিতে পারিলাম যে সেনাপতি, দোলাইরোই হানজাবা ও জিল্লাসিং রাজবাড়ীতে আছেন এবং চারিটী পাহাড়ী কামান ও বারুদাগার দখল করিয়াছেন। যুবরাজ কুলচন্দ্র কাছাড়ের রাস্তার দিকে চলিয়া গিয়াছেন. দরবারের মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল আয়াপুরেল সেনাপতির সহিত আছেন। থাঙ্গাল জেনারেল, তাঁহার পুত্রগণের সহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলে রেসিডেন্সীতে আসিয়াছিলেন।" (পত্র নং ২৮৮)। মহারাজা আশা করিয়াছিলেন গ্রীমউড সাহেব তাঁহার সৈন্য লইয়া সেনাপতির বিরুদ্ধে লড়িবেন। কিন্তু "......রাজবাটীর দক্ষিণদিকে

বারুদখানাটি (ম্যাগেজিন) আক্রমণ নিবারণোপযোগী উৎকৃষ্ট আড্ডা। যদি সেইটিকে সহসা হস্তগত করিয়া আয়ত্তাধীনে রাখা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমার অধীনস্থ লোকেরা বিশেষ কষ্ট ব্যতীতও প্রাতঃকালে রাজবাটি পুনরাধিকার করিতে পারিত। কিন্তু যখন সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতারা যাবতীয় কামান ও যুদ্ধ সামগ্রী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদ আক্রমণের জন্য ৮৫ জন গুর্খাসৈন্য পাঠাইলে নিতান্তই বাতুলতার কার্য হইত।" (পত্র নং ৩৫১ সি, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯০ সাল)।

মহারাজা রেসিডেন্সীতে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করিতেছিলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টকে বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। "পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে মহারাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিতে এবং সেইখানেই বসবাস করিতে, দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে এবং তাঁহাকে যেন হাজারিবাগ পাঠান না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে, বহু মিনতির সহিত বলিলেন। আমার বোধ হয়, বড় চৌবার বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি হাজারিবাগের কথা তুলিয়াছিলেন।" (পত্র নং ২৮৮ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সাল।) মহারাজ গ্রীমউড সাহেবের সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের বিশেষ বন্ধুত্বের কথা অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে মহারাজের সন্দেহ ছিল। পরবর্তী চিঠিপত্রে এবং গ্রীমউড সাহেবের আচরণে মনে হয় টিকেন্দ্রজিতের প্রাধান্য স্থাপনে তিনি সম্ভবতঃ সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন, এবং

শূরচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবে তাহার ঘোরতর আপত্তি দেখা যায়। "আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যদি তিনি যথার্থই বৃন্দাবন যাইবার মত স্থির করিয়া থাকেন, তবে আমি সেপক্ষে সকল সুব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু তিনি একবার গেলে এ জীবনে আর কখনও মণিপুর কাছাড় বা সিলেট আসিতে পারিবেন না, একথা বিশেষরূপে বুঝাইলাম। আমি ইহাও বলিলাম যে, পাক্কাস্নাকেও অবশ্যই যাইতে হইবে; অপর সকলে ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত যাইতে বা মণিপুরে থাকিতে পারেন।·······আমি যখন রাজবাটিতে গেলাম, তখন মহারাজার ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতারা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইল। সেনাপতি, মহারাজ এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের কাছাড় পর্য্যন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং যাহারা মণিপুরে থাকিবে, তাহাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। যুবরাজ তখন কাছাড়ের পথে ৮ মাইল দূরে ছিলেন···। সেনাপতি তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইবেন, একথাও বলিলেন। যুবরাজ ইহার দুই তিন ঘণ্টা পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।" (পলিটিক্যাল এজেন্টের পত্র নং ২৮৮, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সাল।) যুবরাজ কুলচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট এক চিঠিতে তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সংবাদ জানাইলেন।

"I have most respectfully to inform your Excellency that, owing to certain reason, there was

constant displeasure and quarrels between our brothers, for which my eldest brother, the Maharaja Surachandra Singh, making voluntary abdication of the throne to me (the heir of the throne) left for Brindaban. Accordingly I ascended the throne of my father and grand-father on the 8th Ashin last."

Correspondence relating to Manipur 1891.—p. 9.

মহারাজা শূরচন্দ্র বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া রেসিডেন্সী হইতে টিকেন্দ্রজিৎকে নিম্নোক্ত চিঠি লিখিয়া ছিলেন :—(বঙ্গানুবাদ)

"আমি এতদ্বারা আমার কনিষ্ঠভ্রাতা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। ইতিপূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, একবার বৃন্দাবন যাইতে আমি নিতান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু পর্বত সকল অতিক্রম করিয়া হাঁটিয়া এদেশ পার হইতে এবং সেখানে যাইতে আমি অক্ষম। অতএব ভাই! তুমি আমার বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্ত, অনুগ্রহপূর্বক করিয়া দাও। পাকাসনা তোমার সহিত বিস্তর কুব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু ভূতপূর্ব মহারাজা আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের নাম স্মরণ করিয়া তুমি তাহাকে মার্জনা করিবে। তুমি যে ইহা করিবে, একথা শুনিতে আমি নিতান্ত উৎসুক রহিলাম। শকাব্দা ১৮১২, ভাদ্র, শুক্ল ৯ই, মঙ্গলবার, ইংরেজী ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সন।"

তাহার উত্তরে টিকেন্দ্রজিৎ লিখিয়াছিলেন—"......শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ আজ্ঞা অনুসারে, শ্রীধাম ব্রজ নির্বিঘ্নে পৌঁছিবার

চেষ্টিত হইব। অধীনেরা শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে যাহা অপরাধ করি, তাহা মার্জনা করিবেন।"

এইস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ শূরচন্দ্র স্পষ্টভাবে কোন ঘোষণা দ্বারা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন উপরোক্ত চিঠি-পত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। "মহারাজের দেশত্যাগের কথা রাষ্ট্র হইবামাত্রই, বহু সংখ্যক মণিপুরী তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেসিডেন্সীতে আসিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে কম বা বেশী নজরা না দিল। সকলে যেরূপ কান্দিতে লাগিল, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, মহারাজা লোক প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার বিদায়ে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭৷৷০ টার সময়, মাহারাজা এবং তাঁহাব ভ্রাতাগণ এখান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। তাহাদের সহিত কাছাড় পর্যন্ত যাইবার জন্য, আমি ৪৪নং গুর্খা পদাতিক দলের ৩৫জন বন্দুকধারী দিয়াছি। মহারাজের ত্বরায় এখান হইতে বিদায় হওয়া, খুব ভালই হইয়াছে।...(এস্থান অপবিত্র বলিয়া) তিনি এখানে কিছুই খাইতেন না।...তাঁহার এখানে থাকাতে আমার আনুষঙ্গিক সমস্ত লোকের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। অধিকন্তু তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, ততক্ষণ দুর্ঘটনা এবং লোকের মন বিচলিত হইবার আশঙ্কা, সর্বদাই ছিল। তজন্য আমি অনুমতির অপেক্ষায় কালক্ষেপ না করিয়া, নিজ দায়িত্বে, মহারাজকে বিদায় দিয়াছি। (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সালে পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্তৃক লিখিত ২৮৮নং পত্রের বঙ্গানুবাদ)। ২৪শে সেপ্টেম্বর আসামের চিফ কমিশনার তাহার নিকট তার এবং পত্রের উত্তরে

পলিটিক্যাল এজেন্টকে নিম্নোক্ত তার করিয়াছিলেন—"……গভর্ণমেন্টের মঞ্জুরী না পাওয়া পর্যন্ত যুবরাজকে রাজ অছি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তান্ত লিখিবেন এবং মহারাজা ও পাক্কাস্না রওয়ানা হইলেন কিনা সংবাদ দিবেন।" (বঙ্গানুবাদ)। উক্ত তারের সংবাদে ইহা প্রমাণিত হয় যে চিফ কমিশনার সাময়িকভাবে কুলচন্দ্রের শাসনভার গ্রহণের অধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য এ সমস্তই হইয়াছে গ্রীমউড সাহেবের প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া। এই ভাবে পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্তৃক শূরচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ দিয়া কুলচন্দ্রের জন্য সুপারিশ করা এবং ভারত সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া শূরচন্দ্রকে অবিলম্বে নিজ দায়িত্বে কাছাড়ে পাঠাইয়া দেওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর আচরণ। ভারত সরকারও এইজন্য নিম্নোক্ত পত্রে চিফ কমিশনারকে অনুযোগ দিয়াছিলেন।

"আপনি যখন কোহিমা হইতে সৈন্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া উভয় দলের মধ্যস্থতা করিতে মিষ্টার গ্রীমউডকে তারযোগে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন রাজবাটীতে সেনাপতির নিকট গিয়া, বিভ্রাটের কারণ জানিয়া, আপনাকে সংবাদ দেওয়া তাহার উচিত ছিল। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রকাশ হইতে যে, মহারাজা সম্পূর্ণরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছেন। এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট মহারাজার পলায়নে সম্মতি দিয়াও সেনাপতির (টিকেন্দ্রজিতের) বিদ্রোহের সফলতা স্বীকার করিয়া যে গুরুতর কার্য করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকে সেরূপ করিতে হইত না। সে ক্ষেত্রে সেনাপতিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহি ও

বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার সহিত আমরা প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে পারিতাম।" (গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৪শে জানুয়ারি ১৮৯১ সনে, আসামের চিফ কমিশনারকে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)। ১৮৯১ সনে 'মণিপুব যুদ্ধ' এবং আসামের চিফ কমিশনার মিষ্টার কুইণ্টন, পলিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্টার গ্রীমউড প্রভৃতি সাহেবদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলে রহিয়াছে শূরচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি সেইজন্য এই ঘটনার সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট দলিল ও চিঠিপত্রাদি হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া এসম্পর্কে যথাসম্ভব সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হইল।

উপরোক্ত অবস্থায় ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজা শূরচন্দ্রের রাজত্বের অবসান হয়। শূবচন্দ্র দেখিতে খর্বাকৃতি হইলেও তাঁহার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফরসা। মুখের গড়ন ছিল চীনা ও ব্রহ্মদেশীয়দের মাঝামাঝি এক ধরণের, কিন্তু বসন্তের দাগ থাকায় তেমন সুশ্রী দেখাইত না। তাঁহার পোষাক ছিল সাদাসিধা। পরণে পাতলা সাদা ধুতি, গায়ে সোনার বোতামওয়ালা সাদা কোট, মাথায় একপ্রকার হলুদ পল্লবসহ বৃহৎ উষ্ণীষ, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধূসরবর্ণের গরম মোজা এবং অতি সাধারণভাবে তৈরী বড় বড় বুটজুতা—এই ছিল তাঁহার ভূষণ। মহারাজা শূরচন্দ্র ইংরেজের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সবসময়ই ইংরেজ সরকারের আপদে-বিপদে সাহায্য করিতে সচেষ্ট ছিলেন। উদারতা এবং ধর্মভাবের জন্য প্রজাগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। পাক্কাম্বার কবলে না পড়িলে এবং রাজোচিত সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের

সঙ্গে সৌহৃদ্য বজায় রাখিয়া আজীবন নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুনে মণিপুরকে দগ্ধ হইতে হইত না।

Ref : 1. Assam District Gazotteers Vol. IX—1905 by —B. C. Allen. C. S.

2. My Experiences in Manipur and the Naga Hills by — Major-General Sir James Johnstone K. C. S. I. —1896

3. My Three years in Manipur by—Ethel St. Clair Grimwood—1891

4. বিজয় পাঞ্চালি (in Manipuri) by—মুতুয়া বামন সিং।

5. মণিপুর ইতিহাস—(in Manipuri) —1947 by—রাজকুমার হাল সিং।

6. মণিপুরের ইতিহাস (in Bengali)—1891 by—শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী

7. Senepati Tikendrajit—(in Hindi)—Pandit Kartikeya Charan Mukhopadhyaya

[এই প্রবন্ধে উল্লিখিত চিঠিপত্র এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বিবৃতির বঙ্গানুবাদ উপরোক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভারত সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত প্রাচীন দলিল পত্র পাঠের সুযোগ লাভ করা এখনও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। লেখক শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী তাঁহার গ্রন্থের শেষভাগে মণিপুর সম্পর্কে সেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য দলিল পত্রাদির হুবহু বঙ্গানুবাদ যুক্ত করিয়া দিয়া সত্যানুসন্ধানী ইতিহাস পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার সুযোগ দিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।]

তের

ঘনায়মান মেঘ

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে মণিপুরের রাজনীতিতে পর পর যে দুইজন প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন—থাঙ্গাল জেনারেল ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ। মণিপুরে তাঁহাদের মত দেশ প্রেমিক খুব কমই জন্মিয়াছেন; এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে চরম দণ্ড তাঁহাবা বাছিয়া লইয়াছিলেন—সকল দেশে এবং সকল যুগে খুব কম লোকই তাহা গ্রহণ করিতে সাহস করে।

থাঙ্গাল জেনারেল—

মণিপুরের ইতিহাসে থাঙ্গাল জেনারেল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হইলেও লোকে তাঁহাকে থাঙ্গাল মেজর বলিয়াই ডাকিত। সাধারণ মণিপুরীদের চেয়ে তিনি ঈষৎ কালো এবং খর্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সবল দেহ, উন্নত নাসিকা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিত। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তাঁহার কর্মশক্তি অটুট ছিল। কেহ কেহ বলেন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল নাগাকুলে, পরে মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মণিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। তিনি ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া সারা জীবন মণিপুরের সেবা করার পর ১৮৯১ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে ইংরেজের ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করেন। মারজিৎ সিং যখন মণিপুরের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে নিকটতম জ্ঞাতিদের হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন এই থাঙ্গাল মেজরের পিতৃব্য কৌশলে

মারজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীর সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। থাঙ্গাল মেজর অতি অল্প বয়সেই রাজদরবারের কাজে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একবার তিনি থাঙ্গাল গ্রামের বিদ্রোহী নাগাদিগকে সায়েস্তা করার জন্য সহকারী হিসাবে মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নাম হয় থাঙ্গাল। ইহার পর যদিও তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজসরকারে অনেক উচ্চপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি "থাঙ্গাল মেজর" নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৪ সনে নরসিংহের বিরুদ্ধে মহারাণী কুমুদিনী দেবীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর তিনিও মহারাণীর সঙ্গে কাছাড়ে যাইয়া নাবালক চন্দ্রকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৫০ সনে নরসিংহের মৃত্যুর পর চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে তিনিও পুনরায় মণিপুরে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার সাহায্য না পাইলে চন্দ্রকীর্তির পক্ষে পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করা সম্ভব হইত কিনা বলা যায়না। মহারাজ চন্দ্রকীর্তির সিংহাসন আরোহণের পরও কোন প্রকার গুরুতর এবং বিপদজনক কাজ উপস্থিত হইলেই তাহার ভার পড়িত থাঙ্গাল মেজরের উপর। অকৃত্রিম আনুগত্য এবং রাজসেবার ফলে তিনি মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজদরবারে একজন প্রধান সভ্যরূপে বিবেচিত হইতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন মহারাজ চন্দ্রকীর্তির রাজ্যের একটি দৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ। কিন্তু এক সময় কোন কারণে মহারাজের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহাকে রাজদরবারের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কুলক সাহেব তখন মণিপুরের পলিটিক্যাল

এজেণ্ট। মণিপুরে আসিয়াই তিনি তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মহারাজ পুনরায় থাঙ্গাল মেজরের উপর সদয় হইয়াছিলেন। চালচলনে তত মার্জিত না হইলেও তাঁহার মন এবং মুখ এক কথা কহিত। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির; কিন্তু বিদ্রোহী প্রজাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম দূতের ন্যায় ভয় করিত। ইংরেজী-ভাষা না জানিয়াও তিনি ইংরেজের স্বভাব এবং রীতিনীতির খবর রাখিতেন। মণিপুরের ভৌগলিক আয়তন এবং বিভিন্ন যাযগাব অবস্থান তাঁহাব নখদর্পণে ছিল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মণিপুরের সীমা নির্দেশক কমিশনের সঙ্গে তিনি মণিপুরের প্রতিনিধি হিসাবে স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজের শক্তিসামর্থ্যের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সেইজন্য তিনি কখনও ইংরেজকে চটাইতে চাহিতেন না। কিন্তু যেখানে মণিপুরের স্বার্থ জড়িত আছে, সেখানে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করিয়া জানকবুল করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাঁহার মত লোক যে কোন বড় রাষ্ট্রের কর্ণধার হইতে পারিতেন। মহারাজ শূরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ভাব ছিল; সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের প্রতাপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্য বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিনের জন্য রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। টিকেন্দ্রজিৎও থাঙ্গাল মেজরকে ভয় করিয়া চলিতেন। শূরচন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতির পর টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখার জন্য পুনরায় রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজদরবারে

আগের মত তাঁহার প্রাধান্য বজায় থাকিলে শূরচন্দ্রকে হয়ত এইভাবে মণিপুর হইতে বিদায় লইতে হইত না এবং সেই সম্পর্কে মণিপুরের ঘটনাবলিও এতদূর গড়াইত না। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ যতই থাকুক ইংরেজের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধিয়া গেল তখন তিনি নিজের কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। পুত্রশোকগ্রস্ত কোন পিতার প্ররোচনায় এবং পুরাণোক্ত নির্দেশের প্রতি অবিচলিত আস্থার বশে ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিয়া তিনি নিজেও ডুবিলেন এবং মণিপুরকেও ডুবাইয়া গেলেন। এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার বশে বিবেক বুদ্ধি না হারাইলে তাঁহাকে জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ইংরেজের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইত না এবং আশ্রিতের হত্যার কলঙ্কে মণিপুরের ইতিহাসও কলঙ্কিত হইত না।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ—১৮৫৯ সনে টিকেন্দ্রজিতের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ না থাকিলেও মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি পরিষ্কার বাংলা এবং হিন্দীভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেবের নিকট তিনি কিছুদিন ইংরেজীও পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পরেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। ১৫। ১৬ বৎসর বয়সেই ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক জন্তু শিকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বল ছিল অসীম; মুক্ত তরবারি হস্তে বড় বড় বাঘের সম্মুখে একাকী লাফাইয়া পড়িতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি এইভাবে

সর্বদা ব্যাঘ্র শিকারের অন্বেষণে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'কৈরেং' বলিয়া ডাকিতেন। মণিপুরী-গণও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে ভালবাসিত। ২১ বৎসর বয়সে তিনি পিতার নির্দেশে জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে নাগা যুদ্ধে যাইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। সেকালে ভারতের রাজা মহারাজা এমনকি ছোটখাট জমিদার পরিবারে পর্যন্ত বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সেই চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে ক্রমান্বয়ে ৮টি বিবাহ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শারীরিক শক্তিতে মণিপুর রাজ্যে তাঁহার কোন জুড়ি ছিল না। পলো খেলাতেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। গ্রীমউড-পত্নী তাঁহার গ্রন্থে টিকেন্দ্রজিতের উদার এবং অমায়িক স্বভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ অন্যান্য রাজপুত্রদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার বিবেচনায় কাহাকেও কোন অন্যায় কার্য করিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না স্থান কাল পাত্র ভেদে ন্যায় অন্যায় বোধেরও তারতম্য হয়। একজন ইউরোপীয়ের নিকট গো-হত্যা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও একজন মণিপুরীর নিকট তাহা নরহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। একবার টিকেন্দ্রজিৎ একজন নাগাকে গো-হত্যার অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। এই আচরণের জন্য তিনি জনষ্টন সাহেবের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্তির মৃত্যুর পর টিকেন্দ্রজিৎ যে রাজ্যের মধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন

এ সম্বন্ধে জনষ্টন সাহেবের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহার হাতে ক্ষমতা গেলে মণিপুরের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্পর্ক গড়িয়া উটিয়াছে—তাহাও যে অপরিবর্তিত থাকিবেনা জনষ্টন সাহেব একথাও ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেণ্টদের বিরাগভাজন থাকা নিজের পক্ষেই ক্ষতিকর বিবেচনা করিয়া পরবর্তী এজেণ্টদের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রক্ষা করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রীমউড সাহেবের সহিত তাঁহার বেশী রকম মাখামাখি হইয়াছিল। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা এবং আনুসঙ্গিক চিঠি পত্রাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া শূরচন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতির ব্যাপারে গ্রীমউড সাহেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পরোক্ষ সমর্থন না থাকিলে টিকেন্দ্রজিৎ এরূপ করিতে সাহস করিতেন কিনা এবং সাহায্য না পাইলে এত সহজে সফল হইতেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এই ঘটনাই টিকেন্দ্রজিৎ এবং মণিপুরের কাল হইল। ভারত সরকারের অহেতুক জেদের ফলে কুইন্টন, গ্রীমউড প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারীগণ প্রাণ হারাইলেন। তাহাদেরই রক্তের প্রতিশোধে দলে দলে ইংরেজ সৈন্য মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ পতাকা উড়াইল। বিচার-প্রহসনের দ্বারা টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসি দিয়া ইংরেজ শাসকদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে ৯ বৎসরের একমাত্র পুত্র চৌবাকে রাখিয়া মণিপুরের বীর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সমস্ত মণিপুরকে শোকগ্রস্ত করিয়া নির্ভিক চিত্তে

মৃত্যু দণ্ড গ্রহণ করেন। সেদিন অসহায় মণিপুরের রমণীগণ চোখের জলে এই মৃত্যু দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই প্রতিবাদ আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অন্য একটী মহিলা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট পৌছিয়াছিল কিনা, তাহা কে জানে।

ঘনায়মান মেঘ

পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রীমউড সাহেব শূরচন্দ্রের মণিপুর হইতে বিদায় হওয়ার সময়, তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এই মর্মে একটি ছাড়-পত্র তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। কাছাড়ে আসিয়া শূরচন্দ্র এই ছাড়পত্রের অর্থ অবগত হওয়া মাত্রই তার-যোগে ভারত সরকারের নিকট ইহার প্রতিবাদ জানান ("Just now opening Political Agent's Pass learn that I abdicated, wholly untrue. Political Agent misunderstood me, shall submit full representation later on. Solicit reconsideration and help"—Correspondence relating to Manipur—1891 : P. 8)। অতঃপর তিনি এক চিঠিতে জানান—"আমি যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম এবং সকল লোকেই আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মিঃ গ্রীমউড সে পক্ষে মত দিলেন না। অধিকন্তু রেসিডেন্সি রক্ষকগণের দ্বারা আমার অনুগত সৈন্যগণকে তিনি নিরস্ত্র করিলেন।" ইহার উত্তরে গ্রীমউড সাহেব লিখিলেন, "অপরাহ্নে রেসিডেন্সিতে এত অধিক সংখ্যক মণিপুরী একত্র হইল

যে, আমি তাহাদের অনেককে (বিশেষতঃ অস্ত্রধারীগণকে) জিদের সহিত বিদায় করিলাম।...রাত্রে রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কাও না হইতেছিল এমত নয়। তদবস্থা ঘটিলে যাহাতে সে সব রক্ষা পায়......আমি পূর্বোক্ত মত কার্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে মহারাজের মনে যে অত্যন্ত কষ্ট হইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন লোকে বলিবে যে আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়াছি। তৎপরই তিনি গদি পরিত্যাগপূর্বক উদাসীনাবস্থায় বৃন্দাবন গমনের কথা উত্থাপন করিলেন।" (বঙ্গানুবাদ)। অথচ শূরচন্দ্রের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর তিনি চীফ কমিশনারের নিকট তারযোগে সংবাদ দিয়াছিলেন—"...... আপাততঃ রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কা করিবেন না। মহারাজা এবং তাঁহার ভ্রাতারা লোক সংগ্রহ করিয়া সেনাপতিকে আক্রমণের চেষ্টায় আছেন।..." ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সন। (বঙ্গানুবাদ)।

রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কা স্পষ্টতই গ্রীমউড সাহেবের পশ্চাৎ কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। চিফ্ কমিশনার শূরচন্দ্রের রাজপ্রসাদ হইতে পলায়নের সংবাদ পাওয়া মাত্রই গ্রীমউড সাহেবকে তারযোগে জানাইয়াছিলেন,—"উভয়দলের মধ্যে আপোষ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে, সৈন্য পাঠাইবার জন্য কোহিমায় সংবাদ দিবেন। সেখানকার সেনানায়ককে আপনার নিকট দুইশত বন্দুকধারী পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইল।" (বঙ্গানুবাদ)। কিন্তু গ্রীমউড সাহেব সেই উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অবিলম্বে নিজ দায়িত্বে শূরচন্দ্রকে নিরস্ত্র করিয়া কাছাড়ে

পাঠাইয়া দিলেন। শূরচন্দ্র যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন পুনর্দখল করিতে ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট ছিলেন উভয়ের পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীমউড সাহেব তাঁহাকে নিরস্ত্র করার পর—তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষনা করিয়া কুলচন্দ্রকে মণিপুরের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য উমেদারি আরম্ভ কবিয়া দিলেন। মণিপুবে থাকাকালে শূরচন্দ্রের এমন কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় না যাহাতে প্রমাণিত হয় তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বন্ধু টিকেন্দ্রজিতের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ সফল করিবার উদ্দেশ্যে গ্রীমউড সাহেব নিজেই এই কথা বচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠিপত্রে টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে একটি কথারও উল্লেখ না থাকায় এই সন্দেহ আরও দৃঢ হয়।

গ্রীমউড সাহেব মণিপুরে আসার পরই বুঝিতে পারিয়াছিলেন —শূরচন্দ্র ইংরেজের যতবড় মিত্রই হউক—আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবেন না। রেসিডেন্সি রক্ষার্থ সৈন্য সংখ্যা বাড়ানর অনুমতিও তিনি দেন নাই। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন গোড়া হিন্দু, সেইজন্য গ্রীমউড সাহেবের ব্যক্তিগত অনেক আচরণ তিনি পছন্দ করিতেন না। রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর তিনি সেখানে জাতি নষ্ট হওয়ার ভয়ে জল গ্রহণ পর্যান্ত করেন নাই। একবার গ্রীমউড সাহেব মণিপুরী ভদ্রমহিলাদের ছায়াচিত্র তোলার ইচ্ছায় মহারাজের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। মর্যাদাহানিকর বিবেচনা করিয়া মহারাজা ইহাতে সম্মতি দেন নাই।

অবশেষে টিকেন্দ্রজিতের যোগাড়যন্ত্রে গ্রীমউড সাহেব গোপনে কতিপয় চিত্র তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজের এই সব আচরণের জন্য গ্রীমউড সাহেবও তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন।

পক্ষান্তরে টিকেন্দ্রজিৎ গ্রীমউড সাহেবকে সহজেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন। মণিপুরের মত ইংরেজ বর্জিত দেশে তিনি সর্বদা গ্রীমউড সাহেবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পলো খেলা এবং শিকারে সহযোগিতা দ্বারা নিঃসঙ্গ ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেণ্টকে আনন্দ দান করিয়া অচিরেই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। এই অবস্থায় গ্রীমউড সাহেবের মত নূতন এবং অনভিজ্ঞ কর্মচারী সহজেই তাঁহার দিকে ঝুকিয়া পড়িবেন ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

রাজ্যচ্যুত শূরচন্দ্র, আসামের চিফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে শিলচরে আসেন। কিন্তু কুইণ্টন সাহেব তখন স্থানান্তরে থাকায় তিনি কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলেন। চিফ্ কমিশনারের প্রধান সেক্রেটারি কলিকাতার পুলিস কমিশনারকে তারযোগে এই সংবাদ জানাইয়া মহারাজের সঙ্গে একজন পুলিস ইনিস্পেক্টর মোতায়েন করেন। উক্ত ইনিস্পেক্টর তখন তাঁহাকে কলিকাতার পুলিস কমিশনারের হাতে সমর্পণ করিয়া চলিয়া আসে। এইভাবে রাজবন্দীর মত কলিকাতা আসিয়া ইংরেজের সাহায্য লাভের আশায় ভারত-গভর্ণমেণ্ট এবং আসামের চিফ কমিশনারের নিকট পত্রদ্বারা লিখিয়া জানাইলেন যে, "১৮৯০

ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ পলিটিক্যাল এজেণ্ট, আমার রাজধানীতে সর্বদা অবস্থিতি করেন। যদিও আমি রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম, অথচ আমার আপদ বিপদে গভর্ণমেণ্ট আমাকে রক্ষা করিবেন ও আশ্রয় দিবেন এ ধারণা আমার মনে সর্বদাই ছিল। ইতিপূর্বে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমার পিতার প্রভুত্ব রক্ষার সহায়তা—এবং কেহ তাঁহার অধিকারের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন (Govt. Order Feb. 1851)। আমার নিজের পক্ষেও যে সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে, আমার তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি মুহূর্তের জন্যও ভাবি নাই যে, আবশ্যক হইলে, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিশ্রুত সাহায্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন, আমার সময়েই গভর্ণমেণ্ট দুইবার (অর্থাৎ বড় চৌবা এবং যোগেন্দ্র সিং বিদ্রোহী হইলে) বল প্রয়োগ করিয়া মণিপুরের শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। মণিপুরে সেরূপ শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্যভাব প্রদর্শন করা হয়, ইহা নিশ্চয়, তাহা যে গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন, আমি কখনও ভাবিনাই।" (১৪ই নভেম্বর, ১৮৯০ সনের পত্রের বঙ্গানুবাদ)।

শূরচন্দ্রকে পুনরায় মণিপুরের সিংহাসনে বসিতে সাহায্য করা সম্পর্কে ভারত সরকারের তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু গ্রীমউড সাহেব চিফ্ কমিশনারের নিকট লম্বা চিঠি দ্বারা তাহার মনে শূরচন্দ্রের অনুপযুক্ততা সম্পর্কে ধারণা জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। তাহার মতে শূরচন্দ্র পুনরায় ফিরিয়া আসিলে রাজ্য সমূহ অনর্থ

ঘটিবে এবং সেজন্য ইংরেজ সরকারকেও নানা দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে (পত্র নং ৫৫১ সি, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯০ সন)। আমলাতন্ত্রের নিয়মানুসারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধীনস্ত কর্মচারীদের বিবরণ সর্বদাই বেদবাক্যবৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিফ্ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব পলিটিক্যাল এজেণ্টের মত-ই সমর্থন করিয়া ভারত সরকারের নিকট পত্র দেন (পত্র নং ৫২০ পি, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৯০ সন, পত্র ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন, পত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন)। বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন এক তারে (তার সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন, ১৮৯১ সন) জানাইয়া ছিলেন।

"৫ম। ......আমরা তাঁহাকে পুনঃস্থাপিত ও মণিপুর রাজ্যে তাঁহার প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কুইণ্টন পত্রদ্বারা ও মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধির নিকট তদ্বিরুদ্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত মৌখিক আপত্তি করায়, আমরা ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। গ্রীমউড ও মহারাজের পুনঃস্থাপনের বিরোধী ছিলেন। ৬ষ্ঠ। তথাচ আমাদের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত একজন অধিপতির বিরুদ্ধে যে কোন রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইবে—ষড়যন্ত্রকারীরা যে কোন শাস্তি পাইবে না এবং মণিপুরের রাজশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে সেনাপতির হস্তগত হইবে—ইহা আমাদের অসহ্য হইয়াছিল। ...এই হেতু সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত করা আমরা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম এবং কুইণ্টন যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই।" (বঙ্গানুবাদ)।

অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্ট কুইণ্টন সাহেবকে জানাইলেন যে, "১ম। যদি কুলচন্দ্র মণিপুরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে ৩০০ রক্ষক সৈন্য রাখিতে দেন; ২য়। পলিটিক্যাল এজেণ্টের পরামর্শ মত রাজকার্য চালাইতে সম্মত হন এবং ৩য়। টিকেন্দ্রজিতের নির্বাসনের অনুমোদন ও তৎপক্ষে সাহায্য প্রদান করেন, তবে তাঁহাকেই ভারত গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন।" (তার সংবাদ ১৮ই মার্চ ১৮৯১ সন, বঙ্গানুবাদ।)। লর্ড ল্যান্সডাউনের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল প্রস্তাবে দুর্বল কুলচন্দ্র অবশ্যই সম্মত হইবেন। এদিকে স্থির হইল শূরচন্দ্রের নিকটও লেখা হইবে—"তিনি আর রাজত্ব পাইবেন না—কুলচন্দ্রকেই মহারাজা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন।" যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া হইবে। তাঁহাকে বৃত্তিভোগী হইয়া গভর্ণমেণ্টের মনোনীত স্থানে থাকিতে হইবে। যাঁহারা শূরচন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া কুলচন্দ্রকেই সিংহাসন দেওয়া হইবে; কিন্তু শূরচন্দ্র বিনা দোষে নির্বাসিত থাকিবেন ভারত সরকারের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার সমর্থনে কোন যুক্তি খাটে না। শূরচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি দুর্বল, কিন্তু কুলচন্দ্রেরই বা এমন কি অধিকতর যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শূরচন্দ্র বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় সর্বদা জনষ্টন সাহেবের পাশে পাশে থকিয়া তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এই দুঃসময়ে উপরোক্ত

সর্তে তাঁহাকেই মণিপুরের সিংহাসনে বসিতে সাহায্য করিলে—ন্যায় বিচার হইত।

ভারত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে চিফ্ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব ৭ই মার্চ গোলাঘাট হইতে মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ণেল স্কীনের অধীনে আসামের ৪ শত বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্য ছিল। শিলচর হইতেও আরও ২ শত গুর্খা সৈন্য মণিপুরের দিকে রওনা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের আদেশ ছিল টিকেন্দ্রজিৎ যাহাতে কোন প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে বা গোল বাধাইতে না পারে এমন কোন উপায়ে তাঁহাকে বন্দী করিয়া নির্বাসিত করিতে হইবে (পত্র নং ৩৬০ই, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন বঙ্গানুবাদ)। কুইণ্টন সাহেব টিকেন্দ্রজিৎ এবং মণিপুর রাজ্যের ভাবগতিক জানিবার জন্য অধীনস্থ এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার গর্ডন সাহেবকে মণিপুরে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যথা সম্ভব সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ১৮ মার্চ কারোং নামক স্থানে চিফ্ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রীমউড সাহেব মিঃ গর্ডনকে জানাইয়াছিলেন যে "টিকেন্দ্রজিৎ কখনই আত্মসমর্পণ করিবেন না এবং তাহাকে বন্দী করাও সহজ নয়"। মিঃ কুইণ্টন মিঃ গর্ডনের নিকট এই সমস্ত শুনিয়া গভর্ণর জেনারেলের আদেশ জ্ঞাপনার্থ দরবার ডাকিয়া সেখানে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন [তার সংবাদ—১৮ই মার্চ ১৮৯১ সন, আসামের চিফ কমিশনার (ক্যাম্প কারোং) হইতে কলিকাতা ভারত গভর্ণমেণ্টকে]।

অথচ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট লর্ড ল্যান্সডাউনের তারে (তার সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন ১৮৯১ সন) দেখা যায়—"সেনাপতিকে দরবারে গ্রেপ্তার করিবার যুক্তি, বোধ করি ২১শে মার্চ তারিখে সেকমাইয়ে স্থির হয় এবং গর্ডনের ৭ই মে তারিখের তারের সংবাদ পাইবার পূর্বে কুইন্টন যে কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতাম না।" প্রয়োজন বোধে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য বড়লাটের মত উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণও যে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা ভাষণে কিরূপ অভ্যস্ত ছিলেন ইহা তাহারই একটি নিদর্শন মাত্র।

কুইন্টন সাহেব লেঃ গর্ডনের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রীমউড সাহেবকে ইম্ফাল হইতে দশ মাইল দূরে সেকমাই নামক স্থানে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। ২১শে মার্চ গ্রীমউড সাহেব সেখানে যাওয়ার পর চিফ্ কমিশনার তাঁহার মণিপুর আগমনের উদ্দেশ্যের কথা তাহাকে সর্বপ্রথম খুলিয়া বলেন। মিঃ গ্রীমউড "সেনাপতিকে গ্রেপ্তার ও স্থানান্তরিত করার বিরোধী ছিলেন।" কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ লঙ্ঘন করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি মণিপুরে ফিরিয়া আসিয়া রেসিডেন্সিতে দরবারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে মনোযোগী হইলেন। সেদিন মিঃ কুইন্টন ও মিঃ গ্রীমউড ব্যতীত এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার লেঃ গর্ডন চিফ্ কমিশনারের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী মিঃ কসিন্স এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার মিঃ উড্স্, আসামের টেলিগ্রাফ বিভাগের মিঃ মেলভিল্ ও মিঃ উইলিয়ামস্, কর্ণেল স্কীন্, ক্যাপ্টেন বুচার, লেফট্যানেন্ট চেটার্টন, এডজুটেন্ট লেফট্যানেন্ট

লুগার্ড, ক্যাপ্টেন বইলো, লেফট্যানেণ্ট সিম্‌সন, লাট কাউন্সিলের তৎকালীন সমর সদস্যের ভ্রাতুষ্পুত্র লেফট্যানেণ্ট ব্র্যাকেনবারি, ডাক্তার কালভার্ট প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারীগণও সেকমাইতে ছিলেন।

এদিকে মণিপুরে মহারাজ কুলচন্দ্র এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণও অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। লাটসাহেবের নিকট তাঁহাকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত পত্রের কোন জবাব তখনও তিনি পান নাই। অধিকন্তু শূরচন্দ্র কর্তৃক সিংহাসন লাভের জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট ঘন ঘন দরখাস্তের খবরও তিনি পাইয়াছিলেন। এই সময় আরও একটি সংবাদে তাঁহারা আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ পান "অনতিবিলম্বেই মণিপুরে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র শিকার করা হইবে" (A large tiger is shortly to be bagged in Manipur)।

কলিকাতায় অবস্থিত টিকেন্দ্রজিতের কোন মণিপুরী বন্ধু তাঁহাকে এইরূপ তার করিয়া সাবধান করিয়া থাকিবেন। এই সংবাদ ব্যতীত চিফ্ কমিশনারের আগমনের ১৫। ১৬ দিন পূর্ব হইতেই মণিপুরে নানারূপ গুজব রটিতেছিল। তন্মধ্যে একটি হইতেছে চিফ্ কমিশনার ১৮ শত সৈন্যসহ শূরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করার জন্য শীঘ্রই মণিপুরে আসিতেছেন। ইহা লইয়া রাজদরবারে নানা জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। এসম্বন্ধে পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও তাঁহারা কোন খবর জানিতে পারেন নাই। মণিপুর সরকার

তাহাদের নিজস্ব সংবাদদাতার মারফৎ সসৈন্য চিফ্ কমিশনারের আগমনের সংবাদ পাইযাছিলেন—কিন্তু শূরচন্দ্র যে সেই সঙ্গে ছিলেন না—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই ; তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল শূরচন্দ্রও অবশ্যই সেই সঙ্গে আছেন। শূরচন্দ্রকে মণিপুরে প্রবেশ করিতে বাধা দিবার জন্য মহারাজকুমার অঙোম্বার অধীনে এক হাজার সৈন্য পাঠান স্থির করা হইল। গ্রীমউড সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া মহারাজ কুলচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ এই বিপদজনক সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে মহারাজ কুলচন্দ্র তাহাকে জানাইলেন "ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, কেবল শূরচন্দ্রকে বাধা দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।" মহারাজ কুলচন্দ্র শূরচন্দ্র সম্বন্ধে যথার্থ খবর সংগ্রহের জন্য তাঁহার কেরাণী বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতায় গোলাপসিং নামক জনৈক বিশ্বস্ত মণিপুরীর নিকট তার করিতে নির্দেশ দিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি নিজে চিফ কমিশনারের নিকট পত্র লিখিলেন—'তিনি শুনিয়াছেন কমিশনার ভূতপূর্ব মহারাজা শূরচন্দ্রকে লইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার সহিত অনেক ব্রিটিশ সৈন্য আছে। এসকল কথা যথার্থ কিনা ?" তদুত্তরে চিফ্ কমিশনার জানাইলেন যে "শূরচন্দ্র তাহার সহিত নাই। আর বহু সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে থাকার বিষয়ে তিনি ভারত গভর্ণমেন্টের হুকুম প্রতিপালন করিতেছেন।" ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতেও তার সংবাদের উত্তর আসিল—"শূরচন্দ্র কোথাও যান নাই—পূর্বের মত কলিকাতাতেই রহিয়াছেন।"

২১শে মার্চ সেকুমাই হইতে চিফ্ কমিশনার মহারাজকে এইরূপ

পত্র লিখিলেন—"আমি কল্য প্রাতে ১০টার সময় মণিপুর পৌঁছিব। পৌঁছিবার অনতি পরেই রেসিডেন্সিতে একটি দরবার করিব। তাহাতে আপনি সমস্ত ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণের সহিত উপস্থিত হইবেন। আমি সেই দরবারে ভারতের রাজপ্রতিনিধির একখানি পত্র আপনাকে দিব।" (বঙ্গানুবাদ)। চীফ্ কমিশনারের পত্র পাওয়ার পর মহারাজ কুলচন্দ্র পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট জানাইয়াছিলেন —২১শে তারিখ একাদশীর উপবাসের পর ২২শে দ্বাদশীর পারণ এইজন্য ঐ দিন বাদ দিয়া ২৩শে তারিখ দরবারের দিন ধার্য করিলে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা হয়। পলিটিক্যাল এজেন্ট তদুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন চীফ্ কমিশনারকে দরবারের কাজ শেষ করিয়া শীঘ্রই টামু যাইতে হইবে--সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঐ দিনই দরবার বসিবে; উপরন্তু চিফ্ কমিশনারের আদেশের নড়চড় করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই।

নির্দিষ্ট দিনে চিফ্ কমিশনার কুইন্টন সাহেব মণিপুরের রাজ-ধানী ইম্ফালে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ দুইদল সৈন্যসহ ইম্ফাল হইতে ৪ মাইল দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজধানীতে তাঁহার সম্মানার্থ যথাবিধি তোপধ্বনি সহ মহারাজাও তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা করিলেন।

চৌদ্দ

স্বাধীনতা যুদ্ধ

দরবারের বিকলতা :—চিফ কমিশনারের আসার সঙ্গে সঙ্গেই রেসিডেন্সির ভিতরে স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হইল; যাহাতে দরবারের শেষে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করার সময় তিনি কোন রকমে পলাইয়া যাইতে না পারেন। ভারত সরকারের নির্দেশপত্র মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য রসিক লাল কুণ্ডু এবং একজন মণিপুরী অনুবাদকের উপর ভার দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজা কুলচন্দ্র সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ এবং অন্যান্য রাজভ্রাতা ও মন্ত্রীগণ রেসিডেন্সির বহির্দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্তও অনুবাদ কার্য্য শেষ না হওয়ায় তাঁহাদিগকে সেখানে দাঁড়া করাইয়া রাখা হইল। এইভাবে আধ-ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। একজন দেশীয় রাজ্যের নৃপতির পক্ষে তাঁহারই রাজ্যে অবস্থিত ইংরেজ কর্মচারীর বাড়ীর সম্মুখে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকা অত্যন্ত অমর্যাদাকর। চিফ কমিশনারের মত একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। সরকারী কর্মচারীদের এইরূপ অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যকর ব্যবহারে সাধারণ লোকের মনও বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক চরম অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়। মণিপুরেও মহারাজা এবং তাঁহার ভাইদিগকে এইভাবে বাহিরে দাঁড়া করাইয়া না রাখিলে বিনা রক্তপাতে ইংরেজ সরকারের কাজ হাসিল হইত এবং ইংরেজ

কর্মচারীদিগকেও নিজেদের কৃতকর্মের চরম ফল ভোগ করিতে হইত না।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের মন পূর্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল। রেসিডেন্সির বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকাকালে তিনি দরবার গৃহের চারিদিকে এবং অন্যত্র সশস্ত্র প্রহরীদের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। শুনা যায় কিছুদিন যাবৎ তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। সেইজন্য প্রখর রৌদ্রে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারায় আধ-ঘণ্টা পর তিনি নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। অঙোম্বা-ও তাঁহার অনুগমন করেন। মহারাজ এবং তাঁহার অপরাপর ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণ দুইঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকার পর রেসিডেন্সি গৃহে প্রবেশের অনুমতি পান। টিকেন্দ্র-জিৎকে না দেখিয়া গ্রীমউড সাহেব তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাকে সমস্ত কথা জানান হইলে তিনি সেনাপতিকে আসিবার জন্য খবর দিতে বলেন। তাহার কথামত আয়াপুরেল টিকেন্দ্রজিতের নিকট গেলেন। প্রায় ২॥০ টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন—টিকেন্দ্রজিতের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তাঁহার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। টিকেন্দ্রজিৎ অনুপস্থিত থাকায় সেদিন দরবার স্থগিত রাখিয়া মহারাজকে টিকেন্দ্রজিৎ এবং তাঁহার অন্যান্য ভাই এবং মন্ত্রীগণসহ পরদিন সকাল ৮ টার সময় আসিতে বলা হইল। গ্রীমউড সাহেব একথা বিশেষভাবে জানাইয়া দিলেন যে টিকেন্দ্রজিৎকে ছাড়া দরবার হইবে না এবং ভারত সরকারের নির্দেশও প্রকাশ করা হইবে না।

মহারাজা নিজে তাঁহার অন্যান্য ভাইগণের সহিত পর দিন দরবারে উপস্থিত হইবেন বলিয়া জানাইলেন; কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না; তবে তাঁহাকেও সঙ্গে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এইভাবে সমস্ত দিন নষ্ট করিয়া মহারাজা বেলা ৩ টার সময় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

গ্রীমউড সাহেব রসিকবাবুকে সঙ্গে লইয়া সেইদিন বেলা ৫ টার সময় এবং পরদিন (২৩ শে মার্চ, সোমবার) ভোরে আরও একবার টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। দরবারের জন্য নির্দিষ্ট সময়েও কেহ আসিলেন না। মহারাজা লিখিয়া পাঠাইলেন—"অসুস্থতা হেতু যুবরাজ (সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ) আসিতে অক্ষম; যুবরাজ ব্যতীত আমার যাওয়া বিফল বিবেচনায় আমিও আসিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া ভারত সরকারের নির্দেশ জানাইলে বাধিত হইব।" বেলা একটার সময় টিকেন্দ্রজিতের ভাবগতিক জানিবার জন্য রসিকবাবুকে পুনরায় পাঠান হইল। তিনি ৪ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। সেইদিন রাত্রে রেসিডেন্সিতে এক নাচে মহারাজা এবং তাঁহার ভাইগণ সকলেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু চিফ কমিশনার যখন বুঝিলেন টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহাদের কোন ফাঁদেই পা দিবেন না তখন মিঃ গ্রীমউড, লেঃ সিমসন এবং রসিকবাবুকে সঙ্গে লইয়া ভারত গভর্ণমেন্টের নির্দেশ পত্রসহ নিজেই রাজপ্রাসাদের দরবার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমুচিত অভ্যর্থনাদির পর তিনি মহারাজের হাতে নির্দেশপত্র দিলেন। পত্রের মর্মার্থ

ছিল—"ভারত গভর্ণমেণ্ট কুলচন্দ্রকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু দুর্ব্যবহারের নিমিত্ত টিকেন্দ্রজিৎকে নির্বাসিত করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বেই তাহাকে ইংরেজ কর্ম্মচারী হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।"

মহারাজা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"সকল মন্ত্রীর মত ব্যতীত তিনি যুবরাজকে বন্দী করিতে অক্ষম।" মহারাজের নিকট তাঁহার (টিকেন্দ্রজিতের) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা চাওয়া হইলে একই কারণে তিনি অসম্মত হন। তখন তাঁহাকে মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আধঘণ্টা সময় দিয়া চিফ কমিশনার পুনরায় রেসিডেন্সিতে চলিয়া গেলেন। মহারাজের জরুরী আহ্বানে সকলেই আসিয়া তাঁহার বিশেষ মন্ত্রণা কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজ কেরাণী বামনবাবু কর্তৃক সরকারী আদেশ পত্রের মর্মার্থ বুঝাইয়া দেওয়ার পর মহারাজা সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বাগ্রে উঠিয়া বলিলেন—"যদি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন তবে আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীগণ চিফ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়া ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। সেই অনুসারে মহারাজা চিফ কমিশনারকে লিখিলেন—"আমাকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করাতে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ এখন অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহার দেশত্যাগের কথা আপনাকে লিখিব।"

গ্রীমউড্ সাহেব রসিকবাবুর সঙ্গে তখনও দরবার গৃহে অপেক্ষা

করিতেছিলেন। তাহার নিকট সেই পত্র দেওয়া হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অবিলম্বে টিকেন্দ্রজিতের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিতে বলিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাকে এযাত্রা চিফ কমিশনারকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় খবর আসিল মহারাজের অনুরোধে টিকেন্দ্রজিৎ সওয়া পাঁচটার সময় গ্রীমউড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছেন। অনতিবিলম্বেই টিকেন্দ্রজিৎ ডুলিতে চড়িয়া দরবার গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রীমউড সাহেবেরও তখন তাঁহাকে দেখিয়া পীড়িত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে ভারত সরকারের ইচ্ছা অনুসারে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে খোলাখুলিভাবে বলিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ— মণিপুর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশের এইভাবে হস্তক্ষেপের অধিকার, কোথায় তাঁহার অপরাধ, ইত্যাদি নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এবং মণিপুরে তাঁহার জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ইংরেজ সরকারকে এই অনিষ্টকর কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। অবশেষে বলিলেন—যদি নিতান্তই তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হয় তবে মহারাজা এবং মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অনুসারে সুস্থ হওয়ার পর তিনি নিজেই যাইয়া ইংরেজের নিকট ধরা দিবেন। এইরূপ কথাবার্তার পর গ্রীমউড সাহেব রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসেন।

গ্রীমউড সাহেব চলিয়া আসার পর রেসিডেন্সী হইতে রাজপ্রাসাদে খবর দেওয়া হইল "কাল প্রাতে কমিশনার সাহেব রওয়ানা

হইবেন—তাঁহার জিনিষপত্র বহিবার জন্য কুলির দরকার।" ইহা দ্বারা বুঝানর চেষ্টা হইল পূর্বে যে চীফ কমিশনারের টামু যাইবার কথা বলা হইয়াছিল, ২৪শে তারিখ যেন তাহাই হইবে। এইভাবে বুদ্ধিমান টিকেন্দ্রজিতের চোখে ধুলা দেওয়া সম্ভব হইল না। চিফকমিশনারের আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই গোলযোগের আশঙ্কায় তাঁহার আদেশে রাজ্যের সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় রসদাদি রাজপ্রাসাদের ভিতরে মজুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। গ্রীমউড সাহেব গোপনে খবর পাইয়াছিলেন—টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীরের মধ্যে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন। সুতরাং বলপূর্বক তাঁহাকে গেপ্তার করিতে চেষ্টা করিলে যে প্রবল বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে একথা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। মণিপুরী সৈন্যগণ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবে এরূপ-গুজবও শোনা যাইতেছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইল। টিকেন্দ্রজিৎকে কৌশলে আপন মুঠার মধ্যে না পাওয়ায় কুইন্টন সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াই ছিলেন, তাহার উপর এইসব জনরব শুনিয়া তাহার আক্রোশের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। কোন দেশীয় লোক এইভাবে ইংরেজ কর্মচারীর আদেশ অমান্য করিয়া চলিবে ইহা তাহার কল্পনারও অতীত। তিনি অবিলম্বে সামরিক কর্মচারীদের এক গোপন বৈঠকে তাহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। তাহার সঙ্গে মাত্র ৪শত গুর্খা সৈন্য আসিয়াছিল, রেসিডেন্সির অধীনে সৈন্য সংখ্যাও একশতের কিছু কম ছিল; বলপ্রয়োগ করিতে

গেলেই মণিপুরের রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বাধা অনিবার্য, সুতরাং এই অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে কিনা প্রশ্ন উঠিলে—একজন অফিসার বলিলেন শিলচর হইতে যে ২ শত সৈন্য আসিতেছে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন কিন্তু কুইন্টন সাহেবের মনে ইংরেজ অফিসার কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যের ক্ষমতার উপর অবিচলিত আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল তাহাদের এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সম্মুখে শত শত মণিপুরী সৈন্য স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। কুইন্টন সাহেব কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া শেষরাত্রে টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী চড়াও করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিলেন।

রেসিডেন্সির মণিপুরী কর্ম্মচারীগণ বিপদের আশঙ্কায় কোন ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণের মধ্যে রসিকবাবুর বাসা ছিল; তিনি নিজে যাইতে না পারিলেও পরিবারস্থ লোকজনকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। রেসিডেন্সির ডাক্তার লক্ষ্মণপ্রসাদও তাহার পরিবার স্থানান্তরিত করেন। রাজকেরাণী বামন বাবু রাজপুরীর বহির্ভাগস্থ ঘেরার মধ্যে এক বাসায় বাস করিতেন। তিনিও যুদ্ধ অনিবার্য টের পাইয়া রাত্রি ১১ টার সময় স্থানান্তরে গমন করেন। ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া এবং গুপ্তচরের সাহায্যে প্রকৃত খবর সংগ্রহ করিয়া টিকেন্দ্রজিৎও তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ ও মণিপুরের মধ্যে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে একথা রাজ্যের মধ্যে কাহারও

অজানা রহিল না। আসন্ন প্রলয়ের পূর্বে চারিদিক থম থম করিতে লাগিল।

মণিপুরী সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই আশঙ্কায় সে রাত্রে রেসিডেন্সিতে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। ইংরেজের পক্ষের সৈন্যগণ রাত্রি প্রভাতের বহু পূর্বেই আদেশের অপেক্ষায় সজ্জিত হইয়া রহিল।

ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণ—

১৮৯১ সনের ২৪ শে মার্চ মঙ্গলবার রাত্রি ৩½ টার সময় লেঃ ব্র্যাকেনবারি, ক্যাপ্টেন বুচার ও লেঃ লুগার্ড গুর্খা সৈন্যের দ্বারা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। সেনাপতির গৃহরক্ষী সৈনিকগণ তাহাদিগকে বাধা দেওয়ায় উভয় দলের মধ্যে গুলি ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয়। রাজপ্রাসাদ হইতেও ইংরেজ পক্ষের উপর গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রাসাদটি পাঁচসারি প্রাচীর এবং তিনদিকে গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় সেখানে প্রবেশ করা তেমন সহজসাধ্য ছিলনা। প্রচুর বন্দুক এবং গোলাবারুদ ছাড়াও মহারাজার অধীনে ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৪ টি মাউন্টেনগান ছিল। কিছুক্ষণ অনবরত গুলি বর্ষণের পর সেনাপতির বাড়ীটি ইংরেজের হস্তগত হয়। টিকেন্দ্রজিৎ আগের দিন রাত্রেই সপরিবারে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা গেল না।

আক্রমণের প্রথম দিকেই লেঃ ব্র্যাকেনবারি গুরুতররূপে আহত হইয়া রেসিডেন্সির ভিতরে হাসপাতালে নীত হন। সেই

দিনই মধ্য রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়। সেনাপতির বাড়ী দখলে আসিলেও যুদ্ধ থামিল না; বরংচ' মণিপুরীদের জেদ আরও বাড়িয়া গেল। বেলা ১২ টার সময় মিঃ কুইন্টন টেলিগ্রাফ অফিসে যাইয়া খবর পান তার কাটিয়া ফেলায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণিপুরের সমস্ত থানায় খবর চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং রেসিডেন্সী হইতে ভারত সরকারের নিকট খবর দেওয়ার কোন উপায়ই রহিল না। এদিকে ইংরেজ পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ফুরাইয়া আসিতেছে। রসিকবাবু বেগতিক দেখিয়া ইরেংবমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১১ টার পর হইতে পার্শ্ববর্তী বস্তি হইতে রেসিডেন্সির উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। ক্যাপ্টেন বইলো কয়েকজন সৈন্য সহ সেখানে যাইয়া—বস্তিগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লাভ হইল না। সূর্য যতই পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতে লাগিল—রেসিডেন্সির উপর আক্রমণের তীব্রতাও ততই বাড়িতে লাগিল। ৪½ টার সময় সেনাপতির বাড়ী হইতে সমস্ত সৈন্য উঠাইয়া আনিয়া রেসিডেন্সি রক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। মিঃ কুইন্টন, কর্ণেল স্কীনে ও মিঃ গ্রীমউড আহত দিগকে সঙ্গে লইয়া মাটির নীচে সুরক্ষিত কুঠরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত রেসিডেন্সিতে ইহাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করার দুরাশা ত্যাগ করিয়া তখন আত্মরক্ষার সমস্যাই বড় হইয়া দেখা দেয়। গ্রীমউড সাহেব কাছাড়ে পলাইয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মিঃ কুইন্টনের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ থামাইয়া

মহারাজার সঙ্গে আপোষের আলোচনা আরম্ভ করা স্থির করিলেন। ইংরেজ পক্ষ হইতে যুদ্ধ বিরতির সঙ্কেত ঘোষিত হইল। টিকেন্দ্র-জিতের নির্দেশে মণিপুরীগণও যুদ্ধ বন্ধ করিল। মিঃ কুইন্টন মহারাজের নিকট চিঠিতে জানাইলেন "আপনি কি সর্তে আমাদের উপর আক্রমণ বন্ধ করিবেন এবং টেলিগ্রাফের তার মেরামত করিতে দিয়া গভর্ণর জেনারেলের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে দিবেন?" (বঙ্গানুবাদ)। তদুত্তরে মহারাজ বাংলাতে লিখেন......"আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না কিন্তু আপনাদের পক্ষীয় সৈন্যেরা, সর্বাগ্রে আক্রমণ করায় আমার লোকেরা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমার প্রাসাদে উপস্থিত কেহই নাই যে ইংরেজী ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে। কিন্তু সমর স্থগিতের পরেই আপনার পত্র পাইয়া আমি বুঝিতেছি, যে আপনি সন্ধি করিতে চাহেন। আপনাদের সৈন্য সামন্তেরা যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তবে একমুহূর্ত মধ্যেই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি।"

আগের দিন রাত্রে সপরিবারে বামাচরণ বাবুর স্থানান্তরে গমনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রাত্রি ৯½ টার সময় তাঁহাকে আনাইয়া সেই চিঠির তর্জমা করান হয়। বামাচরণ বাবু কিছুক্ষণ পর আরও একখানি পত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন; তাহার মর্ম এইরূপ ছিল—"আমরা বিষম ফাঁদে পড়িয়াছি তাহারা আমাদের বন্দুকাদি চাহিতেছে।" এই কথাগুলি একটুকরা কাগজে, পেন্সিলে লেখা—শিরোনাম ও দস্তখত না থাকায়, কে কাহাকে লিখিতেছে

বুঝা যায় না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়—মহারাজের পত্র পাওয়ার পর ইংরাজ কর্মচারীগণ উহা লিখিয়া সেকমাইএর তার আফিসে উইলিয়ামস্ সাহেবের নিকট পাঠাইতেছিলেন। তাহা পাইলে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট খবর দিতে পারিতেন। কিন্তু সেখানি মণিপুরীদের হাতে পড়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধই হইল না উপরন্তু ইংরেজ পক্ষের দুর্বলতা মণিপুরীদের নিকট আরও বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। মহারাজের পত্র পাওয়ার পর মিঃ কুইণ্টন অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মহারাজও টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সাক্ষাতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ার পর মিঃ কুইণ্টন, কর্ণেল স্কীনে, মিঃ গ্রীমউড, লেঃ সিমসন ও মিঃ কসিন্স এই পাঁচজন ইংরেজ কর্মচারী একজন সিপাহী সহ রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন।

শোচনীয় হত্যাকাণ্ড—দরবার গৃহটি তখন বন্ধ থাকায় কেল্লার ভিতর প্রাঙ্গণে সভা বসিল। কিছুদূরে বিস্তর মণিপুরী সৈন্য এবং সাধারণ প্রজা নানারূপ কাণাঘুষা করিতেছিল। দরবারের ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল নানারূপ কথাবার্তা হইল। টিকেন্দ্রজিৎ অস্ত্র ত্যাগের কথাই বার বার জোর দিয়া বলেন। অবশেষে কাল প্রাতে পুনরায় আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সাহেবগণ রেসিডেন্সিতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎও তোপখানার দিকে চলিলেন। অমনি চারিদিকে গোলমাল আরম্ভ হইয়া

গেল। গ্রীমউড সাহেব তাহাদিগকে নিরাপদে রেসিডেন্সিতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রী অ'ঙৌস্নাকে অনুরোধ করিলেন। অঙৌস্না টিকেন্দ্রজিতের অনুমতিক্রমে সাহেবদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। যেই মাত্র তাহারা ফটকের মধ্য দিয়া বাহির হইলেন অমনি বিক্ষুব্ধ জনতা মার মার কাট কাট শব্দে সাহেবদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। লেঃ সিমসন মস্তকে তরবারির কঠিন আঘাতে আহত হন। মহারাজের জমাদার যাত্রাসিং আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে। অঙৌস্না তখন তাহাদিগকে দরবার গৃহের দিকে লইয়া চলেন। দরবার গৃহের ধাপের নীচে একজন মণিপুরীর বর্শার আঘাতে গ্রীমউড সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যাত্রাসিং সাহেবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দরবার গৃহের বন্ধ দরজা জোরে ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া ফেলে। এদিকে ভয়ানক গোলমালের শব্দ শুনিয়া টিকেন্দ্রজিৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া মন্ত্রী অঙৌস্নার উপর অবশিষ্ট সাহেবদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য আদেশ দেন। সেই অনুসারে ৮। ১০ জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দরবার গৃহে রাখা হইল।

বৃদ্ধমন্ত্রী থাঙ্গাল জেনারেলও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে তিনি তোপখানায় চলিয়া যান। সেখানে একজন পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ মণিপুরী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সাহেব-দিগকে হত্যা করিতে বলে। বহুকাল যাবৎ মণিপুরীগণ আপ্তবাক্য স্বরূপ শুনিয়া আসিতেছে "মণিপুরে বিষম যুদ্ধ বাধিবে সে সময়

৫ জন শত্রুর শোণিত দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং তাহাদের পঞ্চমুণ্ড একত্রে একটি খাদে প্রোথিত করিতে না পারিলে কিছুতেই মঙ্গল হইবে না।” বৃদ্ধের কথা শুনিয়া থাঙ্গাল জেনারেল ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ইংরেজ কর্মচারীদের আচরণে তিনি পূর্ব হইতেই তাহাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তখন এইভাবে বার বার প্ররোচিত হওয়ায় তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উসব নামক জমাদারকে সাহেবদিগকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। উসব কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া যাত্রাসিংকে সঙ্গে লইয়া যুবরাজের নিকট যাইয়া এই আদেশের কথা জানাইল। যুবরাজ ইহা শুনিয়া তখনই তোপখানায় আসিয়া থাঙ্গাল জেনারেলকে এইরূপ জঘন্য কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক হয়। শুনা যায় অসুস্থ অবস্থায় সমস্ত দিন টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রিও তখন কম হয় নাই। থাঙ্গাল জেনারেলের সঙ্গে তর্কবিতর্কের অব্যবহিত পরেই তিনি তোপখানার মধ্যে নিদ্রা যান। এই সুযোগে থাঙ্গাল জেনারেল য়েঙ্খোইবা নামক সর্দার চাপরাশিকে ডাকিয়া সাহেবদিগকে ঘাতক হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য যুবরাজের (টিকেন্দ্রজিতের) আদেশ হইয়াছে এইরূপ বলিলেন। যুবরাজ তখন সেই গৃহেই নিদ্রিত ছিলেন; সুতরাং সে থাঙ্গাল জেনারেলের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজকীয় ঘাতককে ডাকাইয়া আনাইয়া সাহেবদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাহার নিকট সমর্পণ করিল। সাহেবদের সঙ্গে একজন সিপাহী

বাদক গুর্খা সিপাহীও ছিল, সেও রেহাই পাইল না। তাহাদের সকলের মস্তক ছেদ করিয়া একটি খাদে প্রোথিত করা হইল। এইভাবে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ মণিপুরীগণ পরম আহ্লাদিত হইল।

রেসিডেন্সি পরিত্যাগ ও কাছাড়ে পলায়ন মিঃ কুইন্টন প্রভৃতি অনেকক্ষণ পূর্বে রাজবাড়ীতে গিয়াছেন; এদিকে রাত্রি ১২টা বাজিয়া যায় কিন্তু তখন পর্যন্তও রেসিডেন্সিতে তাহাদের সম্বন্ধে কোন খবর আসিয়া পৌছিল না। ১২টার সময় রাজবাটি হইতে একজন উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল—"চিফ কমিশনার ও তাহার সঙ্গীগণ আর ফিরবেন না।" সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় বন্দুকের আওয়াজ আরম্ভ হইয়া গেল। রেসিডেন্সিতে সকলেই মনে করিল চিফ কমিশনার প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে; অতএব সন্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই। অবিরত প্রচণ্ড গুলি বর্ষণে রেসিডেন্সির বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রেসিডেন্সিতে থাকিয়া আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া গ্রীমউড পত্নী, ক্যাপ্টেন বইলো. ক্যাপ্টেন বুচার, লেঃ লুগার্ড ও মিঃ উডস্ দুইশত গুর্খাসৈন্য সহ গোপনে রেসিডেন্সি ত্যাগ করিয়া কাছাড়ের পথে রওয়ানা হইলেন। মণিপুরীগণ ইচ্ছা করিয়াই হউক অথবা পলায়নের খবর না পাওয়াতেই হউক—তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করে নাই। তাহাদের পলায়নের পর রেসিডেন্সি হইতে কোনরূপ বাধা না পাওয়ায় মণিপুরীগণ সেখানে ঢুকিয়া যাবতীয় জিনিষপত্র লুটপাট করিয়া গৃহে আগুন ধরাইয়া দিল।

পলায়নরত ইংরেজ পক্ষায় অফিসার ও সৈন্যগণ দিবারাত্র পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব সন্তর্পণে কাছাড় অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল ; স্থানে স্থানে মণিপুরীগণও তাহাদিগকে যথাসম্ভব নাজেহাল করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু নাগারা ইংরেজ পক্ষের সহায়তা না করিলেও নিরপেক্ষ ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিফকমিশনারের মণিপুরে আগমন উপলক্ষে কাছাড় হইতে ক্যাপ্টেন কাউলের অধীনে দুইশত গুর্খা সৈন্য আনার কথা ছিল। পলায়নরত ইংরেজ পক্ষ তাহাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় অনবরত পথ চলিতে লাগিল। ২৬শে তারিখ দ্বিপ্রহরে লাইমাতন পাহাড়ে সেই সৈন্যদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ৩১শে মার্চ সকলে জিরিনদী পার হইয়া ইংরেজ রাজ্যে প্রবেশ করে।

২৩শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্সি হইতে কোন খবর না পাওয়ায়, এবং মণিপুর হইতে কোহিমায় আগত ব্রিটিশ রাজ্যের ব্যবসায়ীদের নিকট নানা গুজব শুনিয়া ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িল। গ্রীমউড পত্নী এবং তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতেই সরকার প্রথম নির্ভরযোগ্য খবর পায়—মণিপুর সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে চিফকমিশনার ও পলিটিক্যাল এজেন্ট সহ পাঁচজন ইংরেজ কর্মচারী বন্দী হইয়াছেন। তখন পর্যন্তও বহির্জগতে তাহাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছায় নাই। ভারত গভর্ণমেণ্ট অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মণিপুরের

বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানর জন্য নানা স্থান হইতে কাছাড়, কোহিমা এবং টামুতে প্রচুর সৈন্য আমদানি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মণিপুরে লাংথাবাল নামক স্থানে অবস্থিত জমাদার বীরবল নাগরকোটির অধীন কতিপয় গুর্খা সৈন্য (43rd Light Infantry) সাহেবদের সঙ্গে না যাইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পথিমধ্যে কয়েকটি থানা পুড়াইয়া টামুতে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে তখন লেঃ গ্র্যান্টের অধীনে ইংরেজ পক্ষের কিছু সৈন্য ছিল। তিনি ইংরেজ পক্ষের পরাজয় এবং সাহেবদের নিহত হওয়ার খবর শুনিয়া গ্রীমউড পত্নী এবং অন্যান্য সাহেবদের পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য ৬০ জন সৈন্য সহ ২৮ শে মার্চ মণিপুরের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা তিনি থোবাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রায় দেড় হাজার মণিপুরী সৈন্যের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সহিত ক্রমাগত ৮ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে কর্ণেল প্রেসগ্রেভের (Presgrave) নির্দেশে তিনি ৮ই এপ্রিল পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করেন। ফেরার পথে পালেল নামক স্থানে ৩।৪ শত মণিপুরী সৈন্যের সঙ্গে তাহাদের আরও একটি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তখন প্রেসগ্রেভের বাহিনীও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় মণিপুরীগণ পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে মণিপুরের মহারাজের নিকট হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট খবর আসে মিঃ কুইন্টন প্রভৃতি পাঁচজন সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। শুনা যায় জাঙ্গাল জেনারেলের পরামর্শ

অনুযায়ী এইরূপ সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পরই আবার খবর আসে—তাঁহার অজান্তে যুবরাজের আদেশে ইংরেজ বন্দীগণ নিহত হইয়াছেন (The Regent had sent a letter saying that the prisoners had been killed. I believe he stated they had fallen in the fight at first, but afterwards contradicted himself, and said they had been murdered by his brother, the Jubaraj, without his knowledge or consent—Mrs. Grimwood)। ইংরেজ পক্ষীয় লোকজন রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, পরদিন সকালে ব্যবসায়ী জানকানাথ বসাক, রসিকবাবু এবং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত অপরাপর বিদেশী কর্মচারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। টিকেন্দ্রজিৎ কয়েকদিন পরই তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

ব্রিটিশ সৈন্যের মণিপুর অভিযান—

ব্রিটিশ পক্ষের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে কোহিমা, কাছার ও টামু এই তিন দিক হ'তে তিন দলে প্রায় ৭।৮ হাজার সৈন্য মণিপুরের দিকে রওয়ানা হইল। কোহিমা হইতে মণিপুরের রাজধানি ইম্ফালের দূরত্ব ১০৫ মাইল, টামু হইতে ৫০।৬০ মাইল, কাছাড় হইতেও প্রায় ৭০।৮০ মাইল হইবে। মেজর কলেট এই বাহিনী ত্রয়ের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে ছিলেন নবনিযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ মেকেব। মেজর কলেট ২৫শে এপ্রিল সদলে কোহিমা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মণিপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং ব্রিটিশের ব্যাপক সমরায়োজনের কথা শুনিয়া কাছাড়ের ৩০।৩৫ হাজার মণিপুরী মণিপুরের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। শ্রীহট্ট, ঢাকা, শিলং, গোলাঘাট ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও প্রবাসী মণিপুরীদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নানা কৌশলে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। ব্রিটিশ পক্ষের এই সমস্ত আয়োজনের কথা মণিপুরেও রাষ্ট্র হইয়াছিল। মেজর কলেট মণিপুরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মহারাজ কুলচন্দ্রকে এক চিঠিতে জানাইয়াছিলেন—"এখনও যদি দুর্মতি ছাড়িয়া থাকে, তবে আর যুদ্ধ বিগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। আমাদের শরণাগত হইলে, আপনার অপরাধের বিচার হইবে, তাহাতে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে কিনা জানিনা। কিন্তু প্রতিকূলতা করিলে, নিশ্চিতই আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।" (বঙ্গানুবাদ)।

মেজর কলেট তাহার সসৈন্য বাহিনী সহ বিনা বাধায় মণিপুরে প্রবেশ করিয়া রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে মহারাজা এক চিঠিতে তাহাকে জানাইলেন—"ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না এবং এখনও নাই। আর আপনাদের গতিরোধ করিতে পারি এমন শক্তিও আমার নাই। ইংরাজ রাজের সহিত পূর্বাপর আমাদের মিত্রতা ও সদ্ভাব ছিল। অকস্মাৎ তাহা নষ্ট হওয়ায় আমি মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছি। এই সকল কারণে আমি এখন রাজধানী ছাড়িয়া চলিলাম। পরে যদি সন্ধি স্থাপনের সুবিধা দেখি অবশ্যই আবার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" (বঙ্গানুবাদ)।

কাছাড় হইতে ব্রিটিশ বাহিনী ২৩শে এপ্রিল বিষ্ণুপুরের নিকট পৌঁছিলে তাহাদের সঙ্গে মণিপুরী সৈন্যর সামান্য সংঘর্ষ হয়। ২৫শে তারিখ টামুর সৈন্যদল পালেল পৌঁছিলে মণিপুরী সৈন্য তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেয়। সেই যুদ্ধে লেঃ গ্র্যান্ট স্বয়ং আহত হন। অবশ্য ইংরেজ পক্ষই শেষে জয়লাভ করে। তাহারা তখন সেখান হইতে থৌবাল পৌঁছায়। এইভাবে একসঙ্গে তিন দিক হইতে আক্রমণ করিয়া মেজর কলেট ২৭শে এপ্রিল রাজধানী ইম্ফালে প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ পতাকা উড়ায়। রাজধানী পতনের পূর্বেই মহারাজা, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকলেই সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন। সাধারণ লোকও প্রাণভয়ে যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল। মেজর কলেট রাজপ্রাসাদে নিজের ক্যাম্প স্থাপন করিয়া রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন—"মহারাজ কুলচন্দ্রের রাজত্বকাল ফুরাইয়াছে। এখন ইংরাজ গভর্ণমেন্ট মণিপুরের রাজ স্থানায়। যে-কেহ ইংরাজের কোনরূপ প্রতিকূলতা বা কুলচন্দ্র, টিকেন্দ্রজিৎ বা থাঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতির পোষকতা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর যে ব্যক্তি মহারাজ যুবরাজ প্রভৃতিকে ধরিয়া দিতে পারিবে, সে নিম্নলিখিত হারে পুরস্কার পাইবে। মহারাজ ও যুবরাজ প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করিয়া; থাঙ্গাল জেনারেলের জন্য ২ হাজার; সুবেদার নিরঞ্জন সিং প্রভৃতির জন্য ১ হাজার টাকা হিসাবে। (বঙ্গানুবাদ)।

রেসিডেন্সি হইতে ইংরেজদের পলায়নের পর মণিপুরীগণ প্রতিহিংসাবশে সেখানকার সমাধিগুলি অপবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল।

ক্রমে কুইণ্টন প্রভৃতি সাহেবদেব মৃতদেহ উদ্ধার করা হইল। এই সমস্ত দেখিয়া ইংরেজ অফিসারদের রক্ত আরও গরম হইয়া উঠে—কিন্তু শত্রুপক্ষ হইতে কোনরূপ বাধা না পাওয়ায় ইচ্ছামত গায়ের ঝাল মিটান গেল না। এদিকে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে তথাপি মণিপুরীদিগকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া জেনারেল কলেট পুনরায় ঘোষণা করিলেন—"আমরা সকলকেই অভয় দিতেছি—সকলে আসিয়া নিজ নিজ গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করুক। কেবল যাহারা গ্রীমউড প্রভৃতির হত্যায়, রেসিডেন্সি দাহ ও লুণ্ঠনে বা ইংরেজ সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করণ কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাহাদেরই অপরাধের বিচার ও যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান হইবে। অন্য কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।" এইরূপ আশ্বাস পাইয়া ক্রমে সকলেই ফিরিয়া আসিল। ইহার পর আরেক ঘোষণায় ৭ দিনের মধ্যে সকলকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজের নিকট অর্পণ করিতে বলা হয়।

এদিকে সকলের আগে থাঙ্গাল জেনারেল ধরা পড়িলেন। মহারাজ কুলচন্দ্র চাব দকুকিদের গ্রামে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিলেন। জনৈক বিশ্বাসঘাতক মণিপুরী ইংরেজের নিকট তাঁহার সন্ধান বলিয়া দেয়। তিনি তখন তাহাদের হস্তে ধরা পড়িয়া রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। ক্রমে নিরঞ্জন সিং, কাজেয় সিং, অঙোম্মা প্রভৃতি সকলেই একে একে ধরা পড়িলেন। টিকেন্দ্রজিতের তখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি রাজধানীর অতি নিকটেই আত্মগোপন করিয়া ইংরেজের কার্যকলাপ লক্ষ করিতেছিলেন।

অবশেষে আতঙজান নামক গ্রামে বলরাম সিং নামক একজন মণিপুরী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। সেখানে দুই একদিন থাকার পর তিনি ইংরেজের নিকট স্বেচ্ছায় ধরা দেন।

অপরাধীদের বিচার :—টিকেন্দ্রজিতের গ্রেপ্তারের পর মণিপুরে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে অপরাধীদের বিচার আরম্ভ হয়। টিকেন্দ্রজিৎকেই সকল অনর্থের মূল সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে—

১। ভারত সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ,
২। চারিজন ব্রিটিশ কর্মচারীর হত্যায় সহায়তা,
৩। নরহত্যা,

এই তিনটি অভিযোগ আনা হয় অন্যান্যগণও অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ইংরেজ পক্ষে ৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়; তাহাদের মধ্যে ১০ জন মণিপুরী সহ চিফ-কমিশনারের সঙ্গী দুইজন ইংরেজ সৈনিক কর্মচারী, একজন গুর্খা সিপাহী, বাবু রসিকলাল কুণ্ডু এবং রাজকেরাণী রামচরণ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। টিকেন্দ্রজিতের পক্ষে পাঁচজন মণিপুরী সাক্ষ্য দেয়। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতের নিকট কাছাড় হইতে উকিল আনাইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। [illegible] মত তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া বলেন—যে, "মণিপুরে যদি কাহাকেও পাওয়া যায়, তবে তাহাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা।" মণিপুরে তখন জানকীনাথ নামক ও রামচরণ বাবু [illegible]

কাজের জন্য অন্য কোন ইংরাজীতে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় নাই। বিচার আরম্ভ হওয়ার দুইদিন পর যুবরাজের ইচ্ছানুসারে ব্যবসায়ী জানকীনাথ বসাক তাঁহার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। জানকী বাবুর আইন শাস্ত্র পড়া ছিল না এবং তিনি কোন কালে আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন —"আমি ব্যবসাদার।......উকিল নহি এবং কিরূপে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে হয়, তাহার কিছুই জানি না। ইংরেজী লিখিতে ও পড়িতে জানি, কিন্তু ভাল ভাষা বোধ নাই। মণিপুরে দুই বৎসর থাকায়, মণিপুরী ভাষা কতক শিখিয়াছি। বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা উর্দুও জানি।"

টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে যে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয় নাই এসম্বন্ধে আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। জানকী বাবু তাহার এফিডেবিটে বলেন--"মণিপুরী সাক্ষীরা যাহা জানিত, তাহা দুইতিন মিনিট, কখনও বা আরও অধিকক্ষণ ধরিয়া বলিবার পর, পার্থসিংহ মণিপুরী কথার ভাব উর্দুতে বলিত, এবং সরকার পক্ষের তদ্বিরকারী মেজর মেক্সওয়েল, তাহা পুনরায় ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া আদালতকে বুঝাইতেন, মণিপুরে বিশেষ আদালতে এইরূপে সাক্ষির এজেহার লওয়া হইয়াছিল, উহাতে সময়ে সময়ে বড় গোলযোগ হইয়াছিল, পার্থসিংহের তর্জমা যে ঠিক হইতেছে না একথা আমি অনেকবার আদালতকে জানাইয়াছিলাম এবং বিচারকদের মধ্যে একজন (মেজর রিজওয়ে) অনেকবার তাহার ভুল ধরিয়াছিলেন।" কিন্তু এইরূপ ভুল তর্জমার উপর নির্ভর করিয়াই

মণিপুরের বিশেষ বিচারালয় টিকেন্দ্রজিৎ, থাঙ্গাল মেজর, কুলচন্দ্র এবং অঙৌস্নাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়।

উপরোক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেলের নিকট আপীল করা হয়। কিন্তু এই আপীলের সময় লিখিত বিবরণ ভিন্ন প্রকাশ্য বিচারালয়ে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া সওয়াল করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক মণিপুরের পক্ষে ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ দরখাস্ত লিখিয়া-গভর্ণর জেনারেলের নিকট পেশ করেন। ইহাতে তিনি উপরোক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি দেখান—"মণিপুরের মহারাজ, যুবরাজ প্রভৃতি ইংরাজের প্রজা নহেন—সুতরাং কোনরূপ ব্রিটিশ আদালতেই তঁাহাদের বিচার হইতে পারে না, মণিপুরে যেরূপ বিশেষ আদালতে তাঁহাদের প্রথম বিচার হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের বা ব্রিটিশ ভারতের আইন সভার কোন বিধান মতে স্থাপিত হয় নাই। সেটি কেবল বিজয়ী গভর্ণমেন্টের হুকুমানুসারে বিজিতদের অপরাধের বিচারের জন্য নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধিকন্তু যে গভর্ণমেন্ট অভিযোক্তা, সেই অভিযোক্তার কর্ম্মচারীরাই প্রথম বিচারক এবং এক্ষনে সেই গভর্ণমেন্টই আপীলের আদালত।" টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার দরখাস্তে জানাইয়াছিলেন তিনি অথবা মণিপুর সংকার সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন নাই অথবা এইরূপ করার কোন ইচ্ছাও পোষণ করেন নাই। ইংরেজপক্ষের সৈন্য যখন হঠাৎ তাহার বাড়ী আক্রমণ করিয়া সেখানকার বিগ্রহাদি নষ্ট এবং অপবিত্র করেন তখন বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার পক্ষের সৈন্যগণ অস্ত্র-ধারণ করে।

ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যার ব্যাপারেও টিকেন্দ্রজিতের অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই।

টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সরকার পক্ষ হইতে মৃত্যুদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তদানীন্তন ভাইসরয় কর্তৃক সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে এক পত্রে (২৮ সে মে, ১৮৯১ জানাইয়াছিলেন—"ব্রিটিশ রাজত্ব সুদৃঢ় রূপে ও নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য এই কথা যাবতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রজা সকলকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক যে, সেই রাজ্যের যে কোন কর্তৃপক্ষের হুকুমানুসারেই হউক না কেন, যদি তাহারা ব্রিটিশ কর্মচারীদিগকে হত্যা বা হত্যার সহায়তা করে, তবে তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে।" সুতরাং বিশেষ বিচারালয়ে টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির বিচারের ব্যাপারটি যে একটি প্রহসন মাত্র ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আপীল শুনানীর পর গভর্ণর জেনারেল টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল জেনারেলের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখিয়া কুলচন্দ্র এবং আঙৌম্বা কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

১৩ ই অগষ্ট, ১৮৯১ সন, ইম্ফালের পলো খেলার মাঠে পাশাপাশি দুইটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করা হয়। টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল জেনারেল কে সেই দিন ফাঁসি দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ঠাক হইয়া যায়, মণিপুরের প্রথা অনুসারে কোন প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত লোকের প্রাণ ভিক্ষার জন্য যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক মেয়ে লোক রাজার নিকট আবেদন জানাইত তবে সেই দণ্ড রহিত

হইয়া যাইত। অপরাহ্ণের দিকে যখন ফাঁসির জন্য টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল জেনারেলকে কড়া পাহারধীন ফাঁসির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আনা হইল তখন চারিদিকে সহস্র সহস্র মেয়েলোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তাহারা হয়ত ভাবিয়াছিল মণিপুরের প্রথা অনুসারে তাহাদের প্রিয় টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসির মকুব হইয়া যাইবে। কিন্তু মণিপুরের স্বাধীনতা রবি অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। নির্দয় আমলা তন্ত্রর নিকট পুরাতন প্রথা অচল। টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসি হইয়া গেল। সহস্র সহস্র মেয়েলোকের বুক ফাঁটা আর্তনাদে মাতা বসুন্ধরাও বুঝিবা বিচলিত হইয়া ছিলেন কিন্তু ইংরেজের চিত্তকে তাহা স্পর্শও করিলনা।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বিচার ও ফাঁসির ব্যাপারে বাংলা দেশের সংবাদ পত্রগুলি মণিপুরের পক্ষ সমর্থন করিয়া তখন তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছিল। মুকুন্দ লাল চৌধুরী এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তখন, বাংলায় 'মণিপুরের ইতিহাস' লিখিয়া ফেলেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বিসর্জন করিয়া ভারতের অন্যতম সহীদ রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের চেষ্টায় বর্তমানে ভারতের লোকসভা গৃহে ভারতের আন্যান্য শ্রেষ্ঠ বীরদের প্রতিকৃতির পার্শ্বে মণিপুরের বীর টিকেন্দ্রজিতের প্রতিকৃতিও স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

পনর

মহারাজ চূড়াচাঁদ সিং

১৮৯১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের সেক্রেটারী এইচ এম-ডুরাণ্ডে'র ঘোষণা অনুযায়ী মহারাজা গম্ভীর সিংহের বিশ্বস্ত সেনাপতি ও প্রাক্তন মহারাজা নরসিংহের বংশধর চূড়াচাঁদ সিংকে যখন মণিপুরের সিংহাসনে বসান হয় তখন তিনি নিতান্ত নাবালক, তাঁহার সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মণিপুরকে একজন ইংরেজ শাসন কর্তার অধীনে রাখা স্থির হইল। ফলে রাজা চূড়াচাঁদের আমল হইতে মণিপুরের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তখন হইতে অন্যান্য ভারতীয় সামন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে মণিপুরের আর কোন বিষয়ে কোন প্রভেদ রহিল না। বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মণিপুর রাষ্ট্রের উপর ইংরেজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মণিপুরীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিত না। অন্যদিকে প্রবলতর শক্তির আশ্রয়ে থাকায় নরপতি চূড়াচাঁদ রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিয়া ধর্ম এবং নানা প্রজাহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ির আর কোন সুযোগ না থাকায় প্রজাগণ এইসব অহেতুক দলাদলি এবং রক্তপাত হইতে রেহাই পাইল।

প্রাপ্ত বয়সে মহারাজ চূড়াচাঁদ সিং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও গোড়ার দিকে দেখা যায় তাঁহার মনোনয়ন অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। বিশেষত যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল

তাহারা পরোক্ষভাবে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিরও চেষ্টা করিয়াছিল। ভারত সরকারের নিকট পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৮৯৫-৯৬ সনের বিবরণে দেখা যায় মণিপুরের প্রথা অনুযায়ী চূড়াচাঁদ সিং সিংহাসনে আরোহণের পর ৺গোবিন্দজীব মন্দিরেরও সেবায়েৎ নিযুক্ত হইলেন। সেই সঙ্গে বংশ পরাম্পরাক্রমে ৺গোবিন্দজীর পূজারী পুরাতন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় 'আরিবাগণও পদচ্যুত হইলেন এবং তাহাদের স্থলে নূতন রাজবংশের পুরোহিত সম্প্রদায় আনৌবা' দিগকে নিযুক্ত করা হইল। আরিবাগণ সংখ্যায় বেশী ছিলেন এবং মণিপুরী সমাজের উপর আনৌবাদের চেয়ে তাহাদের প্রভাব ছিল সুগভীর। সেইজন্য আরিবা'দের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে ইম্ফাল হইতে গ্রামে গ্রামে 'অনৌবা পুরোহিত পাঠান হইল। মণিপুরের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সুদৃঢ; জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন, বিবাহ, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি সমস্ত কর্মেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ফলে তখন এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মে কোন্ পুরোহিতকে ডাকা হইবে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য দেখা দিতে লাগিল। রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেও 'অরিবা' গণ সমাজের উপর তাহাদের প্রতিপত্তি সহজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না। সমাজের মধ্যে এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব সে সময়ে সকলেরই যথেষ্ট অশান্তি এবং দুর্ভোগের কারণ হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এই 'আরিবা আনৌবা' বিরোধ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

ইংরেজ সরকার ভারতীয় রাজন্যবর্গদের বংশধরদিগকে ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য আজমীরে মেয়ো (Mayo) কলেজ নামক একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। বালক চূড়াচাঁদকেও শিক্ষালাভের জন্য সেই বিদ্যালয়ে পাঠান হইল। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাতেই চূড়াচাঁদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি নানাবিধ খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ইম্পিরিয়্যাল ক্যাডেট কোরেও (Imperial Cadet Crops.) ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৯০৬ সনে ধনমঞ্জুরী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইষ্ট বেঙ্গল এবং আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ল্যান্সেলট হেয়ার (Sir Lancelot Hare) সাহেবের উপস্থিতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। ইতিমধ্যে ১৯০১ সনে লর্ড কার্জন (Lord Curzon) এবং ১৯০৪ সনে লর্ড কিচনার (Lord Kichner) মণিপুর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের পর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজার সভাপতিত্বে একটি দরবার গঠিত হয়। দরবারে ৬ জন মণিপুরী সাধারণ সভ্য এবং ইংরেজ আই-সি-এস (I C. S.) কর্মচারী উপ-সভাপতি (Vice president) পদে মনোনীত হইলেন। ১৯১৬ সনে মহারাজ দরবারের কার্যকলাপ পরিদর্শনের ভার (Supervisory Control) গ্রহন করায় উপ-সভাপতির পদ তুলিয়া দিয়া আই-সি-এস কর্মচারীকেই সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ানি এবং

ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের উপর।

মণিপুরকে হাতে পাওয়ায় উত্তর পূর্ব অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে শান্তি এবং বৃটিশের প্রাধান্য বজায় রাখার কাজে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। ১৯০৫ হইতে ১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মণিপুরের বাহিনী মণিপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন কার্যে বহুবার ভারত সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৯১১ সনে আবর (Abor Expedition) ও মাকুয়ার (Makware Expedition) অভিযান, ১৯১২ সনে মিসমী অভিযান (Mishmi Expedition) ১৯১৫ সনে সদিয়া ও পাসিঘাট (Sadia and Pasighat) অভিযান এবং অবশেষে ১৯২১-২১ সনে হাইলাকান্দিতে চা-বাগানের কুলিদের হাঙ্গামা ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (A. B. Rly) ধর্মঘটের সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষে মণিপুরী বাহিনী যথেষ্ট কাজে আসিয়াছিল।

১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মণিপুর সরকার ভারত সরকারের অনুরোধে যুদ্ধের তহবিলে চাঁদাবাবদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা দান করে এবং প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ঋণস্বরূপ দেয়। পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্ণেল এইচ. ডব্লিউ, জি, কোল সি, এস, আই, (Colonel H. W. G. Cole C. S. I. কর্তৃক পরিচালিত দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী (Labour Corps) মণিপুর হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়াছিল।

যুদ্ধের পর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মণিপুরের খাজনা ১০ বৎসর পর্যন্ত

বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা করিয়া মকুব করিয়া দেয়। ভারত সরকার নিজ ব্যয়ে ইম্ফাল হইতে কোহিমা পর্যন্ত গাড়ী চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা তৈরী করিয়া দেয়। ১৯১৭ সনে রাজা চুড়াচাঁদ সিংকে সি, বি,, ই (C. B. E.) উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। অতঃপর ১৯১৮ সনে ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ড সাহেব Chelmsford তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন।

মণিপুর সরকার যখন যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত তখন হঠাৎ ১৯১৭ সনে মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলের থাদকুকি সম্প্রদায় চিংভাথম সানাচাওবা সিং নামক একজন মণিপুরীর প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মহারাজা তাঁহার নাগা ও মণিপুরী বাহিনী লইয়া স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্রা করেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য নানাস্থানে ক্যাম্প স্থাপন করা হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর অবশেষে শান্তি স্থাপিত হয়। সানাচাওবা ব্রহ্মদেশে পলাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখান হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া মণিপুরে আনা হয়। আদালতের বিচারে তাহার প্রতি দীর্ঘকালের কারাদণ্ডাজ্ঞা হয়। এই সময় মহারাজা যে অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানের নাম রাখা হয় চূড়াচাঁদপুর।

রাজ্যাভিষেকের পর মহারাজা চূড়াচাঁদ সিং প্রজাদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থায় নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। তিনি চিরাচরিত 'লাল্লুপ' অর্থাৎ

বাধ্যতামূলক বেগার প্রথা রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে করদানের প্রথা প্রবর্তন করেন। সমস্ত রকমের দাসত্বপ্রথাও তাঁহার সময় উঠিয়া যায়। মণিপুরের অপরাপর প্রাক্তন রাজাদের মত মহারাজ চূড়াচাঁদও অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বৈষ্ণব তীর্থগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁহার নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের (১) সংলগ্ন সোনার পাতে মোড়া দুই গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে ৺শ্রীগোবিন্দজীকে স্থাপন করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী মহারাণী ধনমঞ্জুরী দেবী নবদ্বীপে সোনার পাতে মোড়া এক গম্বুজবিশিষ্ট 'সোনার মন্দির' নামে একটি মন্দির তৈরী করান। ১৯৩৪ সনে মহারাজা মণিপুরী সমাজের উন্নতি কল্পে নিখিল হিন্দু মণিপুরী মহাসভার আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাতে কাছাড়, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, জোরহাট, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে মণিপুরী সমাজের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

চূড়াচাঁদ মহারাজের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী কাবুই-নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মণিপুরের উপর ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহারাজের প্রতি তাহাদের আনুগত্য ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়ে। কাবুই

(১) ১৮৯১ সনের যুদ্ধের পর হইতে পুরাতন রাজপ্রাসাদ এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, ৪নং ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলের (4th Assam Rifle) ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান প্রাসাদটি ঐ স্থান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে মহারাজ চূড়াচাঁদের সময়ে নির্মিত হয়।

আন্দোলনের স্রষ্টা এবং নায়কের নাম যাদোনাং (Jadonang)। ১৯২৭ সনের কিছু পূর্বে যাদোনাং এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়া কাবুই সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। কাবুইদের মনে তাহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে। যাদোনাং নিজেকে স্বাধিন কাবুই রাষ্ট্রের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নাগা এবং কুকি সম্প্রদায়ের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে থাকে। অনেকে তাহার দৈবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া কাম্বিরণ (Kambiron) নামক স্থানে তাহার প্রতিষ্ঠীত মন্দিরে পূজা এবং নানা উপঢৌকন পাঠাইত। অনেকে তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাকে কর দিত। ইহা অনেকটা মারাঠা বীর শিবাজী মহারাজ কর্তৃক প্রবর্তিত চৌথ এবং সরদেশমুখী নামক করের অনুরূপ। যাদোনাংএর ক্রিয়াকলাপে নাগাপাহাড়ের কমিশনার এবং মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যাদোনাংকে গেপ্তার করার উদ্দেশ্যে মণিপুর সরকারের একদল সৈন্য কাম্বিরণ গ্রামে পাঠান হয়। যাদোনাং তখন কাছাড়ে। সেখানে মার্চ মাসে কাছাড় সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে যাদোনাংকে গ্রেপ্তার করার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পলিটিক্যাল এজেন্ট একজন ইংরেজ এবং একজন গুর্খা অফিসারের পরিচালনাধীন আসাম রাইফেলের এক প্ল্যাটুন সৈন্য বিষেণপুরের মধ্য দিয়া কাম্বিরণে পাঠায়। সেখানে তাহারা যাদোনাংএর নাগাল না পাইয়া তাহার প্রবর্তিত নূতন ধর্মের দেব মূর্তিসহ মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া গায়ের খাল

মিটায়। অতঃপর কাছাড় সরকার কর্তৃক যাদোনাংএর গ্রেপ্তারের খবর আসে। তখন তাহারা জিরিঘাট হইতে যাদোনাংকে সঙ্গে লইয়া মণিপুরে ফিরিয়া আসে। যথাসময়ে পলিটিক্যাল এজেন্টের আদালতে তাহাদের বিচার হয়। বিচারে যাদোনাং এবং তাহার প্রধান ৬ জন অনুচরের প্রাণদণ্ড হয় এবং অন্যান্য আসামীদের প্রতি যাবজ্জীবন কারদণ্ডের আদেশ হয়।

ইংরেজ রাজত্বে যেখানে যখন কোন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে ইংরেজ সরকার তখনই সেখানে বিপুল শক্তি প্রয়োগ করিয়া লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দান করিয়া একাধারে বিদ্রোহীদিগকে শায়েস্তা এবং জনসাধারণের মনে ইংরেজের প্রতি ভয় জন্মাইয়া দিতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করে নাই। এত সব সত্ত্বেও বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়া দূরে থাক আগুন আরও ব্যাপকভাবে ছাড়াইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। কাবুই আন্দোলনেও ঠিক তাহাই হয়। যাদোনাংএর ফাঁসির পর কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিল বিদ্রোহ এবারে কমিয়া যাইবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। যাদোনাংএর অন্যতম প্রধানা শিষ্যা গাইদিলু (Gaidileu) নামক এক কাবুই তরুণীর নেতৃত্বে কাবুইগণ তাহাদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯৩১ সনে ইম্ফাল হইতে সৈন্যদল যখন বিদ্রোহী অঞ্চলে যায় তখন তাহারা গাইদিলুর উপর ততটা গুরুত্ব দেয় নাই। কিছুদিন পর গাইদিলু ধরা পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমতী গাইদিলু সরকারী লাম্বুর(১) চোখে ধূলা দিয়া গ্রামের লোকের সাহায্যে পলাইয়া

(১) মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলে সরকারী চৌকিদার শ্রেণীর লোককে লাম্বু বলা হয়।

পারে নাই। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন কাচা নাগা (Kacha Naga), নাগাপাহাড়, উত্তর কাছাড়ের পাহাড় ও সমতল ভূমির নাগাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তখন মহাত্মাজী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল। ইহাতে কাবুইগণ আরও উৎসাহিত হইয়া থাকিবে (১)। গাইদিলু তখন নাগা অঞ্চলে রাণী বলিয়া পরিচিত। রাণী গাইদিলু কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে এ অঞ্চলে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮।১৯ বৎসর। মিশনারী স্কুলে নবম অথবা দশম শ্রেণীর (Class IX or X) বেশী বিদ্যা তাহার ছিল না।

(১) "In Sylhet also many Nagas from the surrounding hills came to visit me with greetings and gifts. And from them and others I heard a story which India ought to know and to cherish. It was the story of a young woman of their tribe belonging to the Koboi Clan in the Naga Hills. She was of the priestly class and she had the unique opportunity among her people to receive some education in a mission school, where she reached the ninth or tenth class. Giudallo was her name and she was about nineteen. Six years ago when civil disobedience blazed over the length and breadth of India news of Gandhi and the Congress reached her in her hill abode and found an echo in her heart. She dreamed of freedom for her people and an ending of the galling restrictions they suffered from, and she raised the banner of independence and called her people to rally round it." In the Surma Valley—Dec. 9, 1937—The Unity of India—by Jawaharlal Nehru.

আসাম গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমনের ভার গ্রহণ করে। সরকারের নির্দেশে নাগা পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার আসাম রাইফেলের সিপাহীদিগকে সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহী অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। দিনের পর দিন জনসাধারণের উপব স্ত্রীপুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে। গুলিতে বা প্রহারে কত লোক নিহত বা পঙ্গু হয় তাহার কোন সীমা সংখ্যা নাই। সরকার পক্ষ হইতে রাণী গাইদিলুকে যে ধরাইয়া দিতে সাহায্য করিবে তাহাকে প্রথমতঃ ২০০৲ টাকা পরে তাহা বাড়াইয়া ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচার কবা হয়—যে যে গ্রামের লোক তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে ১০ বৎসর পর্যন্ত সেই গ্রামের লোককে কোন প্রকার খাজনা দিতে হইবে না।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক এইরূপ অক্লান্ত চেষ্টার ফলে নাগা 'জোয়ান অব আর্ক' রাণী গাইদিলু অবশেষে ধরা পড়িয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার 'The Unity of India' গ্রন্থে গাইদিলু সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

"Perhaps she thought, rather prematurely, that the British Empire still functioned effectively and aggressively and it took vengeance on her and her people. Many villages were burnt and destroyed and this haroine girl was captured and sentenced to transportation for life. And now she lives in some

prison in Assam, wasting her bright young womanhood in dark cells and solitude. Six years she has been there, what torment and suppression of spirit they have brought to her, who in the pride of her youth dared to challenge an Empire! She can roam no more in the hill country through the forest glades, or sing in the fresh crisp air of the mountains. This wild young thing sits cabiend in darkness, with a few yards, may be, of space in the day time, eating her fiery heart in desolation and confinement. And India does not even know of this brave child of her hills, with the free spirit of the mountains in her. But her own people remember the Giudallo Rani and think of her with love and pride. And a day will come when India will remember her and cherish her, and bring her out of her prison cell.

But our so-called Provincial Autonomy will not help in bringing about this release. More is needed. For the Excluded Areas are outside the ken of our provincial ministries, and, strange to say, they are even more cut off from us now than they were before the advent of 'Provincial Autonomy'. Even questions about Giudallo were not allowed to be put in the Assam Assembly.

.........And I thought of Giudallo, the Rani sitting in her prison cell. What thoughts were hers, what

regrets, what dreams ?" (In the Surma Valley, Dec. 9, 1937 The Unity of India—by Jawaharlal Nehru.)

১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের পব কংগ্রেসের নেতৃবর্গ রাণী গাইদিলুর মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রাণী গাই-দিলু পুনরায় নিজ এলাকায় চলিয়া আসেন। ১৯৪৯ সনে ভারতের সঙ্গে মণিপুর যুক্ত হওয়ার পর অপরাপর সম্প্রদায়েব মত কাবুই সম্প্রদায়ও দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রাণী গাইদিলু ১৯৫৩ সনে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজেদের সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করার কথা জানাইয়া গিয়াছেন। বর্তমানে ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি অনুন্নত পার্বত্য উপজাতি বলিয়া কাবুই নাগাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়টি সেই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠায় স্থান লাভে বঞ্চিত হইবে না।

চূড়াচাঁদ মহারাজেব সময় মণিপুর রাষ্ট্র এবং মণিপুরী সমাজ ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় জড়ত্ব কাটাইয়া উঠিয়া প্রগতির পথে ধাবিত হয়। জাতীয় জাগরণের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি প্রথম প্রকাশ পায় ভাষা ও কৃষ্টির মধ্যে। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিক হইতেই মাইনর স্কুলগুলি ক্রমশঃ হাই স্কুলে পরিণত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষারও গোড়াপত্তন হয়। ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয় মণিপুরী ভাষায় ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেয়। ১৯৩১ সনে মণিপুরী ভাষা আই-এ (I. A.) পর্যন্ত পাঠ্য

বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিমধ্যে মণিপুরী সাহিত্যকগণ অজস্র কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক লিখিয়া এবং অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া নিজেদের মাতৃভাষার সম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধি করিয়া চলেন। এই সময় মণিপুরী নাট্যাভিনয়েরও যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং মণিপুরী নৃত্য মণিপুরের বাহিরে ভারতের নানাস্থানে জনপ্রিয় হইতে থাকে। মহারাজা এই সমস্তবিষয়েব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পবিচালনায় মণিপুরের খেলোয়াড়গণ গৌহাটি, শিলচর প্রভৃতি স্থানে পলো খেলা এবং নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের পরিচালনাধীন ছিল। তিনি নিজেব পুত্রদের জন্যও আধুনিক উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার বোধচন্দ্রসিংকে তিনি ১৯২২ সনে বিলাত পাঠান। অপর দুই পুত্র প্রিয়ব্রতসিং এবং লোকেন্দ্র সিং যথাক্রমে এলাহাবাদ ও মেয়ো কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। চূড়াচাঁদ মহারাজের সময় ১৯২৯—৩৪ সনে ওয়াহেংবম যুমজাও সিং প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার করেন। রাজসরকার হইতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। ইংরাজ সরকার মহারাজের ব্যবহার এবং কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কে-সি-এস-আই (K. C. S. I.) উপাধি দান করে। ১৯৩৭ সনে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে "গৌরভক্তিরসার্ণব" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

চূড়াচাঁদ মহারাজের রাজত্বের শেষভাগে ১৯৩৯ সনে ইউরোপে ২য় মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই সময় কতিপয় অতি-রিক্ত মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কৌশলে ধান চালের দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই বহু ধান কিনিয়া মজুদ করিয়া রাখে ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ লোকের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। মণিপুরের মেয়েরা সব ব্যাপারেই সকলের আগে অগ্রসর হইয়া আসে। ব্যবসায়ীদের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মেয়েরা এক ব্যাপক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করে। মণিপুরের ইতিহাসে ইহা 'নুপীলান' (মেয়েদের সংগ্রাম) নামে খ্যাত। এ যাত্রায়ও পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শে মণিপুর সরকার আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েদের এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। সরকার নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সংযত করিতে রাজী হইলে আন্দোলন বন্ধ হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে মণিপুরের উপর আক্রমণের কোন আশঙ্কা দেখা না দিলেও চুড়াচাঁদ মহারাজ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের মত তখনও ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। ১৯৪১ সনে মণিপুরের পক্ষ হইতে 'মণিপুর ফাইটার প্লেন' (Manipur Fighter Plane) নামে ৫৮ হাজার টাকার একটি জঙ্গী বিমান দান করা হয়। মহারাজ তখন ৫৬ বৎসরের বৃদ্ধ। ধর্মের প্রবল আকর্ষণে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তাঁহার সমস্ত মোহ কাটিয়া যায়। সেইজন্য তিনি ১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জীবিত কালেই আপন জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ কুমার

বোধচন্দ্র সিংকে সিংহাসনে বসাইয়া নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে নবদ্বীপ ধামে তিনি ইহলোক ছাড়িয়া অমরলোকে চলিয়া যান।

Ref.—

1. মণিপুর ইতিহাস (মণিপুরী ভাষায়)—রাজকুমার শ্রীস্নাহল সিংহ.
2. Glimpse of Manipur—R. K. Snahal Singh, B. com.
3. বিজয় পাঞ্চালি—(মণিপুরী ভাষায়)—মুতুয়া ঝুলন সিংহ
4. Assam Dist. Gazetteers Vol IV 1905— B. E. Allen, C S.
5. History of the Assam Rifles—Colonel L. W. Shakespear, C. B., C. I. E.
6, Administration Reports (Manipur)— 1932-33, '34-'35. '46-'47,
7. Manipur State Budget—1931-32, '41-'42, '46-'47, '52-53,

ষোল

মহারাজ বোধচন্দ্র সিং

(১৯৪১-১৯৪৯)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—

মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাপান অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিয়া এশিয়া খণ্ডে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্র পক্ষের ঘাঁটিগুলি ততটা সুদৃঢ় না থাকায় তাহাদের পক্ষে বেশীক্ষণ জাপানের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। জাপবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে পার্ল হার্বার হইতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করিয়া লয়। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ সমস্তই জাপানের করতলগত হয়। যুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ইংরেজ এবং আমেরিকার কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু জাপানের পক্ষে যত শীঘ্র উপরোক্ত অঞ্চল দখল করা সম্ভব হইয়াছিল ভারতের উপর আক্রমণ চালান তত শীঘ্র সম্ভব হইল না। নব বিজিত অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিতে এবং নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মিত্রপক্ষও ইত্যবসরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর সৈন্য আমদানি করিয়া নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষিত করার সুযোগ পায়। স্থল এবং জল দুই পথেই ভারতের উপর জাপ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। এই স্থলপথে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার

মাত্র দুইটি অপেক্ষাকৃত সুগম পথ রহিয়াছে। একটি আরাকানের মধ্য দিয়া অপরটি মণিপুরের মধ্য দিয়া। জাপ-সৈন্তের ভারত অভিযান কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিলেও বিমান হইতে বোমা বর্ষণ চলিতে থাকে। ১৯৪২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালের উপর জাপানীগণ ক্রমাগত বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। আত্মরক্ষার জন্য মণিপুরীগণ দূরে গ্রামাঞ্চলে পালাইয়া যাইতে থাকে।

১৯৪৩ সনের শেষ ভাগে ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিবার আয়োজন চলিতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তখন মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এডমিরাল মাউণ্টব্যাটেন। মিত্রপক্ষ হইতে স্থির হইল—জেনারেল ষ্টিলওয়েল উত্তর আসামে লিডো হইতে চীনা এবং মার্কিণ সৈন্য লইয়া উত্তর ব্রহ্মে মীটকিনা (Mytkiyina) অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ষ্টিলওয়েলের বিশ্বাস ছিল, যদি ইম্ফাল হইতে মাউণ্টব্যাটেনের ৪র্থ নং কোর (Mountbatten's IVth Corps) ইতিমধ্যে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া সুয়েবো-মোনিওয়া (Shwebo-Monywa area) অঞ্চল দখল করিতে পারে তবে তিনি সহজেই মীটকিনা হস্তগত করিতে পারিবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল ষ্টিলওয়েল দুই ডিভিসন চীনা সৈন্য লইয়া মীটকিনা অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিলেন। জাপানীদের বাধা সত্বেও তাহার অগ্রগতি সমভাবে চলিতে লাগিল। ১৯৪৪ সনে জানুয়ারি মাসের মাঝা-মাঝি জেনারেল ক্রীষ্টিসন (General Christison)

আরাকানের মধ্য দিয়া অভিযান আরম্ভ করিলেন। এদিকে অপরপক্ষও বসিয়া ছিল না। পূর্বে ব্রহ্মদেশে তাহাদের ৫ ডিভিসন সৈন্য ছিল, ১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে তাহা বাড়াইয়া ৮ ডিভিসন করা হইল। তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের মতে জাপান ভারতের জনগণকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তখন পূর্বভারতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল (১)।

ইচ্ছাকৃতভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ গোপন রাখার ফলে চার্চিল সাহেবের উক্তিতে সত্য বিকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের মতামত না লইয়া বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করায় যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয় তাহা সকলেরই জানা আছে। ভারতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ১৯৪২ সনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বলে। ইংরেজ সরকার তখন ভারতের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইলে জাপান কখনই ভারত আক্রমণের কল্পনা করিত না। কিন্তু সাম্রাজ্য বাদী সরকার সে পথে না যাইয়া আসন্ন সমস্যা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অতর্কিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে। বিক্ষুব্ধ জনতা শাসনযন্ত্রের উপর প্রবল আঘাত হানে; দিকে দিকে ভারত ছাড় রব উঠে। যুদ্ধের দরুণ সমগ্র

(১) "The Japanese also had a plan. Since November they had increased their strength in Burma from five divisions to eight, and they proposed to invade Eastern India and raise the flag of rebellion against the British." Page—496, Closing the Ring. The Second World War. Vol. V —Winston S. Churchill.

ভারতই তখন একটি সৈন্যাবাসে পরিণত ছিল। নিরস্ত্র জনসাধারণের পক্ষে এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়া সাফল্য অর্জন করা সম্ভব না হইলেও ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ রহিয়াই গেল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব হইতেই সমস্ত ব্যাপার আন্দাজ করিয়া বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিয়া ভারত স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সনের জানুয়ারি মাসে সরকারের চক্ষে ধূলা দিয়া ভারত হইতে জার্মাণীতে চলিয়া যান। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখলের পর তিনি সিঙ্গাপুরে চলিয়া আসিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। এসমস্ত খবর চার্চিল সরকারের অজানা ছিল না। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের কোন জনবহুল প্রান্তে একবার কোনরকমে প্রবেশ করিতে পারিলে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন যে সমস্ত দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিবর্তে জাপ-বাহিনী প্রবেশ করিলে সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা-ত ছিলই না, উপরন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই সক্রিয়ভাবে তাহাতে বাধা দিতেন। পণ্ডিত নেহেরু জাপান এবং ইরেজকে সেকথা খোলাখুলি ভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ রাখার একমাত্র অর্থ এই যে, ইংরেজ ইহা ভাল করিয়াই জানিত—তখন

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার জন্য সমরায়োজনের নেতৃত্ব ছিল সুভাষচন্দ্র গঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে। সেই জন্য ভারতে বিদ্রোহের আশংকা ব্যক্ত করিলেও তাহার পিছনের প্রকৃত কারণ সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের পক্ষে খুলিয়া বলা শক্ত ছিল। জাপানী সৈন্য ভারতে প্রবেশ করিলেই যদি বিপ্লবের কোন আশংকা থাকিত তবে ইংরেজ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাপ-আক্রমণ রূপে এত ফলাও করিয়া ভারতময় প্রচার করিত না। ইহাতেই প্রমাণিত হয়-- যদি ভারতের উপর প্রকৃতই জাপ-আক্রমণ হইত, তবে জনসাধারণ বিদ্রোহ না করিয়া জাপানকে রুখিবার জন্য ইংরেজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের মনেও কোন সন্দেহ ছিল না।

১৯৪৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আরাকান ফ্রন্টে প্রবল বাধা পাওয়ায় ইংরেজ সৈন্যের অগ্রগতি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, উপরন্তু তাহাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চলে। মিত্রপক্ষের ৭নং ডিভিসন সৈন্যদল অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিমান হইতে যথাসময়ে রসদাদি না আনিলে সে যাত্রা চট্রগ্রাম-বন্দর হাতছাড়া হইয়া যাইত। যথোপযুক্ত জঙ্গী বিমানের অভাবে বিপক্ষের এই পাল্টা আক্রমণ অবশেষে ব্যর্থ হয়। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে ইম্ফালের উপর আক্রমণের তোড়জোর আরম্ভ হয়। তাহাতে মীটকিনা অভিমুখে জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হইলেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে আমেরিকান বিমান ও রণসম্ভারের সাহায্যে তাহা পুনরায় আরম্ভ

হয়। ৮ই মার্চ (১৯৪৪ সন) ৩ ডিভিসন আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরে মিত্রপক্ষের 'সেন্ট্রাল ফ্রন্টে'র উপর অভিযান চালায়। জেনারেল স্কুনেস (Gen. Scoones) তাহার ৪র্থ নং কোর এবং ৩ ডিভিজন সৈন্য লইয়া ইম্ফাল উপত্যকায় পশ্চাদপসরণ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম লক্ষ্য ছিল ডিমাপুর রেলষ্টেশন সহ 'ইম্ফাল-ডিমাপুর রোড' দখল করিয়া ইম্ফালে অবরুদ্ধ বৃটিশ রসদাগার হস্তগত করা এবং পশ্চাৎ হইতে জেনারেল ষ্টীলওয়েলের স্থলপথ কাটিয়া দেওয়া। মাসের শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ, তাহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ইম্ফাল-ডিমাপুর রোড' দখল করিয়া কোহিমা এবং ইম্ফালের উপর প্রবল চাপ দেয়। মিত্রপক্ষ বিমানের সাহায্যে তাড়াতাড়ি আরাকান ফ্রন্ট হইতে ৫নং এবং ৭নং 'ইণ্ডিয়ান ডিভিজন' যথাক্রমে ইম্ফাল এবং ডিমাপুরে লইয়া আসে। এই যুদ্ধে একমাত্র ইম্ফালেই মিত্রপক্ষের ৬০ হাজার সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। জুন মাসের ৩য় সপ্তাহে অবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল (১)। ইহার পর মিত্রপক্ষের সুদিন ফিরিয়া আসে। বিষেণপুরসহ মণিপুর রাজ্যের প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল জায়গা ৬ মাস পর্যন্ত অধিকারে

---

(১) "In the third week in June the situation was critical, and it seemed possible, after all the efforts of the previous two months, that early in July the IVth Corps would finally run out of reserves. But on June 22, with a week and a half in hand, the 2nd and 5th Indian Divisions met at a point twenty-nine miles north of Imphal and the road to the plain was open. On the same day the convoys began to roll in". Quoted from Admiral Mountbatten's report by Winston S. Churchill in 'Closing the ring'.

রাখার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ মনিপুব হইতে পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধে তাহাদের প্রায় ৭।৮ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল উপযুক্ত রসদ এবং বিমানের অভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই অধ্যায় এইখানেই সমাপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজের এই অভিযানেব কথা গোপন বাখিয়াছিল। জনসাধারণ যখন এইখবর পায় তখন আর এসম্পর্কে তাহাদের কোন করণীয় কিছু ছিল না।

মহারাজা বোধচন্দ্র সিং যুদ্ধের সময় মণিপুরেই ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত খুশী হয়। যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব মণিপুরেও ছড়াইয়া পড়ে। মণিপুরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন; মহারাজা ১৯৪৭ সনে নূতন বিধান তৈরীর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। নূতন বিধান রচিত হওয়ার পর মণিপুর রাজ্যে সর্বপ্রথম গণভোটেব দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহারাজের ভ্রাতা শ্রীপ্রিয়ব্রত সিং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইতিপুর্বেই ১৯৩৬ সনে মহারাজের বিমাতা, চুড়াচাঁদ মহারাজের অন্যতমা পত্নী ধনমঞ্জুরী দেবীর বদান্যতায় ইম্ফাল সহরে তাঁহার নামে ডি, এম, কলেজ (D. M. College) স্থাপিত হইয়াছিল। এদিকে ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই তৎকালীন রাজ্যমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। মণিপুরবাসীর ইচ্ছানুসারে মহারাজ সর্দার প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দেন। ১৯৪৯ সনের ১৫ই

অক্টোবর ভারত সরকার মণিপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন. তখন হইতেই পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ লোপ পায় এবং মণিপুর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (Indian Union) মধ্যে চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে (Part C State) পরিণত হয়। ভারত সরকার হইতে মহারাজকে বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মহারাজার ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার নিজের অধীনেই থাকে। মহারাজ বোধচন্দ্র সিং মণিপুর রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও মণিপুরী সমাজে তাঁহার সমাজিক মর্যাদা এবং ধর্মানুষ্ঠানের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণই ছিল। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

মণিপুর রাজ্যের শাসনবিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে, (ক) রাজ্যের উন্নয়ন, (খ) অর্থনৈতিক সমস্যা, এবং (গ) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, এই তিনটি প্রধান সমস্যা ভারত সরকারের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ভারতের দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলির চেয়েও অনেক অনুন্নত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকিলেও স্বল্প আয় এবং নানারকম প্রতিবন্ধকতার দরুণ দেশীয় নৃপতিগণ বিশেষ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিতে সক্ষম হইতেন না। মণিপুর রাজ্যেরও ঠিক একই অবস্থা ছিল। ভারত সরকার কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। মণিপুরের গ্রাম্যজীবনকে উন্নত এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে গ্রামের লোকের

সহযোগীতায় থৌবাল অঞ্চলে প্রায় একশত গ্রাম লইয়া একটি ব্লকে (Block) 'কমিউনিটি পবিকল্পনা' (Community Project) অনুযায়ী কাজ করা হয়। এই কাজসম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এইরূপ আরও ব্লকে কাজ আরম্ভ হয়। তদুপরি প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা অনুয য়ী ১৫৪.৮ লক্ষ টাকার কাজে হাত দেওয়া হয়।

১৯৫২-৫৩ সন হইতেই পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সমস্ত অর্থই কেন্দ্রীয় সবকার হইতে দেওয়া হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ীও কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম সোপান হিসাবে নির্বাচিত সভ্যের দ্বারা একটি পরিষদ (Territorial council) গঠন করা হয়।

Ref.—

1. The Second World War Vol. V—W. S. Churchill,
2. First Five Year Plan—Manipur
3. The Unity of India—Jawaharlal Nehru.

সত্তর

শাসন প্রণালী

প্রাচীনকাল হইতে মণিপুরে রাজতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে। রাজাই ছিলেন মণিপুরের একচ্ছত্র অধিপতি। রাজ্যের উচ্চ পদগুলি বয়সের তারতম্য অনুসারে রাজার ভ্রাতা অথবা তাহাদের অবর্তমানে রাজপুত্রদের মধ্যে বণ্টন করা হইত। উচ্চ রাজ কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত একটি 'দরবারে'র উপর দৈনন্দিন শাসন কার্য পরিচালনের ভার থাকিত। রাজা এই দরবারের সভাপতি থাকিতেন। রাজার প্রথম অনুজ যুবরাজের পদ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যের মধ্য রাজার পরই যুবরাজের স্থান, তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় অনুজ সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অনুজগণ যথাক্রমে কোতোয়াল (Head of Police), শগোল হঞ্জবা (অশ্বাধ্যক্ষ), শামুহঞ্জবা (গজাধ্যক্ষ), দোলাইরই হঞ্জবা (শিবিকাধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত হইতেন। রাজভ্রাতাদের অবর্তমানে অথবা তাহারা বিদ্রোহী হইলে রাজপুত্রদের মধ্যে উপরোক্ত পদগুলি বণ্টন করা হইত। এই সমস্ত অধ্যক্ষগণ পদাধিকারবলে প্রধান বিচারালয় চিরাপের (Chirap) সভ্য থাকিতেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্তির সময় আয়া পুরেল (Awa Purel) নামে পররাষ্ট্র সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়।

সৈন্য বিভাগ

প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মণিপুরীকেই রাজার

পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে হইত। ইহা ছাড়া মণিপুরের "বিজয়া গারোট" অর্থাৎ সামরিক বিভাগের পরিচালনায় একটি স্থায়ী সৈন্যদলও ছিল। রাজভ্রাতাদের মধ্যে যিনি সেনাপতি হইতেন তিনিই পদাধিকার বলে বিজয়া গারোটের সভাপতিত্ব করিতেন। ৮টি কোম্পানীর ৮জন মেজর, পররাষ্ট্রসচিব (যাঁহার উপর ব্রহ্মদেশ সম্পর্কিত বিষয় সমূহের ভার থাকিত) এবং নিম্নতর সামরিক কর্মচারীদের মধ্য হইতে ১১ জন সহ এই ২০ জন সভ্য দ্বারা বিজয়া গারোট গঠিত হইত। কোম্পানীগুলি তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় সামরিক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিত। সৈন্য বিভাগে অশ্বারোহী এবং পদাতিক দুই রকম সৈন্যই ছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে অশ্বারোহী সৈন্যের গুরুত্ব ততটা না থাকিলেও এমন এক সময় ছিল যখন অশ্বারোহী মণিপুরী শত্রুপক্ষের নিকট বিভীষিকা স্বরূপ ছিল।

যুদ্ধাস্ত্র

মণিপুরী সৈন্যদের দা একটি সার্বজনীন অস্ত্র; সকলের হাতেই একটা করিয়া থাকিত। ইহা ছাড়া বল্লম, পাথর ছুড়িবার যন্ত্র, তীর ধনুক, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি নানা অস্ত্রও যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হইত। সপ্তদশ সতাব্দীর গোড়া হইতেই মণিপুরে আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহারের কথা শুনা যায়। সম্ভবতঃ রাজা খাগেম্বার সময় আক্রমণকারী চীনাদের নিকট হইতে মণিপুরীরা বারুদ তৈরীর কৌশল শিখিয়া থাকিবে। বারুদের সন্ধান পাওয়ার পর তাহারা নানারকম বন্দুক ও বুলেট তৈরী করিয়া যুদ্ধের সময় ব্যবহার করিত। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা খাগেম্বা ধাতু নির্মিত একটি বড় কামানও তৈরী করিয়াছিলেন।

মণিপুরী সৈন্য

মণিপুরী সৈন্য বহুবার বহু যুদ্ধে তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুশিক্ষিত সৈন্যের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, মহারাজা গম্ভীর সিং তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচর সহ ব্রহ্মদেশের কবল হইতে মণিপুর পুনরুদ্ধার করিয়া সেই অসাধ্য কর্ম সাধন করেন। মণিপুর উদ্ধারের পর তিনি তাঁহার সৈন্য বিভাগকে যুগোপযোগী নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া আরও সুগঠিত এবং শক্তি-শালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে নানা সময়ে নানা বিপদে ইংরেজ সরকারকে মণিপুরী সৈন্যের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। মণিপুরীদের সৈনিক সুলভ নানাবিধ গুণ থাকা সত্বেও বিভিন্ন সময়ে মণিপুর রাষ্ট্রে যে সমস্ত বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহর প্রধান কারণ ঘন ঘন রাষ্ট্র বিপ্লব এবং সৈন্য বিভাগে যোগ্য পরিচালকের অভাব। ১৮৯১ সনে মণিপুরের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার পর সৈন্য বিভাগের গুরুত্ব একেবারে কমিয়া যায়। তখন হইতে শুধু কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলনের প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ফলে মণিপুর আজ আত্মবিস্মৃত। বিদেশী সরকারের উদ্দেশ্যও বোধ হয় ইহাই ছিল। এখন লোকে মণিপুরকে জানে শুধু নৃত্যের বৈশিষ্ট্য দ্বারা। এমন একদিন ছিল যখন মণিপুরের ছেলে যেমন তার নৃত্যের ছন্দে রূপের ইন্দ্রপুরী সৃষ্টি করিতে পারিত, তেমনি আবার প্রয়োজন হইলে অসি হস্তে সমরাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইতেও পারিত। সে সব স্মৃতি মণিপুরীদের কাছেও আজ প্রায় রূপকথার মত কাল্পনিক। মিঃ হডসন তাহার গ্রন্থে (The Mei-

theis T. C. Hodson) সাধারণ মণিপুরীদের সামরিক গুণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The inherent defects of the Meithei, his dislike of sustained discipline, his preference of diplomatic methods, his employment of irregular troops...lack of honesty in those responsible for the equipment and commissariat of the forces, deprived the troops of all military value, which otherwise they might have possessed at the end of the period of independence in 1898. Yet the Meithei is far from being a coward, and in happier circumstances with better leading might be capable of military virtues." হডসন সাহেব মিঃ গ্রীমউড প্রভৃতির হত্যার কিছুদিন পরই মণিপুরে আসেন। সেইজন্য জ্ঞাতিবধ জনিত ক্ষোভের দরুণ তাহার কলমে মণিপুরীদের সম্বন্ধে একটু ঝাঁজ মিশান থাকা স্বাভাবিক। তাহা হইলেও সাধারণ মণিপুরীদের সাহস এবং সামরিক যোগ্যাতার কথা তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়া গিয়াছেন।

বিচার বিভাগ—

বিচার কার্যের সুবিধার জন্য উপত্যকা অঞ্চল ১১ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র পঞ্চায়েৎ ছিল। সাধারণতঃ স্থানীয় লোকের মধ্যে সকলের আস্থাভাজন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি-কেই পঞ্চায়েতের সভাপতি করা হইত। পঞ্চায়েৎ স্থানীয় চুরি, মানহানি, জবরদস্তি, পরস্ত্রীগমন, বলাৎকার, জখম, বেদখল প্রভৃতি

সাধারণ অপরাধের বিচার অথবা মীমাংসা করিত। দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলার বিচার একই আদালতে হইত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে পঞ্চায়েৎ ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিত। কেবলমাত্র ইম্ফাল পঞ্চায়েতের ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা ছিল। পাহাড় অঞ্চলেও এইরূপ পঞ্চায়েতী প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছিল। লিলোং অঞ্চলে মুসলমান এবং মণিপুরীদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসাব জন্য একটি বিশেষ পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হইয়াছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভ্যগণ প্রত্যেকে সরকার হইতে ২½ একর নিষ্কর জমি পাইত। ইম্ফাল পঞ্চায়েতের সভ্যগণ সেই স্থলে পাইত ৬½ একর করিয়া।

রাজধানীতে নগর পঞ্চায়েৎ ব্যতীত আরও ৩টি উচ্চ বিচারালয় ছিল। যথা :— পাচা, সামরিক বিচারালয় এবং চিরাপ।

১। পাচা— স্থানীয় পঞ্চায়তী বিচারালয় যে সমস্ত অভিযোগের বিচার চলিত না, সেইরূপ অভিযোগের বিচার হইত 'পাচা' নামক বিচারালয়ে।

২। সামরিক বিচারালয়ে শুধু সৈন্যদের বিচার হইত।

৩। চিরাপ—ছিল বর্তমান হাইকোর্টের মত মণিপুর রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয়। নিম্ন আদালত কর্তৃক দণ্ডের পুনর্বিচার এবং সমস্ত রকম গুরুতর অভিযোগের বিচার এইখানেই হইত। এই বিচারালয়ে পূর্বে ১৩জন বিচারক ছিলেন, পরে কমাইয়া ৫জন করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকে ১২৫ একর করিয়া জমি পাইতেন।

চিরাপের বিচারের পর রাজার নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করা যাইত। রাজ্যের মধ্যে রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি অন্যান্য সমস্ত বিচারালয়ের আদেশের রদবদল করিতে পারিতেন। মণিপুরে ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ার পর চিরাপের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হয়। দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার আগে যেমন ছিল তেমনি রহিল। নরহত্যা, রাজদ্রোহমূলক অপরাধের বিচারের ক্ষমতা চিরাপ হইতে পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্টে চলিয়া আসে। চিরাপের দণ্ডদানের ক্ষমতাও খর্ব করিয়া ২ বৎসর জেল, ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং বেত্রদণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইংরেজ প্রজা এবং মণিপুরের গিরিজনদের বিচার হইত পলিটিক্যালএজেন্টের কোর্টে; চিরাপ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞার পুনর্বিচারও হইত সেইখানে। পলিটিক্যাল এজেন্ট আসামের চীফ কমিশনারের অনুমোদন লইয়া ৭ বৎসরের অধিক কারাদণ্ড এমন কি ফাঁসির হুকুম পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন।

দণ্ডবিধি—

ধর্মানুশাসন এবং দেশাচার অনুসারে মণিপুরে অভিযুক্তদের অপরাধ নির্ণয় এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত। ইহাতে যে অনেক সময় লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড প্রয়োগ হইত না এমন নয়। নরহত্যা এবং গো'হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল। প্রাচীনকালে খুনী যেভাবে খুন করিত, প্রাণদণ্ডের আদেশও তাহার প্রতি সেই ভাবেই পালন করা হইত। কর্ণেল জনষ্টন অনেক চেষ্টা করিয়া মুণ্ডচ্ছেদ করার প্রথা প্রবর্ত্তন

করেন। বেত্রদণ্ডের আদেশ বিকালে বাজারের মধ্যে সর্বসমক্ষে পালন করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশত বেত্রাঘাতেরও হুকুম হইত; সহ্য করিতে না পারায় ইহাতেও অনেকের মৃত্যু হইত। মেয়েদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইত না। অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া বাজারের সমস্ত লোকের সামনে নানাভাবে নাজেহাল করা হইত যাহাতে শুধু অপরাধী নিজে নহে অপর সকলেও পরিণাম ভাবিয়া বিপথগামী হইতে সাহস না পায়।

মুদ্রা—

মণিপুরে কাঁসার তৈরী "শ্রী" অঙ্কিত সেল নামক একপ্রকার ছোট মুদ্রার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে ৪৫০ হইতে ৫০০ সেলের বিনিময়ে একটি বৃটিশ ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যাইত। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তৈরী চৌকো, গোল ইত্যাদি নানা আকৃতির ৮ রকমের সেল পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা চৌরজিৎ সিং রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন রাজা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রাজা জয়সিংহের সন্ধিপত্রে মণিপুরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেই স্বর্ণমুদ্রার কোন নিদর্শন এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মণিপুরে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের পর হইতে মণিপুরী মুদ্রার পাশে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি প্রভৃতি বৃটিশ-ভারতীয় মুদ্রাও বাজারে চলিতে থাকে। কিন্তু তামার পয়সা বহুদিন পর্যন্ত অচল ছিল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একবার মণিপুর সরকার পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শে ভারত সরকারের নিকট হইতে তামার পয়সা আনাইয়া চালু করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মেয়েরা গ্রহণ করিতে আপত্তি করায় ভারত সরকারকে সেগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

ভূমি ও রাজস্ব—

মণিপুর রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন রাজা স্বয়ং। তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রজাদিগকে জমি ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দিতেন। ফুনান সেলুংবা (Phoonan Saloomba) নামক একজন কর্মচারী কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রত্যেক গ্রাম এবং তাহার সংলগ্ন খাসমহলের জমিগুলির তদারক এবং রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল গ্রামণীদের উপর। পদস্থ কর্মচারী ব্রাহ্মণ অথবা সৈনিকদিগকেও রাজা অনেক সময় ভূসম্পত্তি দান করিতেন। তাহাদিগকেও নির্দিষ্ট কর দিতে হইত। এই সমস্তকর উৎপন্ন শস্যের দ্বারা দেওয়া হইত, তবে পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না।

পানা বিভাগ—

মণিপুরে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোককেই যুদ্ধের সময় রাজার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে হইত, সেই জন্য প্রাচীন কাল হইতেই মণিপুরী সমাজ নিম্নোক্ত ৬টি পানা বা সামরিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

১। খাবম পানা—সম্ভ্রান্তদের স্থান।

২। লাইকম পানা—দেবতাদের স্থান।

৩। অহল্লুপ পানা—বৃদ্ধদের সঙ্ঘ।

৪। নাহারুপ পানা—যুবকদের সঙ্ঘ।

৫। হিতাক হানবা—তামাক যোগানদারদের এলাকা।

৬। পোৎসাংবা—নানারকম প্রহরীদের স্থান।

১৫১০ সনে রাজা কৈরেংবার সময়ে উপরোক্ত পানাগুলির সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। সামরিক প্রয়োজনেই এই সমস্ত বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং গরীব নেওয়াজ পামহেইবার সময় বাধ্যতমূলক সৈনিক বৃত্তি প্রবর্তনের ফলে পানাগুলি এক একটি ছোট সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এক কথায় সমগ্র মণিপুরী সমাজ কতকগুলি সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। পূর্বে এই গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের দলপতির দ্বারা শাসিত হইত। কালক্রমে ইহাদের উপর নিংথৌজা গোষ্ঠীর একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ইহারা মণিপুরের রাজার অধীনে কতকগুলি সামরিক গোষ্ঠীরূপে পরিণত হয়। মণিপুরের উপর বার বার ব্রহ্মদেশের আক্রমণের ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত পানাগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের পর মহারাজা গম্ভীর সিং সম্ভবতঃ প্রাচীন প্রথা অনুসারে পানাগুলিব পুনরায় পত্তন করেন।

এইরূপ স্বাভাবিক সামরিক গোষ্ঠী হইতে পানাগুলির উদ্ভব হইলেও ইহাদের সভ্যগণ যুদ্ধ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট 'লাল্লুপ' প্রথার (বাধ্যতামূলক রাজসেবা) অধীন ছিল। লাল্লুপ প্রথার প্রয়োজনে ৬টি পানাকে সর্বশুদ্ধ ১০৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়: লোই (অনুন্নত

সম্প্রদায়) অথবা নাগা গ্রামগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। উপরোক্ত ১০৭ বিভাগের প্রত্যেকটি একাধিক রাজকর্মচারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। কোন কোন বিভাগে রাজধানী হইতে সমস্ত কর্মচারিগণ আসিত; কোথাও বা এলাকার অধিবাসীদের মধ্য হইতেই কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত এবং তাহাদের কাজের তদারক করার জন্য রাজধানী হইতে কর্মচারী পাঠান হইত। ইহারা সকলেই 'লল্লুপ' কর্মচারী নামে পরিচিত। ইহাদের কেহ কেহ পদাধিকার বলে চিরাপের সভ্য ছিল। এই দপ্তরের কাজ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং গ্রামের কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। লোই এবং নাগাদের এলাকায় বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত পদ ছিল তাহাদের চিহ্ন আজও লোপ পায় নাই। প্রত্যেক এলাকা এক এক জন নিংথৌ অর্থাৎ রাজার অধীন ছিল। এই নিংথৌগণ এককালে নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বাধীন অধিপতি ছিল, পরে তাহারা মণিপুরের রাজবংশের প্রভুত্ব মানিয়া লয়। নিংথৌর অধীন একজন সেনাপতি ছিল। সেনাপতির পর ৩য় এবং ৪র্থ পদ ছিল যথাক্রমে খুলাকপা লুপলাকপা; ইহাদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের দায়িত্ব ছিল। ৫ম পদ ছিল খুঞ্চাওহনবা (গ্রামবৃদ্ধ) ইহার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ৬ষ্ঠ পদ ছিল যুপ-লাকপা অর্থাৎ মদের তত্ত্বাবধায়ক, ইহারা মদের স্বাদ ও গুণাগুণের প্রতি এবং গ্রামে আগত অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিত। ৭ম পাখংলাকপা গ্রামের অবিবাহিত যুবক সমিতির তত্ত্বাবধান করিত। ৮ম নাহা-

রাকপা নাবালক-দের উপর দৃষ্টি রাখিত। ইহারা ছাড়াও তেংল্লোই-হাঞ্জবা তেংল্লোই-হিদাং, হিনাওবা, হিরুপা, লাওমী-বাকপা, লাওমী-হিদাং প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কর্মচারিগণ নৌকা তৈরী বা মেরামত, কৃষি ইত্যাদি নানা বিষয়ের তদারক করিত।

লাল্লুপ (Lallup)—

উপরে যে লাল্লুপ প্রথার কথা বলা হইয়াছে তাহা মৈতাই, ব্রাহ্মণ, মুসলমান এমন কি রাজপুরোহিতদের উপরও প্রযোজ্য ছিল। ১৬ বৎসরের উপর বয়স হইবা-মাত্রই প্রত্যেক লোককে ৩০ দিন অন্তর অন্তর ১০ দিন করিয়া রাজার জন্য বেগার খাটিতে হইত। রাজার ব্যক্তিগত এবং সরকারী নানাবিধ কাজ হইতে ধরিয়া রাস্তাঘাট, সাঁকো নির্মাণ এবং সংস্কার, গৃহ নির্মাণ, সোনা রূপা ও তামা-পিতলের কাজ, কাঠের কাজ, রন্ধন, গোবিন্দজীর পূজার আয়োজন সংগ্রহ করা ইত্যাদি সমস্ত রকমের কাজই লাল্লুপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজের ভার থাকিত। গোষ্ঠীপতিরা সেই অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক পাঠাইত। সরকারী কর্মচারীরা ইহাদের কাজের তদারক করিত। কেহ কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে এক টাকা জরিমানা দিতে হইত এবং এই টাকা দ্বারা লোক নিযুক্ত করাইয়া তাহার প্রতি নির্দিষ্ট কাজ করান হইত। অনেকে ইচ্ছা করিয়াই বেগার খাটার পরিবর্তে জরিমানার টাকা দিয়া দিত। পূর্বে পদস্থ রাজ কর্মচারীদের সেবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দুই একটি করিয়া নাগাগ্রাম দেওয়া হইত। এই

সমস্ত গ্রামের লোকেরা যখন তখন বিনা মজুরীতে মালিকের সমস্ত কাজকর্ম করিয়া দিত। ইহাতে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হইত বলিয়া রাজা দেবেন্দ্র সিং এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। তাহা হইলেও অন্যান্যদের চেয়ে নাগা এবং লোইদের উপর কাজের চাপ ছিল অনেক বেশী। আধুনিক কালে এই লাল্লুপ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

শিক্ষা—

মণিপুরের রাজারা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। ১৮৫৫ সন পর্য্যন্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বিদ্যালয় ছিল না। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যাহারা নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিতে জানিতেন না এবং সেজন্য তাঁহারা লজ্জিত থাকা দূরে থাক ববং৮ গর্বই বোধ করিতেন। সম্ভ্রান্তগণ লেখাপড়ার কাজকে হেয় জ্ঞান করিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৫ হইতে ৬০ সনের মধ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ক্যাপ্টেন গর্ডন (Capt. Gordon) নিজ ব্যয়ে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর স্কুলটি উঠিয়া যায়। ১৮৭২ সনে পলিটিক্যাল এজেণ্ট নুথালের (Major General W. F. Nuthall) চেষ্টায় একটি দেশী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তদানীন্তন বাংলা সরকার চার পাঁচ শত টাকা মূল্যের পুস্তকাদি দান করিয়া স্কুলটিকে সাহায্য করেন। কিন্তু স্থানীয় সরকারের আনুকূল্যের অভাবে স্কুলটি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে জনষ্টন সাহেবের চেষ্টায় ১৮৮৫ সনে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৮৯১ সনের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় স্কুলটি কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকিলেও ১৮৯১ সনের জুন মাস হইতে পুনরায় ইহা চালু হয়। তাহারপর হইতে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। এইভাবে ছেলেদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেও ১৯০২ সন পর্য্যন্ত মেয়েদের মধ্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। মণিপুরী সমাজ পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি এইরূপ বিমুখ থাকিলেও তাহাদের চালচলন, সাধারণ বুদ্ধি, শিল্প নৈপুণ্য অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। এলেন সাহেব তাহার গ্রন্থে (Assam district Gazetteers Vol. IX. 1905, B. C. Allen) যথার্থই লিখিয়াছেন-- They are well dressed well housed and clever craftsmen. Men and women alike are full of enterprise and intelligence, and few people manage better without schooling than the Manipuri.

ক্ষত্রিয়—

মণিপুরের মৈতাই সম্প্রদায় উপবীতধারী ক্ষত্রিয়। ভারতের অন্যান্য স্থানের হিন্দু সমাজের মত মণিপুরী সমাজ বর্ণ বৈষম্যের দ্বারা জর্জরিত নয়। মণিপুরের মধ্যে মৈতাইগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে সব দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিষ্ণুপুরিয়া বলিয়া আরও একটি সম্প্রদায় আছে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন গরীব নেওয়াজ

ইহাদিগকে পশ্চিম হইতে আমদানি করিয়াছিলেন। আবার এও শুন যায় যে, ইহারা মণিপুরেরই লোক, কাছাড়ে বসবাস করিতেছিল; ব্রহ্মদেশের সৈন্য মণিপুর দখল করায় রাজা মারজিৎ সিং কাছাড়ে চলিয়া যাওয়ার সময় শ্রীবিষ্ণুর প্রতিক শালগ্রাম শিলাও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মণিপুর উদ্ধারের পর যাহারা এই শালগ্রাম শিলা পূনরায় মণিপুরে আনিয়াছিল তাহাদিগকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। তাহাদিগকে যে অঞ্চলে বসবাস করিতে দেওয়া হয় সেই অঞ্চলের নামও হয় বিষ্ণুপুর। যে কোন কারণেই হউক এই বিষ্ণুপুরীয়াদের স্থান মণিপুরের ক্ষত্রিয় সমাজে অপেক্ষাকৃত নিম্নে। ক্ষত্রিয় সমাজে সামাজিক পদমর্যাদায় মহারাজার পরের স্থানই হইতেছে মহারাজ কুমারদেব। তাহারা সকলেই কোন না কোন মহারাজার ঔরসজাত সন্তান। মহারাজকুমারদের পর রাজকুমারদের স্থান। রাজকুমারগণ কেহই রাজা অথবা মহারাজার পুত্র নয়, তাহারা তাহাদের পুত্রদের বংশধর। অর্থাৎ মহারাজকুমারদের মধ্যে যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনি ছাড়া আর সকলের পুত্র কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বংশধরগণ রাজকুমার ও রাজকুমারী উপাধি পাইয়া থাকে। তবে রাজকুমারের ছেলেমেয়েরা রাজকুমার রাজকুমারী উপাধি পাইলেও রাজকুমারী এমনকি মহারাজকুমারীর ছেলেমেয়েরাও মায়ের উপাধি পায় না। রাজকুমার সম্প্রদায় এক বংশের সন্তান বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণ—

মণিপুরের ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষগণ অধিকাংশই বাংলা দেশ

হইতে আসিয়াছে। তাহাদের আচারনিষ্ঠা অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণদের মতই। বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদের বিবাহাদি ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এক সময়ে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গেও তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইত না। মেয়েরা বিবাহের পর গোত্রান্তরিত হওয়ায় স্বামীদের বর্ণে প্রবেশ করিত। অর্থাৎ যে বর্ণ হইতেই আসুক না কেন ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাহ্মণই থাকে আর ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী হয় ক্ষত্রিয়। ক্রমাগত এইরূপ সংমিশ্রণের পরও ব্রাহ্মণদের চেহারার বৈশিষ্ট্য এখনও সহজেই চোখে ধরা পড়ে।

লাইরিক ইয়েংবম—

ইহারাও পশ্চিম হইতে আসিয়া মণিপুরী সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। উপবীতহীন ও বসু দাস রায় ইত্যাদি উপাধি ব্যতীত মণিপুরীদের সঙ্গে আজ আর ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত কেরাণীগিরিই ইহাদের প্রধান কাজ।

লোই—

ইহারা মণিপুরের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অনুন্নত সম্প্রদায়। ধর্ম এবং চাল চলনে মৈতাইদের মত হইলেও মণিপুরী সমাজের চক্ষে ইহারা অস্পৃশ্য। লোই সম্প্রদায় এক সময়ে মণিপুর উপত্যকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত স্বাধীন ছিল; ক্রমশঃ মৈতাইদের দ্বারা বিজীত একটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। অনেক সময় গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত মৈতাইকেও লোই শ্রেণীভুক্ত করিয়া

তাহাদের সমাজে বাস করিতে বাধ্য করা হইত। মাছ ধরা লবণ তৈরী, রেশম শিল্প ইত্যাদি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

মুসলমান—মণিপুরের মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণও শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। তাহারা এখানে আসার পর মণিপুরী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া এখানেই থাকিয়া যায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মত নিজেদের ধর্মানুমোদিত পোষাক পরিচ্ছদ আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া চলিলেও অন্যান্য মুসলমান-দের সঙ্গে মণিপুরী মুসলমানদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

সমাজে মেয়েদের স্থান মণিপুরী মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী কর্মঠ। ব্রাউন সাহেব তাহার পুস্তকে (Statistical Account of Manipur—1873) যথার্থ ই লিখিয়াছেন—"It would be difficult to find a more industrious woman in India than Manipuri" গৃহকর্ম, বস্ত্রবয়ন, সবজি বাগান, বাজারে ক্রয়বিক্রয় সমস্তই মেয়েরা করে কোন শ্রমকেই তাহারা হেয় মনে করে না। পরিবার প্রতিপালনের অধিকাংশ দায়িত্ব তাহারাই বহন করে। সেইজন্য সমাজে তাহাদের স্থান পুরুষের পাশাপাশি। চলাফেরা, কথাবার্তা বা কাজকর্মে মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। "The women of Manipur are shrewd, capable people, who at all stages of their career are allowed the fullest liberty. They are not exposed to the risks of infant marriage, or mewed up within the

four walls of their houses......". এলেন সাহেবের এই উক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন নাই। তবে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন থাকায় পারিবারিক জীবনে অনেক মেয়েরই নানা লাঞ্ছনা এবং দুঃখ কষ্ট মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়। বিবাহাদি ব্যাপারে দুই রকমের প্রথাই এখানে চালু আছে। হয় অভিভাবকগণ পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিয়া থাকেন,—অথবা বরকন্যা পূর্ব হইতেই পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া বিবাহবন্ধনে তাহাদের মিলন পাকা-পাকি করিয়া লয়। বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ এবং বিধবা বিবাহে সমাজের কোন আপত্তি নাই।

মণিপুরী জীবন যাত্রা—মণিপুরী সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। এক এক বংশের লোকের জন্য নিজেদের পাড়া ভাগ করা আছে। সেই সমস্ত পাড়ায় নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবার এক বা একাধিক ঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে। মণিপুরীরা যে সুরুচি সম্পন্ন এবং সৌন্দর্যবিলাসী তাহা তাহাদের যে কোন পাড়ায় প্রবেশ করিলেই বুঝা যায়। বাড়ীর সামনে এবং দুই ধারে ফুল এবং সবজি বাগান, লেপা পোছা অঙ্গন, ঘরের ভিতরে খাটের উপর সুসজ্জিত বিছানা, যথাস্থানে রক্ষিত মাজা ঘসা বাসন ও অন্যান্য জিনিষ পত্রাদির মধ্যে একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য এবং শুচিবোধ ফুটিয়া রহিয়াছে। পুরুষরা সাধারণতঃ বাড়ীতে কাঁচা সাদা ধবধবে ধুতি, সেইরকম একটি সাদা পাঞ্জাবী কাঁধের উপর

একটি চাদর এবং কপালে শ্বেত চন্দনের লম্বা তিলক পরিয়া থাকে। মেয়েদের পোষাকেও জাঁকজমক কিছুই নাই। পরনে একটি রঙ্গিন ফানেক, গায়ে কাজ করা সাদা, সবুজ, গৈরিক অথবা কমলা রঙের মিহি একখানা চাদর, নাকে শ্বেত চন্দনের একটি সরু রেখা এবং কানে গুঞ্জা কনক চাঁপা ফুল এই তাহাদের ভূষণ। রাজপরিবারের অথবা ধনীদের মেয়েরা কখনও কখনও সামান্য স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া থাকেন—কিন্তু সাধারণের মধ্যে উহার তেমন প্রচলন নাই। তথাপি এই অনাড়ম্বর পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া মণিপুরীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। এবিষয়ে ইহাদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্যদের কোন তুলনা চলে না। মণিপুরীগণ তাহাদের আভিজাত্য বোধ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। মলিন বস্ত্র পরিহিত লোক অথবা ভিখারী এখানে প্রায় দেখা যায় না। নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং বস্ত্র মণিপুরেই উৎপন্ন হয়। কৃষি এবং কুটীর শিল্প এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই তাঁত আছে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন বিবাহযোগ্যা তরুণীর একটি বিশেষ গুণের মধ্যে গণ্য। অর্থের প্রাচুর্য না থাকিলেও অন্ন বস্ত্র সুলভ থাকায় মণিপুরীদের সরল জীবন যাত্রায় অভাববোধ তেমন নাই। এইজন্য জীবন সংগ্রামের গুরুভার এখানকার জীবনকে দলিত করিতে পারে নাই। অবসর বিনোদনের জন্য নৃত্যগীত এবং নানারকম ক্রীড়া ও উৎসবাদি এখানে বার মাস লাগিয়াই আছে।

ধর্ম—

মণিপুরীগণ বর্তমানে বৈষ্ণব মতাবলম্বী হিন্দু হইলেও পূর্বে তাহাদের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ধর্ম ছিল। হিন্দু ধর্ম গ্রহণের ফলে সেই ধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই; সমাজে এখনও প্রাচীন ধর্ম মতের পুরোহিত মাইবা সম্প্রদায়ের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। মাইবাগণ নানারকম দেবতার পূজা করিত। ইহাদের মধ্যে চারজন দেবতার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, যথা লাম লাই অর্থাৎ বরুণ দেবতা যাহার কৃপায় কৃষিকার্য্য চলে, উমাংলাই অর্থাৎ বনদেবতা, ইমুংলাই অর্থাৎ গৃহদেবতা এবং অপোকপা অর্থাৎ বংশের পিতা। ইহারা ছাড়া প্রকৃতির আরও বিভিন্ন স্বরূপের জন্য এক একজন দেবতা ছিলেন, যেমন জলদেবতা, গিরিদেবতা ইত্যাদি। মণিপুরী উপাখ্যানে পাখংবা (জন্ম মৃত্যুর দেবতা), সেনামহী (রাজ-দেবতা, একমাত্র রাজাই এই দেবতার পূজার অধিকারী), নুংসাবা (পাথরের স্রষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টি দেবতা), ইত্যাদি নানা ব্যক্তিগত, বংশগত এবং সামাজিক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম প্রচলনের পরও ইহাদের মধ্যে অনেকে যেমন পাখংবা, য়ুমলাই, সেনামহী, নুংসাবা প্রভৃতি দেবতাগণও হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মণিপুরীদের সকল দেবতার উপরে রহিয়াছেন গুরু—যিনি জগতের পিতা—"তাইবাংপান-বাগীমাপু (taibangpanbagimapu) তাঁহার দেহ হইতেই অঙোম, লুয়াং, খাবাঙানবা, মৈরাং, চেংলেই, খুমাল, নিংথৌজা

প্রভৃতি মণিপুরী গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের অন্তরের অন্তস্থলে সেই জগৎপিতা গুরুর আসন এখনও অটল। মণিপুরী রাজ পরিবার গুরুর পুত্র পাখাংবার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। সমাজে এইরূপ প্রবাদ আছে যে সেই পাখাংবা মাঝে মাঝে সর্পের রূপ ধরিয়া দেখা দেন। যখন তিনি বিশাল কায় রূপ ধরিয়া দেখা দেন তখন তিনি বিরূপ—নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে; যথাবিধি পূজা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই; যখন খর্বাকৃতিতে দেখাদেন তখন আর কোন ভয় নাই মণিপুরীদের উপর তিনি সন্তুষ্টই আছেন।

এই সর্পরূপী পাখাংবা মণিপুরের রাজার বহিবাস্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মণিপুরীগণকে পালন করিতেছেন। স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের পতাকায় পাখাংবার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রতীক একটি সর্প আঁকা থাকিত। মণিপুরের প্রাগৈতিহাসিক যুগে নংপক নিংথৌ এবং পান্থৈবী নামক দেব ও দেবী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর মৈরাং যুগে জনপ্রিয় হন খাম্বা ও থইবী ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কাহিনী প্রচালিত আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর নংপকনিংথৌ এবং পান্থৈবী, খাম্বা ও থইবী হরপার্বতীর অবতার বলিয়া পরিচিত হন। বিভিন্ন সময়ে এই দুই যুগল অবতার মণিপুরে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। নম্পক নিংথৌ এবং পান্থৈবীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের

পরকীয়াভাব পরিস্ফুট অর্থাৎ শ্রীমতী রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী না হইয়াও তাঁহার প্রতি প্রেম সাধনা করিয়াছিলেন তেমনি পান্থেবী ও নংপকনিংথৌএর বিবাহিত পত্নী না হইয়াও তাঁহার নিকট সমগ্র মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাহ্যিক লোকাচারের ক্ষুদ্রগণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা তাহাদের অন্তরের সম্পর্ককে সবার উপরে স্থান দিয়া প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কবে প্রথম মণিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে মত দ্বৈধ থাকিলেও—হিন্দুধর্ম যে বহুদিন হইতেই প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে ইহার সমন্বয় চলিয়া আসিতেছিল তাহা স্পষ্ট। রামানন্দের বৈষ্ণবধর্মকে রাজধর্মরূপে গ্রহণ করা হয় তখন হইতে নিঃসন্দেহে হিন্দুধর্মের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। ইহার পর রাজা জয়সিংহের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গৃহীত হইয়া এখনও চালু আছে।

পূজাপার্বণ—বর্তমানে মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মানুমোদিত সবগুলি অনুষ্ঠানই আছে—যথা, জন্মাষ্টমী, স্নানযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, হরিশয়ন, হরিউত্থান, রাসযাত্রা, চৈতন্যদেবের জন্মদিবস, দোলযাত্রা ইত্যাদি বিশেষ যাকযজ্ঞের সঙ্গে পালিত হয়। তবে ইহাদের মধ্যে দোলযাত্রাই এখানকার সর্বপ্রধান উৎসব। বাংলাদেশে যেমন দুর্গোৎসব মণিপুরে তেমনি দোলযাত্রা। দোলপূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া এই উৎসব প্রায় ১৪দিন ব্যাপী চলে। বৈষ্ণব উৎসব ব্যতীত হিন্দুদের অন্যান্য পূজাপার্বণ—যথা দুর্গাপূজা, দেওয়ালি, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি ইত্যাদিও মণিপুরীরা করিয়া

থাকে। বাৎসরিক এই সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও বর্দ্ধিষ্ণু মণিপুরীদের বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের মূর্তি আছে। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সেখানে পূজা এবং সন্ধ্যারতি করিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখে চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি সন্ধ্যায় নামকীর্তন প্রায় লাগিয়াই থাকে। যাহাদের মন্দির নাই তাহাদের কুলবধগণ গৃহের সম্মুখে সযত্ন রক্ষিত তুলসীর মূলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া দিনের শেষে গোবিন্দকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পল্লী ধূপের গন্ধে, কাঁশর, ঘণ্টা ও শাঁখের নিনাদে পূতগম্ভীর হইয়া স্বতন্ত্র একটা জগতের সৃষ্টি করে।

পূজাপার্বণ মণিপুরীদের শুধু ধর্মভাবের পরিচায়ক নয়, অনেক সময় আভিজাত্যেরও অভিব্যক্তি। পিতৃশ্রাদ্ধ, ষষ্ঠীব্রত, ইত্যাদি নানা পর্ব উপলক্ষে তাহারা প্রচুর খরচ করে; এবং অন্যের সঙ্গে এইভাবে খরচের প্রতিযোগীতা করিয়া অনেক পরিবারকে ফতুর হইয়া যাইতেও দেখা যায়। পূজাপার্বণ ছাড়া তীর্থভ্রমণও মণিপুরীদের পুণ্য সঞ্চয়ের একটি পন্থা। অনেক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাহাদের জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ তীর্থ পর্য্যটনে ব্যয় করিয়া জীবনের অভিলাস পূর্ণ করে। সমস্ত হিন্দু তীর্থই মণিপুরীদেরও তীর্থ। তবে তাহাদের সবার সেরা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা ও বৃন্দাবন; চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপও ইহাদেরই সমপর্য্যায়।

এই সমস্ত নিছক হিন্দু অনুষ্ঠান ছাড়াও অনেক প্রাচীন পূজাপালিও মণিপুরী সমাজে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশিয়া আছে।

যথা :—

লাইহরাউবা : মণিপুরী পুরাণে পাওয়া যায়—পৃথিবী সৃষ্টির পর পার্বতী এবং পরমেশ্বর রাসনৃত্য করার সংকল্প লইয়া মণিপুরের গিরিশৃঙ্গে অবতীর্ণ হন। মণিপুর উপত্যকা তখন জলমগ্ন ছিল। পরমেশ্বর মহাদেব তাঁহার ত্রিশূলের দ্বারা জলনিকাশের পথ করিয়া দেওয়ায় মণিপুর উপত্যকা ভাসিয়া উঠে। তখন পার্বতী ও পরমেশ্বর অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তাহাদের অভিলষিত রাসনৃত্য করেন। ইহাই হইতেছে লাই হরাউবা অর্থাৎ দেবতার আনন্দ। বৈশাখ মাসে মণিপুরীগণ সমবেতভাবে অনুরূপ নৃত্য এবং সৃষ্টিতত্ত্বের গান গাহিয়া লাই-হরাউবা উৎসব পালন করিয়া থাকে।

চীরাওবা—ইহা চৈত্র মাসে চরক পূজার দিন অনুষ্ঠিত হয়। চরক নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এবং একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে চরক পূজা বলিয়া মনে করেন। আসলে চরক পূজার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ঐদিন মণিপুরীগণ ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র পরিষ্কার করিয়া পুরাতন বৎসরের জীর্ণমলিনতা ধুইয়া মুছিয়া ফেলে। কেহ কেহ বলেন চহিতাবা অর্থাৎ বৎসর গণনা (চহি বৎসর, তাবা-গণনা) হইতে চিরাওবা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আগে ঐদিনে একজন নির্দিষ্ট লোক সমস্ত বৎসরের পাপ পুণ্য মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করিত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা কীয়াম্বার সময় এই উৎসবের প্রচলন হয়। মণিপুরী সমাজে আরও পূজা পার্বণ আছে।

ভাষা ও সাহিত্য

মণিপুরীদের নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য আছে কলিকাতা এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ইহাতে বি, এ, পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ডক্টর গ্রিয়ারসন (Dr. Grier on) মণিপুরী ভাষাকে তিব্বত-ব্রহ্ম শ্রেণীর মধ্যে কুকী-চীন শাখায় ফেলিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ ভাষাগুলির সঙ্গে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। মণিপুরী ভাষার পৃথক বর্ণমালাও ছিল কিন্তু আজকাল উহার ব্যবহার হয় না। বর্তমানে বাংলা বর্ণমালা মণিপুরীদের লিপি হইয়াছে। তবে ইহার উচ্চারণ বাংলা হইতে স্বতন্ত্র,—অনেকটা হিন্দি উচ্চারণের মত। প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমালা যে কয় খানি গ্রন্থে লিখিত আছে তাহা পাঠ করিবার মত লোক বর্তমানে অতি বিরল।

মণিপুরী সাহিত্যকে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগের হাতে লিখা গ্রন্থ এখন দেখা যায় না, তবে প্রায় ১৪০টি হস্ত লিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুরাণ, বংশের ইতিকথা, জ্যোতিষ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও নীতিকথা প্রভৃতিই ছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মণিপুরী সাহিত্যের প্রধান বিষয় বস্তু। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে—১। তাখেল ঙম্বা (ত্রিপুর বিজয়), ২। সামজোক ঙম্বা (সামজোক বিজয়), ৩। চেইথারোল কুম্বাবা (মণিপুরের রাজাদের ইতিহাস), ৪। নুমিৎকাপ্পা (সূর্য্য শিকারী), ৫। পুভিল (সৃষ্টিতত্ত্ব), ৬। পোইরৈতোন খুনথোকপা (পোইরৈতনের কাহিনী), ৭।

লাইথাক লাইখারোল ৮। পান্থৈবী খোঙ্গুন (পান্থৈবীর পদচিহ্ন), এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের পর মণিপুরীগণ বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মারফত বাংলা ভাষা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। ধর্ম্মভাব, রাজার আনুকূল্য ও বহিরাগত বৈষ্ণব গুরু ও ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় মণিপুরে বাংলা ভাষা যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে। তখনকার সরকারী চিঠিপত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অনেক মণিপুরী কবি বাংলায় নানা বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'ধরণী সংহিতা' নামক রাজা গম্ভীর সিংএর আমলের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলায়ই লেখা। এখন পর্যন্তও যে কোন পর্ব উপলক্ষে মণিপুরে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী ও পালা কীর্তন গাওয়া হইয়া থাকে, বৃদ্ধগণ কীর্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পরম শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। ১৯২৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত মণিপুরীগণ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পড়াশুনা করিত। বাংলা নাট্যাভিনয়ও তখন পর্যন্ত বিশেষ সমাদৃত ছিল। তথাপি মণিপুরী ভাষা অবহেলিত বা অনাদৃত ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নাই। ১৮৫৮ সনে মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংএর নির্দেশে একটি মণিপুরী সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মণিপুরী সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, ধর্মগ্রন্থ, ব্যাকরণ

শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মণিপুরী প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। কাব্যের মধ্যে হিজাম আঙাহাল সিংএর 'খাম্বাথোইবী' এবং কবিরত্ন দরেন্দ্রজিৎ সিংএর 'কংশবধ কাব্য' বেশ উচুদরের। 'খাম্বাথোইবী'র মধ্যে লেখক প্রচলিত এবং বহু অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করিয়া শব্দ সম্পদের দারিদ্র কিভাবে ঘুচাইতে হয় সেই পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবিরত্ন দরেন্দ্র সিং 'কংশ বধ কাব্য' ছাড়া আরও বহু কবিতা লিখিয়া মণিপুরী সাহিত্যমালা সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। এই দুইজন খ্যাতনামা কবি ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সুরচাঁদ শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য।

নাটক—

মণিপুরীগণ বিশেষ নাট্যামোদী, এ বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট দক্ষতাও রহিয়াছে। সনে ১৯৫৫ দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'লোক নাট্যে' মণিপুরী অভিনেতাগণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সর্ব ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমে এখানকার রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় হইত। ১৯১৪ সনে স্কুলের ছেলেরা বাংলা 'পার্থ পরাজয়' নাটকের অনুবাদ 'অর্জুনগীমাইথীবা' অভিনয় করিয়া মণিপুরীদের চোখ খুলিয়া দেয়। তখন হইতে বাংলা নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়া কিছুদিন অনুবাদের যুগ চলে। ১৯২৫ সনে প্রাক্তন সেসান জজ এল এম, ইবুঙোহাল সিং কর্তৃক লিখিত 'নরসিং' নাটক অভিনীত হয়। এই দেখিয়া এস,

ললিত সিং, এম, রামচরণ সিং, এ শ্যামসুন্দর সিং, এস, ব্রজমণি সিং, প্রভৃতি অনেকে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নানাবিধ নাটক লিখিয়া রঙ্গমঞ্চের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। নাটক লেখক এবং নাট্যকারদের এইরূপ কৃতিত্বের ফলে এক সময়ে ইম্ফালের মত জায়গায় ৭টা রঙ্গমঞ্চে একই সময়ে অভিনয় হইত। বর্তমানে চলচ্চিত্রের প্রাধান্যের ফলে রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা কমিয়া গেলেও নাট্যাভিনয় একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

উপন্যাস—

মণিপুরী উপন্যাস নাটকের মত ততটা খ্যাতি অর্জন করিতে না পারিলেও এবিষয়ে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থের অভাব নাই। ডাক্তার কমল সিংএর লেখা 'মাধবী' মণিপুরী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বর্তমানে রাজকুমার শীতলজিৎ সিং উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ নাম করিয়াছেন। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (মতুম কৈরেং সিং), কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' (বাসুদেব শর্মা), মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য, (হাওয়াইবাম নবদ্বীপ সিং) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস—

ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মতুয়া ঝুলন সিংএর বিজয় পাঞ্চালি, অত্তোম্বাপু শর্মার মণিপুর ইতিহাস, য়ুমজাও সিংএর মণিপুর ইতিহাস, রাজকুমার স্নাহাল সিংএর মণিপুর ইতিহাস এবং আরও অনেক পুস্তক আছে।

ধর্মসাহিত্য—

এক্ষেত্রে পণ্ডিতরাজ অতোম্বাপু শর্মা বিদ্যারত্ন একজন দিকপাল। তাঁহার মত সংস্কৃতজ্ঞ, বহুশাস্ত্রবিৎ গবেষক, লেখক, ধার্মিক ও সজ্জন ব্যক্তি ভারতের এই উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অতি বিরল। নগরীর কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া লোকের প্রশংসা ও নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাচীন ঋষিদের মত তিনি তাঁহার গবেষণালব্ধ সত্যকে একের পর এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। চাণক্য নীতি, চৈতন্য চরিতামৃত, সারস্বত ব্যাকরণ, গীতা, পূজাপদ্ধতি, মানব ধর্মসার, অথর্ব বেদ, শ্রীমৎ ভাগবৎ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক রচনার মধ্যে মণিপুর পুরাবৃত্তম মৈতৈগী মৈহৌরল, প্রত্নীকস, মৈতাই হারিময়া, মৈতাই ধর্ম আরীবা, মণিপুরীরাস অনিশুবা, মুমিৎ লোইসাং প্রাচীন মণিপুরী ভাষা, মণিপুর প্রতিভা, মণিপুরী সনাতন ধর্ম ইত্যাদি আরও অনেক আছে। মণিপুরী ভাষায় এত পুস্তক আর কেহ লেখেন নাই।

এই সমস্ত লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও ডসি, প্রজাতন্ত্র, আনৌবা সমাজ সীমান্ত পত্রিকা প্রভৃতি দৈনিক সংবাদপত্রও মণিপুরী ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। আধুনিক মণিপুরী সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার ভাবরসে পুষ্ট। বর্তমানে এখানে হিন্দী ভাষার ব্যাপক প্রসারতা দেখা যাইতেছে; কিন্তু মণিপুরী সাহিত্যের উপর এখনও ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হয় নাই। সিন্ধু ও গঙ্গা যেমন অন্যান্য বহু উপনদীর স্রোতধারায় পুষ্ট, তেমনি সাহিত্যও

জাতির নিজস্ব সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া পুষ্টিপুষ্ট হয়। এই সত্যটি মণিপুরী ভাষার শ্রীবৃদ্ধির যুগে ধামা চাপা পড়িলে মারাত্মক ভুল হইবে।

মণিপুরী নৃত্য—

নৃত্য সকল কলার আদি। যখন বাদ্যযন্ত্র ছিল না, সঙ্গীত সৃষ্টি হয় নাই, চিত্রাঙ্কণ কৌশল অজানা ছিল সেই আদিম যুগে মানুষ তাহার অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করিত নিজের দেহে; দেহ তালে তালে আন্দোলিত করিয়া সাবলীল ছন্দে তাহার সুখ দুঃখ ভয় ঘৃণা প্রকাশ করিত। ইহাই নৃত্য সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অনুভূতি যতই সূক্ষ্ম এবং মার্জিত হইতে লাগিল, নৃত্যও সেই সঙ্গে পা ফেলিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল। যে নৃত্যে সত্য এবং সুন্দরের উপলব্ধি মূর্ত হইয়া উঠে তাহা জীবনী শক্তির চরম বিকাশ। ইহার আবেদন দেশ, জাতি, ধর্ম অথবা ভাষার বন্ধন হইতে মুক্ত, মণিপুরী নৃত্য ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তবে অনেক সময় জহরীকে জহর চিনাইয়া দিতে হয়। কারণ সাধারণ লোকের মূল্যবোধ প্রায় ক্ষেত্রেই ততটা উন্নত থাকে না। মণিপুরী নৃত্যের মূল্যও বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলারসিক রবীন্দ্রনাথের চোখে এই নৃত্যকলার অফুরন্ত রস সম্পদ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। ১৩২৬ সনে (বাংলা) শ্রীহট্টে এবং পরে আগরতলায় মণিপুরী রাস নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতেই মণিপুরী

নৃত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র মণিপুরী নৃত্য বিশেষ সমাদৃত। কেবল নাচ দেখিবার জন্যই প্রতি বৎসর মণিপুরে বহুলোক আসিয়া থাকে।

নৃত্যের প্রকৃতি, ভাব ও গুণাগুণ বিচার করিয়া মণিপুরী নৃত্য জনপদ এবং উচ্চাঙ্গ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এখানকার অধিকাংশ নৃত্যই লাস্য প্রধান। জনপদ নৃত্যের মধ্যে থাবল চোংবা, লাইহরাওবা, খাম্বা থইবী, কর্তাল চলোন, মৃদঙ্গ চলোন, নাগানৃত্য ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসনৃত্য উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

থাবল চোংবা—মণিপুরীদের প্রাচীনতম নৃত্য। শীতের শেষ বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির মনোরম স্পর্শে তরুণ তরুণীদের মন স্বভাবতই পুলকিত হইয়া উঠে—আর তাহা প্রকাশ পায় থাবল চোংবা নৃত্যে। ফাল্গুন পূর্ণিমায় আকাশে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ছেলে মেয়েরা কোন বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পরস্পরের হাত ধরিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত নৃত্য করে। পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ দিন ব্যাপী এই নাচ চলে। থাবল চোংবার প্রাচীনতা ইহার সারল্য এবং আনুসাঙ্গিক সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে। অন্যান্য মণিপুরী নৃত্যের তুলনায় ইহাতে কলাকৌশল খুব কম। মণিপুরী ছেলে মেয়েরা সকলেই এই নাচ জানে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনের পর কিছু বৈষ্ণবীয় প্রলেপ লাগিলেও ইহার সঙ্গীতগুলি মণিপুরের প্রাকৃতিক বর্ণনা, প্রাচীন দেব দেবী এবং বীরদের বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

লাইহরাওবা—ইহাও মণিপুরের প্রাচীন ধর্ম এবং সভ্যতার দান। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। এই নাচ একক, দ্বৈত অথবা সমষ্টিগত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে মেয়েদের অঙ্গভঙ্গি যত সুললিত এবং লাস্যময় পুরুষের অঙ্গভঙ্গি তেমনই তাণ্ডব এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক। পৃথিবী সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্তই এই নৃত্যের বিষয়বস্তু; কাপড় বুনা, ধানকাটা, মাছ ধরা ইত্যাদি কোন কিছুই বাদ যায় না।

খাম্বা থইবী নৃত্য খাম্বা ও থইবীর কাহিনী এই নৃত্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলা হয়। ইহাতে একজন নর্তক খাম্বা ও একজন নর্তকী থইবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নাচিয়া থাকে।

মৃদঙ্গ চলোন, কর্তাল চলোন এবং নাগা নৃত্য তাণ্ডব নৃত্য শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ মৃদঙ্গ এবং কর্তাল সহযোগে নৃত্য সম্পূর্ণ বৈষ্ণব প্রভাবাধীন। নাগানৃত্য মণিপুরীদের নিজস্ব নয়—নাগাদের নিকট হইতে ধার করা।

রাসনৃত্য—

মণিপুরী নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠ অবদান রাসনৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রাসের কাহিনী এই রাস নৃত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র (জয় সিং) মণিপুরে রাসনৃত্যের প্রথম প্রবর্তন করেন। এই নৃত্যে নর্তক নর্তকীদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ইহার পোষাক পরিচ্ছদ, ললিত ছন্দ ও মুদ্রা, চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু দর্শকের নয়ন ও মন মুগ্ধ করে। রাসনৃত্যে সাধারণতঃ

রাধা এবং তাঁহার ৭জন সখীর ভূমিকায় ৮জন নর্তকী ও কৃষ্ণের ভূমিকায় একজন বালক নৃত্য করিয়া থাকে।

উচ্চাঙ্গ মণিপুরী নৃত্যের মুদ্রাগুলি কথাকলি অথবা ভারত নাট্যমের মত জটিল নয়। অভিবাদন, প্রার্থনা, মালাগাঁথা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরি, গাত্রালঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রকাশের জন্য বহুরকমের সরল হস্ত মুদ্রা আছে। মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের সংগতের দ্বারা নৃত্যের তাল রাখা হয়। রাসনৃত্যের বসন এবং ভূষণ অতি মার্জিত ও মনোরম। ভারতের অন্যান্য নৃত্যে এত সুন্দর পোষাক দেখা যায় না।

নৃত্যে মণিপুরীদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। নৃত্যের অ-আ-ক-খ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জানা। ইহার প্রধান কারণ ধর্মের সঙ্গে নৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ধর্মই মণিপুরী নৃত্যের প্রধান অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ধর্মের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্যও উহার পাশাপাশি চলিয়াছে। ধর্মের প্রধান আনুষঙ্গিক এবং অনুষ্ঠান নৃত্য। ধর্ম নিরপেক্ষ নৃত্যের কোন স্থান নাই। এইরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভাব আছে বলিয়াই এখানকার নৃত্য স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত, শুধু রঙ্গমঞ্চের আশ্রয়পুষ্ট টবের ফুলের মত বিলাসের সামগ্রী নয়।
